সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

১৬তম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

১৬তম খন্ড

সূরা লোকমান
থেকে
সূরা সাবা

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
হাফেজ শহীদুল্লাহ এফ, বারী

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(১৬তম খন্ড সূরা লোকমান থেকে সূরা সাবা)

প্রকাশক

খাদিজা আখতার রেজায়ী

ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশ সেন্টার

১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯

১১তম সংস্করণ

রবিউস সানি ১৪৩২ মার্চ ২০১১ চৈত্র ১৪১৭

কম্পোজ

আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকা

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author

Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali

&

Editor of Bengali rendition

Hafiz Munir Uddin Ahmed

16th Volume

(Surah Loqman to Surah Saba)

Published by

Khadija Akhter Rezayee

Director Al Quran Academy London

124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK

Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955

Bangladesh Centre

17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205

Phone & Fax : 00880-2-815 8526

Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)

38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100

Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition 1999

11th Edition

Rabius Sani 1432 March 2011

Price Tk. 200.00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk

ISBN NO- 984-8490-16-7

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক–এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়- হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত- এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা ইতিমধ্যেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'-'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি-তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্‌র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা-শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না–না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'

অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও

ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা লোকমান (অনুবাদ ১-১৯) ১৫
সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১৮
তাফসীর (আয়াত ১-১৯) ২২
কোরআনের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ লোক ২৩
সৃষ্টিজগতের পাতায় পাতায় আল্লাহর নিদর্শন ২৬
হযরত লোকমানের উপদেশনামা ২৯
মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ ৩২
আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কারোই আনুগত্য নেই ৩৩
জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মেরও হিসাব দিতে হবে ৩৫
আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে হযরত লোকমানের উপদেশ ৩৭
অনুবাদ (আয়াত ২০-৩৪) ৩৯
তাফসীর (আয়াত ২০-৩৪) ৪২
অসংখ্য নেয়ামতে ঘেরা আমাদের জীবন ৪২
মানবজাতীর কলংক নাস্তিক গোষ্ঠী ৪৪
মোমেনদের সফলতা ও কাফেরদের ব্যর্থতা ৪৫
তাওহীদের প্রতি মানব প্রকৃতির স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতি ৪৮
আল্লাহর প্রশংসা লেখা কখনো শেষ হবে না ৪৯
মহাবিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর চিরঞ্জীব সত্ত্বার ছায়া ৫১
আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সত্য ৫২
পানির বুকে নৌ চলাচল আল্লাহর এক অপূর্ব নিদর্শন ৫৩
বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ৫৫
যে বিষয়গুলো একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন ৫৮
সূরা আস সাজদা (অনুবাদ ১-৩০) ৬২
সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৬৬
তাফসীর (আয়াত ১-৩০) ৭০
আল কোরআনের কিছু চিরন্তন আবেদন ৭১
বিশ্বজগতের সর্বত্র আল্লাহর সৃষ্টি ও সৌন্দর্য বিরাজমান ৭৬
ডারউইনের বিবর্তনবাদ বনাম কোরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব ৮০
কেয়ামতের ময়দানে পাপিষ্ঠদের চিত্র ৮৩
মোমেনদের সফলতা ও পাপিষ্ঠদের পরিণতি ৮৪
ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা ৮৮
হৃদয়ে নাড়া দেয়ার মতো দুটি বিষয় ৮৯
সূরা আল আহযাব (অনুবাদ ১-৮) ৯১
সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৯২
তাফসীর (আয়াত ১-৮) ৯৮
আদর্শের প্রশ্নে ইসলামের আপোষহীন ভূমিকা ৯৯
যেহারের কাফফারা ও নারী নির্যাতন ১০১
পালকপ্রথা রহীতকরণ ১০৩
মোহাজের ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ১০৬
নবীর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা ঈমানের শর্ত ১০৮
নবীদের কাছ থেকে আনুগত্যের অংগীকার গ্রহণ ১১০
অনুবাদ (আয়াত ৯-২৭) ১১২
তাফসীর (আয়াত ৯-২৭) ১১৫
ঐতিহাসিক খন্দকের যুদ্ধ ১১৭
আল কোরআনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ১২১
খন্দক যুদ্ধের ধারা পর্যালোচনা ১২৩
মোনাফেকদের চরিত্র বিশ্লেষণ ১২৬
আদর্শ মানুষ হযরত মোহাম্মদ (স.) ১২৯
মানবীয় দোষগুণ সহ একজন মোমেনের পরিচয় ১৩১
মদীনায় ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও তাদের পতন ১৩৪
অনুবাদ (আয়াত ২৮-৩৫) ১৪১
তাফসীর (আয়াত ২৮-৩৫) ১৪২
উম্মুল মোমেনীনদের আখেরাতমুখী জীবন ধারা ১৪৩
তারা ছিলেন সত্যিকার আদর্শ নারী ১৪৬
নবীপত্নীদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের মর্যাদা ১৫০
পারিবারিক শান্তির রক্ষাকবচ ১৫২
নারীদের রূপ ও সুরের পসরা যখন ধ্বংস আনে ১৫৪
নারীদের ঘরে থাকার নির্দেশ ও তার কারণ ১৫৬
বাইরে বেরুনোর সময় সাজগোজ না করার নির্দেশ ১৫৮

আহলে বায়তের অনুকরণীয় আদর্শ	১৬১
ঈমানদাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য	১৬৩
অনুবাদ (আয়াত ৩৬-৪৮)	১৬৬
তাফসীর (আয়াত ৩৬-৪৮)	১৬৮
আল্লাহর ও রসূলের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কারোই মত খাটানো যায় না	১৬৮
সাহাবারা যেভাবে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন	১৭১
দত্তকপ্রথার মূলোৎপাটন	১৭৬
নবীদের সাথে উম্মতদের সম্পর্কের ধরণ	১৮০
আল্লাহর যেকেরের তাৎপর্য ও গুরুত্ব	১৮১
জান্নাতে মোমেনদের সংবর্ধনা	১৮২
অনুবাদ (আয়াত ৪৯-৬২)	১৮৭
তাফসীর (আয়াত ৪৯-৬২)	১৯০
সহবাসপূর্ব তালাক ও তার বিধান	১৯১
পর্দার বিধান ও সামাজিক সভ্যতা	১৯৩
উম্মতের জন্যে নবীপত্নীদের হারাম ঘোষণা করা	১৯৬
সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীদের পরিচয়	১৯৮
অনুবাদ (আয়াত ৬৩-৭৩)	১৯৯
তাফসীর (আয়াত ৬৩-৭৩)	২০০
কাফেরদের ধৃষ্টতা ও তাদের অনুসরণের পরিণতি	২০১
মোনাফেকদের কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার নির্দেশ	২০৩
মানুষ যে মহান দায়িত্ব সেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছে	২০৪
সূরা সাবা (অনুবাদ ১-৯)	২০৭
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২০৮
তাফসীর (আয়াত ১-৯)	২১২
আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞান	২১৩
কোরআন যেভাবে সঠিক পথের দিশা দেয়	২১৫
পরকালে অবিশ্বাসীদের জীবন	২১৭
অনুবাদ (আয়াত ১০-২১)	২১৯
তাফসীর (আয়াত ১০-২১)	২২১
হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-এর মোজেযা	২২১
সাবা জাতির ইতিহাস	২২৫
অনুবাদ (আয়াত ২২-২৭)	২২৯
তাফসীর (আয়াত ২২-২৭)	২৩০
অনুবাদ (আয়াত ২৮-৪২)	২৩৩
তাফসীর (আয়াত ২৮-৪২)	২৩৫
নবীর দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতা	২৩৬
পথভ্রষ্ট জনগণ ও নেতাদের ঝগড়া	২৩৭
প্রাচুর্য ও দৈন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির মাপকাঠি নয়	২৩৯
অনুবাদ (আয়াত ৪৩-৫৪)	২৪৪
তাফসীর (আয়াত ৪৩-৫৪)	২৪৫
সত্যের দাওয়াতের বিরুদ্ধে পাপীদের অপপ্রচার	২৪৬
মানবজাতির জন্যে কোরআনের উপদেশ	২৪৮
নবী মোহাম্মদ (স.)-এর উদাহরণ	২৫০
আল্লাহ তায়ালা সত্যের আঘাতে মিথ্যাকে ধ্বংস করেন	২৫১
কেয়ামতের ময়দানে কেয়ামত অস্বীকারকারীদের অবস্থা	২৫৩

সূরা লোকমান

আয়াত ৩৪ রুকু ৪

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۚ ① تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ ② هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ ③

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑤ وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ ق وَّيَتَّخِذَهَا

هُزُوًا ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑥ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى

مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ⑦

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۙ ⑧ خٰلِدِيْنَ

فِيْهَا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑨

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে—

১. আলিফ-লা-ম-মী-ম, ২. এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ভ কেতাবের আয়াত, ৩. নেককার মানুষদের জন্যে (এ হচ্ছে) হেদায়াত ও রহমত, ৪. যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা শেষ বিচার দিনের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে; ৫. এ লোকগুলোই তাদের মালিকের পক্ষ থেকে (যথার্থ) হেদায়াতের ওপর রয়েছে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সফলকাম। ৬. মানুষদের মাঝে এমন ব্যক্তিও আছে যে অর্থহীন ও বেহুদা গল্প কাহিনী খরিদ করে, যাতে করে সে (মানুষদের নিতান্ত) অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তায়ালার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, সে একে হাসি, বিদ্রূপ, তামাশা হিসেবেই গ্রহণ করে; তাদের জন্যে অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ৭. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে আদৌ তা শুনতেই পায়নি, তার কান দুটি যেন বধির, তাকে তুমি কঠোর আযাবের সুসংবাদ দাও! ৮. নিসন্দেহে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতের (সমাহার) জান্নাতসমূহ। ৯. সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অতীব সত্য; তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ۚ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾

১০. তিনি আসমানসমূহকে কোনো স্তম্ভ ছাড়াই পয়দা করেছেন তোমরা তো তা দেখতেই পাচ্ছো, তিনি যমীনে পাহাড়সমূহ স্থাপন করে রেখেছেন যাতে করে তা তোমাদের নিয়ে কখনো (একদিকে) ঢলে না পড়ে, (আবার) তাতে প্রত্যেক প্রকারের বিচরণশীল জন্তু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন; (হাঁ,) আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতপর (সে পানি দিয়ে) সেখানে আমি সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র উৎপাদন করিয়েছি। ১১. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি, অতপর তোমরা আমাকে দেখাও তো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে (যাদের তারা উপাসনা করে) তারা কি সৃষ্টি করেছে? (আসলেই) যালেমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

রুকু ২

১২. আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার (নেয়ামতের) শোকর আদায় করো; (কেননা) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে সে তো তা করে তার নিজের (ভালোর) জন্যেই, (আর) যদি কেউ অকৃতজ্ঞতা (-জনক আচরণ) করে (তার জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী। ১৩. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন লোকমান তার ছেলেকে নসীহত করতে গিয়ে বললো, হে বৎস, আল্লাহ তায়ালার সাথে শেরেক করো না; (অবশ্যই) শেরেক হচ্ছে সবচাইতে বড়ো যুলুম। ১৪. আমি মানুষকে (তাদের) পিতা-মাতার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি (যেন তারা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, কেননা), তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর পরই সে (সন্তান) বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছে, তুমি (তোমার নিজের সৃষ্টির জন্যে) আমার শোকর আদায় করো এবং তোমার (লালন পালনের জন্যে) পিতা-মাতারও কৃতজ্ঞতা আদায় করো; (অবশ্য তোমাদের সবাইকে) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

১৫. যদি তারা উভয়ে তোমাকে এ বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে, তুমি আমার সাথে শেরেক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই, তাহলে তুমি তাদের দু'জনের (কারোই) কথা মানবে না, তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি অবশ্যই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তুমি কথা তো শুধু তারই শোনবে যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়ে আছে, অতপর তোমাদের আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের বলে দেবো তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কি কাজ করতে। ১৬. (লোকমান আরো বললো,) হে বৎস, যদি (তোমার) কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণ (ছোটোও) হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখন্ডের ভেতর কিংবা আসমানসমূহেও (লুকিয়ে) থাকে, অথবা (যদি তা থাকে) যমীনের ভেতরে, তাও আল্লাহ তায়ালা (সেদিন সামনে) এনে হাযির করবেন; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সূক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। ১৭. (লোকমান আরো বললো,) হে বৎস, তুমি নামায প্রতিষ্ঠা করো, মানুষদের ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো, তোমার ওপর কোনো বিপদ মসিবত এসে পড়লে তার ওপর ধৈর্য ধারণ করো; (বিপদে ধৈর্য ধারণ করার) এ কাজটি নিসন্দেহে একটি বড়ো সাহসিকতাপূর্ণ কাজ, ১৮. (হে বৎস,) কখনো অহংকারবশে তুমি মানুষদের জন্যে তোমার গাল ফুলিয়ে রেখে তাদের অবজ্ঞা করো না এবং (আল্লাহর) যমীনে কখনো ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে বিচরণ করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উদ্ধত অহংকারীকেই অপছন্দ করেন। ১৯. (হে বৎস, যমীনে চলার সময়) তুমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো, কেননা আওয়াযসমূহের মধ্যে সবচাইতে অপ্রীতিকর আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পবিত্র কোরআন মানুষের সাথে তার বোধগম্য ভাষায় কথা বলার জন্য নাযিল হয়েছে। কেননা এই কোরআনকে তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি জানেন তার স্বভাব-প্রকৃতির জন্য কোন কোন জিনিস উপযুক্ত এবং কোন্ কোন্ জিনিস তার স্বভাব প্রকৃতিকে বিশুদ্ধ রাখবে ও বিশুদ্ধ করবে, যিনি জানেন কিভাবে তার সাথে কথা বলা দরকার এবং কোন কোন উপায়ে তার অন্তরে কথা প্রবেশ করানো যাবে। মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতিতে ও সত্ত্বায় যে সত্য আগে থেকেই সুপ্ত ছিল এবং যে সত্যকে তার জন্মগত সত্ত্বা কোরআনের বক্তব্য শোনার আগে থেকেই জানে, সেই সত্যকেই তার সামনে তুলে ধরার জন্য কোরআন নাযিল হয়েছে। কেননা মানব সত্ত্বা ও মানব প্রকৃতি তার প্রথম সৃষ্টিকালে মূলত এই সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সেই সত্যটা হলো আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও একত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণগানে মুখর সমুদয় সৃষ্টিজগতের সাথে একাত্ম হয়ে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও এবাদাত করা। কিন্তু পরবর্তীকালে উল্লেখিত সত্যের ওপর তার স্বভাব প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত থাকা নানা কারণে কষ্টকর ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যে পৃথিবীর মাটিতে সে বাস করে। সেই মাটি থেকে উঠে আসা বাষ্প তার স্বভাব প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তার রক্ত ও মাংস থেকে সৃষ্ট উত্তেজনা এবং তার প্রবৃত্তিজাত আবেগ উচ্ছ্বাস ও কামনা-বাসনা তাকে বিপথগামী করে দেয়। এই আচ্ছন্নতা ও নিষ্ক্রিয়তা ও বিপথগামিতা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয় কোরআন। সে তার বোধগম্য ভাষা ও যুক্তি প্রয়োগ করে তার সাথে কথা বলে। যে সত্যকে সে ভুলে গেছে, সেই সত্যকে তার সামনে তারই পরিচিত পদ্ধতিতে তুলে ধরে এবং সেই সত্যের ভিত্তিতে তার গোটা জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর ইসলামী আকীদা ও আদর্শের প্রতি তার আনুগত্যকে, জন্মগত স্বভাব প্রকৃতির সাথে তার একাত্মতা ও সংহতিকে এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহর পথে তার যাত্রাকে মযবুত, অবিচল ও অভ্রান্ত করে।

কোরআন মানুষের সাথে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ও মনমগজ দখলকারী ভংগিতে কথা বলার যে চমকপ্রদ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, আলোচ্য সূরাটা তার একটা নমুনা। উপরোক্ত সত্য থেকে ভ্রষ্ট মোশরেক জনগোষ্ঠীর মনমগজে আকীদা-বিশ্বাসের যে ভ্রান্তি ছিল, এ সূরা সে ভ্রান্তি দূর করে সকল মক্কী সূরাই এই ভ্রান্তি দূর করতে নানাভাবে চেষ্টা চালায় এবং মানুষের সুপ্ত স্বভাব প্রকৃতিকে সম্বোধন করে ও জাগ্রত করে। মানুষের মন-মগজকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য এ সূরা সর্বদিক থেকে অভিযান চালায়।

এই আকীদাগত বিভ্রান্তি দূর করে মহান সৃষ্টিকর্তার একত্ব, একক এবাদাত ও আনুগত্য, তাঁর নেয়ামতসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা, আখেরাতে বিশ্বাস এবং আখেরাতের হিসাব নিকাশ ও ন্যায় বিচার আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা বিধানের অনুসরণ এবং তা ছাড়া অন্য সমস্ত আকীদা বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান বর্জনের শিক্ষা দেয়া হয়।

সূরাটা এই শিক্ষাগুলো এমন ভংগিতে তুলে ধরে যে, তা উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণা করার প্রয়োজন। চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন মানবীয় মন-মগযকে উদ্বুদ্ধ করার কোরআনী ভংগি আয়ত্ত করার জন্য। আল্লাহ তায়ালার এবাদাত ও আনুগত্যের পথে মানুষকে আহ্বান করে-এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নই ভংগি আয়ত্ত করা অত্যন্ত জরুরী।

সূরা লোকমানে আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত এই শিক্ষাকে উপস্থাপন করা হয় কোরআনের চির পরিচিতি প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ এই বিশাল বিশ্ব জগতের প্রেক্ষাপটে– যার ভেতরে রয়েছে আকাশ–

পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্র, রাত, দিন, সাগর মহাসাগর, মহাশূন্য, তরংগমালা, বৃষ্টি, গাছপালা ও তরুলতা ইত্যাদি। এই সৃষ্টিগুলো কোরআনে বারবার আলোচিত হয়ে থাকে। কেননা গোটা সৃষ্টিজগত এর মাধ্যমেই সরব ও সোচ্চার হয়ে ওঠে। এর ডানে বামে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের সত্যতা প্রমাণকারী নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শন মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে দেয় তাওহীদের মর্মবাণী। তার অন্তর্জগতকে প্রভাবিত করে, আলোড়িত ও উজ্জীবিত করে এবং তার সামনে তার চলার পথ তুলে ধরে।

যদিও মূল শিক্ষা একই এবং উপস্থাপনের প্রেক্ষাপটও অভিন্ন, তথাপি এটা এ সূরায় চারবার চার পর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রতিবারই তা সেই সুপ্রশস্ত অংগনে মানব হৃদয়কে আলোড়িত করে, প্রতিবারই তার সাথে থাকে মন-মগযকে প্রভাবিত করার নতুন উপাদান এবং প্রতিবারই তা নতুন নতুন প্রকাশভংগীতে উপস্থাপিত হয়। এই চারটা পর্ব বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। কেননা প্রত্যেকটা পর্বের সূচনা ও সমাপ্তি ঘটেছে এমন আশ্চর্যজনক পন্থায় যে, তাতে বিবেক ও মনের জন্য পর্যাপ্ত খোরাক রয়েছে। রয়েছে হৃদয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার মতো প্রচুর দরকারী উপাদান।

আরবী বর্ণমালার কয়েকটা অক্ষর দিয়ে সূরাটার উদ্বোধন হবার পর শুরু হয়েছে এর প্রথম পর্ব বা অধ্যায়। বর্ণমালার এ অক্ষরগুলোর তাৎপর্য হলো, এ ধরনের বর্ণমালা দিয়েই এই সূরাটা এবং এই বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ রচিত হয়েছে।

এই আয়াতগুলো হচ্ছে হেদায়াতের উৎস এবং সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর রহমত লাভের পথনির্দেশক। আর এই সৎকর্মশীল তারাই, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে। এভাবে আখেরাতে বিশ্বাস ও আল্লাহর এবাদাতের বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটানো হয়েছে। এই সাথে একটা প্রেরণাদায়ক বক্তব্যও দেয়া হয়েছে। সেটা হলো,

'ওরাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সঠিক পথনির্দেশনার ওপর আছে এবং ওরাই সফলকাম।'

সফলকাম হতে চায় না এমন কে আছে? অপরদিকে আর একটা মানবগোষ্ঠী রয়েছে, যারা নানা রকমের মনভোলানো কথাবার্তা কিনে আনে, যাতে মানুষকে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বিপথগামী করতে পারে এবং আল্লাহর আয়াতগুলোকে উপহাসের সামগ্রী হিসাবে গ্রহণ করে। আর এই মানবগোষ্ঠীর জন্যও উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে তাদের উপহাসের সাথে সংগতিশীল এক ভয়ংকর আতংকজনক হুমকি। সেটা হলো, 'তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' অতপর এই গোষ্ঠীর অপতৎপরতার বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে,

'যখন আমার আয়াতগুলো তার সামনে পড়া হয়, তখন সে অহংকারের সাথে পেছন ফিরে চলে যায় এবং এমন ভাব প্রকাশ করে যেন সে তা শুনতেই পায়নি। এই বিবরণের সাথেও রয়েছে এমন একটা মনোজ্ঞ মন্তব্য, যা এই গোষ্ঠীটার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। সেই মন্তব্যটা হচ্ছে, 'যেন তার দু'কানের মধ্যে বধিরতা রয়েছে।' এরপর আরো একটা হুমকি, 'তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ জানাও।' এখানে 'সুসংবাদ' কথাটার মধ্যে কী সাংঘাতিক কটাক্ষ রয়েছে লক্ষ্য করুন। অতপর পুনরায় মোমেনদের প্রসংগ তুলে তাদের সেই সফলতা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যার উল্লেখ সূরার শুরুতে সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে। আর আখেরাতে তারা কী প্রতিফল পাবে সেটাও এই সাথেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যেমন জানিয়ে দেয়া হয়েছে অহংকারী ও উপহাসকারীদের শাস্তির কথা। 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত।' (আয়াত-৮ ও ৯)

অতপর এখানে মহাবিশ্বকে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রমাণ. হিসাবে। এই প্রমাণ মানুষের স্বভাবগত সত্ত্বা এবং তার জন্মগত বিবেকবুদ্ধি ও মনমগযকে সর্বদিক থেকে ঘিরে ধরে। তাকে জোরদার ভাষায় সম্বোধন করে এবং যে সত্যকে জনগণ দেখেও অবহেলা করে সেই সত্যকে তার সামনে তুলে ধরে। যেমন– 'তিনি আকাশকে সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়া .... ' (আয়াত -১০)

আর এই প্রাকৃতিক প্রমাণগুলো উপস্থাপন করে চেতনাকে জাগ্রত করা ও অনুভূতিকে শাণিত করার পর আল্লাহ তায়ালার অনবদ্য সৃষ্টিকে দেখেও যারা শেরেকে লিপ্ত রয়েছে তাদের বিবেকে কষাঘাত করা হচ্ছে,

'এই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। এখন আমাকে দেখাওতো দেখি, অন্যেরা কী কী সৃষ্টি করেছে .... ।' আয়াত-১১)

এই সুগভীর, শাণিত ও অকাট্য প্রাকৃতিক যুক্তিটা পেশ করার মধ্য দিয়েই শেষ হচ্ছে সূরা লোকমানের প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়টা শুরু হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির উক্তির মাধ্যমে। তবে আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার প্রেক্ষাপট এখানে অভিন্নই থাকছে। কেবল বর্ণনাভংগি ও উদ্বুদ্ধকর বক্তব্যের নতুনত্বই এখানে লক্ষণীয়।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আমি 'লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম।' এখন প্রশ্ন এই যে, এই জ্ঞান কি ধরনের এবং তার বিশেষত্ব কি? এই জ্ঞানের সারকথা হলো, 'আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করো।'. এটাও জ্ঞান এবং এটাই বিজ্ঞজনোচিত পথ। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে লোকমান কর্তৃক তাঁর ছেলেকে উপদেশ দান। এ হচ্ছে একজন জ্ঞানী লোক কর্তৃক নিজের ছেলেকে প্রদত্ত উপদেশ। এ উপদেশ দোষমুক্ত। উপদেশদাতাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। এ উপদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার অবকাশ নেই। কেননা কোনো পিতা তার সন্তানকে যে উপদেশ দেয়, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আরোপ করা যায় না। প্রথম পর্বে যেমন তাওহীদ ও আখেরাতের বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়েছে, এ উপদেশেও তেমনি। সেই সাথে রয়েছে অন্তরে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী নতুন নতুন বক্তব্য।

'লোকমান যখন তার ছেলেকে উপদেশ ছলে বললো, 'হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় শেরেক একটা বড়ো মাপের যুলুম।'

এরপর এই উপদেশকে জোরদার করা হচ্ছে আরো একটা উদ্দীপনাময় বক্তব্য দিয়ে যার মধ্যে দিয়ে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সম্পর্ককে এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যে, স্নেহ ও মমতাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। 'আমি মানুষকে তার পিতামাতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছি। .... ' (আয়াত-১৪)

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তায়ালার শোকরকে পিতামাতার শোকরের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর শোকরকে পিতামাতার শোকরের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 'আমার ও তোমার পিতামাতার শোকর করো।' অতপর আকীদা ও আদর্শের ক্ষেত্রে যে সর্বোচ্চ মূলনীতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, আদর্শিক সম্পর্ক বংশীয় ও রক্তীয় সম্পর্কের চেয়ে অগ্রগণ্য। বংশীয় ও রক্তের সম্পর্কে যতোই দৃঢ়তা ও স্নেহমমতা থাকুক না কেন, আকীদার সম্পর্কের পরেই তার স্থান। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'আর যদি তারা উভয়ে তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরীক করতে চাপ দেয়। তা হলে তাদের আনুগত্য করো না। .... এর পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের মহত্ব, সুক্ষ্নতা ও ব্যাপকতার এমন বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তা মানবীয় আবেগ-অনুভূতিতে শিহরণ জাগায়। ব্যাপকতর প্রাকৃতিক অংগনে লোকমান এ দৃশ্যটা তুলে ধরেছেন। (আয়াত-১৬)

এরপর লোকমান তার ছেলেকে আরো উপদেশ দেন ইসলামী আদর্শের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা সম্পর্কে এবং এই সমস্ত কাজ করতে গিয়ে ইসলামের অনুসারীকে যেসব দুঃখকষ্ট ও বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয় তার ওপর ধৈর্য ধারণ করা সম্পর্কে। এমনকি ইসলামের অনুসারী যদি স্বাভাবিকভাবে নিজের আকীদা-বিশ্বাস অনুসারে চলে এবং এতে তার দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত হয়, তাহলেও তার ওপর নানারকম বাধা-বিপত্তি ও বিপদ মুসিবত আসতে পারে। (আয়াত ১৭)

এরপর ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজের প্রতিরোধ এবং বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণের পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াতদাতার আরো একটা জরুরী কর্তব্য হলো, মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার না করা। কেননা দুর্ব্যবহারের অর্থ দাঁড়াবে, নিছক মুখের কথা দ্বারা সমাজে যেটুকু সংস্কারের কাজ করার সুযোগ ছিলো তা নিজের আচরণ দ্বারা নষ্ট করলো। ১৯ ও ২০ নং আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে মুখমন্ডলকে বিকৃত করা, ভেংচি দেয়া, ভ্রুকুটি করা ইত্যাদির কঠোর নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। এ অধ্যায়ে আকীদার বিষয়টা সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ নতুন ভংগিতে ও নতুন আবেশে তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর শুরু হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়। তাওহীদ ও আখেরাতের আকীদাটাকে আকাশ ও পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। সেই সাথে আকাশ ও পৃথিবীর সাথে এবং এ দুটোতে বিদ্যমান নেয়ামতগুলোর সাথে মানুষের সম্পর্কও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই সব নেয়ামতকে মানুষের আয়ত্তাধীন করেছেন, অথচ তারা এর শোকর আদায় করে না। (আয়াত-২০)

এরই প্রেক্ষাপটে আয়াতের শেষভাগে আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে যে কোনরকম বিতর্কে লিপ্ত হওয়াকে প্রকৃতি বিরোধী ও ঘৃণ্য ব্যাপার বলে নিন্দা করা হয়েছে। বিকারমুক্ত ও কলুষমুক্ত বিবেক এ ধরনের আচরণকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। অতপর এ কুফরির আচরণের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ অব্যাহত রাখা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। (২১ নং আয়াত)

এটাকে বিকারগ্রস্ত ও নির্বোধসুলভ আচরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ বলে হুশিয়ারী জ্ঞাপন করা হয়েছে। আর এ কারণেই ২২ ও ২৩ নং আয়াতে আখেরাতের কর্মফল ও সেই কর্মফলের সাথে ঈমান ও কুফরের সম্পৃক্ততা দেখানো হয়েছে। এরপর ২৪ নং আয়াতে ভয়ংকর আযাবের হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। অতপর অধ্যায়টা শেষ করার আগে মোশরেকদেরকে সৃষ্টি জগতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে এর স্রষ্টা কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যার জবাবে মহান আল্লাহকে স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার না করে তাদের উপায়ন্তর থাকে না। অবশেষে অধ্যায়ের শেষ আয়াত দুটোতে ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে এমন একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন জ্ঞান, সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর বাধা-বন্ধনহীন ইচ্ছা এবং এর মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ধ্বংস করে তা পুনরায় সৃষ্টি করতঃ আখেরাত প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টা শুরু হয়েছে একটা বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার মাধ্যমে। এ দৃশ্য মানুষের মনের ওপর একটা বিশেষ ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। এ দৃশ্যে রয়েছে রাত, যা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দিনের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়ে যায়। আর রয়েছে দিন যা একইভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে রাতের দেহের ভেতরে ঢুকে যায় ও বিলীন হয়ে যায়। এ দৃশ্যে আরো

রয়েছে চাঁদ ও সূর্য, যারা মহাশূন্যে নিজ নিজ কক্ষপথে নিতান্ত অনুগত হয়ে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রদক্ষিণ করে। সেই সময়সীমা কী, তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন, যিনি সূর্য চন্দ্র, আকাশ পৃথিবী, মানুষ ও মানুষের যাবতীয় কাজ-সম্বন্ধে সম্যক অবগত। (আয়াত-২৮ ও ২৯ দেখুন)

এরপর মানুষকে দেয়া আল্লাহ তায়ালার অন্য একটা নেয়ামতের কথাও স্মরণ করানো হয়েছে। এ নেয়ামত বা সাগরে চলাচলকারী নৌকা বা জাহাজ। (আয়াত-৩০) অতপর ৩১ নং আয়াতে মানুষকে পুনরায় প্রাকৃতিক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে- বিশেষত যে সময়ে তারা সাগরের ভয়াবহ তরংগমালার সম্মুখীন হয়, ক্ষমতার দর্প চূর্ণ হয় এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান বিজ্ঞান তাদেরকে আল্লাহদ্রোহী বানিয়েছে, সেই বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে তাদের আর কোনো অহংকার থাকে না, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এ যুক্তি খুবই ধারালো ও যুৎসই। এ যুক্তি দ্বারা তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। (আয়াত নং ৩২ দেখুন)

সমুদ্রের ভয়ংকর তরংগমালার সাথে সামঞ্জস্য থাকার সুবাদে ৩৩ নং আয়াতে তাদের কেয়ামত ও আখেরাতের অধিকতর ভয়াল অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে এ আয়াত আখেরাতের সত্যতা প্রমাণ করে। বস্তুত আখেরাত এমন আতংকজনক জায়গা, যা রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধনগুলোকে পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, অথচ দুনিয়ার জীবনে এমন কোন বিপদ নেই যা এই বন্ধনগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে।

অতপর যে আয়াত দ্বারা সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে, তাতে কেয়ামতের সময়, বৃষ্টি বর্ষণ, মাতৃগর্ভের ভ্রূণ, মানুষের আগামী দিনের উপার্জন এবং তার মৃত্যুর স্থান-এই কটা বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।

এই চারটে অধ্যায় এগুলোর নিজস্ব বর্ণনাভংগি, উদ্দীপক বক্তব্যসমূহ, যুক্তিপ্রমাণ ও নিদর্শনাবলীসহ, মানব হৃদয়কে উদ্বুদ্ধকরণে কোরআনের গৃহীত কৌশলের প্রকৃষ্ট নমুনা। যিনি হৃদয়গুলোর স্রষ্টা, যিনি হৃদয়গুলোর উপযুক্ত কৌশল ও ভাষা সম্পর্কে অবগত, তিনিই এই কৌশল নির্ধারণ করেছেন।

এবার আমরা এই চারটি অধ্যায়কে দুটো অধ্যায়ে ভাগ করে এর আয়াতগুলোর তাফসীরে মনোনিবেশ করবো। কেননা এর প্রত্যেক দুটো অধ্যায়ের মধ্যে গভীর সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

তাফসীর

আয়াত ১-১৯

'আলিফ-লাম-মীম ....।'

এ ধরনের বিচ্ছিন্ন আরবী অক্ষরসমূহ দিয়ে যে সব সূরা শুরু হয়, সে সব সূরার তাফসীরে ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, এ সব অক্ষর দিয়ে শুরু করা এবং এগুলোকে 'বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ' বলে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য শুধু এই যে, এই মহাগ্রন্থের আয়াতগুলো এ ধরনের আরবী বর্ণমালা দিয়েই রচিত ও লিখিত হয়েছে। আর এই কেতাবকে এখানে 'হাকীম' বা বিজ্ঞানময় বিশেষণে বিশেষিত করার কারণ এই যে, এই সূরায় একাধিকবার 'হেকমত' বা বিজ্ঞান শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এই গ্রন্থের অন্যান্য বিশেষণের মধ্য থেকে এই বিশেষণটা ব্যবহার করাই পরিবেশ ও পরিস্থিতির অধিকতর উপযোগী বিবেচিত হয়েছে। বস্তুত এটাই কোরআনের স্থায়ী রীতি। কোরআন শরীফকে বিজ্ঞানময় বা 'হাকীম' বিশেষণে বিশেষিত করা দ্বারা

তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা জন্মে যেন কোরআন এমন এক জীবন্ত ব্যক্তিত্ব, যার কথায় ও নির্দেশনাবলীতে যথেষ্ট বিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে, সে যা বলে, তা যেন সে সূদুরপ্রসারী পরিকল্পনা করেই বলে এবং তার যা লক্ষ্য, সেটাই যেন সে বাস্তবায়িত করতে চায়। কোরআন কিন্তু আসলেই তদ্রূপ। তার ভেতরে আত্মা রয়েছে, জীবন রয়েছে, গতি রয়েছে, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব রয়েছে, চিত্তাকর্যণের ক্ষমতা রয়েছে যারা কোরআনের নির্দেশনা মোতাবেক জীবন যাপনের মাধ্যমে তার সাহচর্য, ঘনিষ্ঠতা ও সান্নিধ্য লাভ করে, তারা তার সান্নিধ্য অনুভব করে এবং তার প্রতি একই ধরনের আকর্ষণ ও মমত্ববোধ করে– ঠিক যেমনটি দুটো প্রাণী এবং দুই বন্ধু একে অপরের আকর্ষণ ও মমত্ববোধে সাড়া দেয়।

কোরআনের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ লোক

৩ নং আয়াতের মর্ম এই যে, এই বিজ্ঞানময় গ্রন্থ বা এর আয়াতগুলো 'সৎ লোকদের জন্য পথনির্দেশিকা ও করুণা।' এটাই কোরআনের আসল ও চিরন্তন রূপ। সৎ লোকদেরকে তা এমন পথের সন্ধান দেয়, যে পথের যাত্রীরা কখনো পথভ্রষ্ট হয় না,

আর এমন করুণা ও অনুগ্রহ দান করে, যা হেদায়াত তথা সৎপথ প্রাপ্তির কারণে তাদের অন্তরকে অনাবিল শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে ভরে দেয়। অন্তরকে শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে ভরে দেয় দুনিয়া ও আখেরাতে সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য লাভের কারণে। তার কারণে সুপথপ্রাপ্তদের মাঝেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও অন্তরংগতা বিরাজ করে। তাদের ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিরাজ করার কারণে এবং পরিস্থিতি পরিবেশ ও সুপথপ্রাপ্তদের কাছে সুপরিচিত ও সমাদৃত নৈতিক মূল্যবোধের মাঝে যে একাত্মতা ও সমন্বয় বিরাজ করে তার কারণেও সর্বোপরি স্বভাব প্রকৃতির সাথে মূল্যবোধগুলোর সমন্বয় ও সাজুয্যের কারণেও তাদের অন্তর পরিতৃপ্ত থাকে। এই স্বভাব প্রকৃতি সাধারণত অবিকৃতই থাকে। সৎলোক হচ্ছে তারা,

'যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস রাখে।'

নামায যথা নিয়মে ও যথাসময়ে পূর্ণাংগভাবে আদায় করা ও প্রতিষ্ঠা করা হলে তার মধ্য দিয়ে নামাযের বিজ্ঞানসম্মত মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়। চিন্তায় ও আচরণে তার সুফল প্রতিষ্ঠিত হয়। বান্দার অন্তর ও মহান প্রভুর মাঝে মযবুত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং এই সখ্যের এমন অপূর্ব স্বাদ উপভোগ করা যায়, যা নামাযের প্রতি মনকে আকৃষ্ট করে রাখে। আর যাকাত দান করলে মানুষ তার স্বভাবগত কার্পণ্য থেকে মুক্তি পায় এবং সমাজ জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাভিত্তিক সামষ্টিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এ সমাজে ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণী পরম শান্তি ও পরিতৃপ্তি, এবং পারস্পরিক আস্থা ও আন্তরিক সম্প্রীতির পরিবেশে বাস করে। ধনীদের বিলাসিতা ও দরিদ্রদের বঞ্চনা, যা সামাজিক শান্তি, পারস্পরিক আস্থা ও সম্প্রীতিকে নষ্ট করে দেয়– যাকাত প্রচলিত থাকায় এ সমাজে স্থান পায় না। আর আখেরাতে বিশ্বাস মানুষের মনের সার্বক্ষণিক সতর্কতা ও সচেতনতা, আল্লাহ তায়ালার কাছে তার জন্য যা কিছু প্রাপ্য রয়েছে তার আকাংখায় উজ্জীবিত থাকা, পার্থিব জীবনের সকল মোহ ও প্রলোভনের উর্ধে ওঠা, ক্ষুদ্র বা বড় এবং গোপন বা প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ রাখা এবং এহসানের পর্যায়ে উপনীত হওয়ার নিশ্চয়তা দান করে। এহসান কী-এই প্রশ্নের জবাবে রসূল (স.) বলেছেন, 'তুমি এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করবে 'যেন তাকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে অন্তত এতোটুকু জেনে রেখো, তিনি তোমাকে দেখছেন। (বোখারী ও মুসলিম) এরই নাম এহসান।

এই এহসান নামক গুণটি যাদের মধ্যে আছে, তারাই মোহসেন বা সৎলোক। এই সৎলোকদের জন্যই কোরআন হেদায়াত ও রহমতে পরিণত হয়। কেননা তাদের অন্তর উদার। নমনীয় ও স্বচ্ছ হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালার এই কেতাবের সাহচর্যে তারা পরম শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করে, কোরআনে যে হেদায়াত ও আলো রয়েছে তা অর্জন করে। তার মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে। কোরআনের সাথে তাদের গভীর পরিচিতি, ঘনিষ্ঠতা ও সমন্বয় গড়ে ওঠে এবং তারা অনুভব করে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্য এবং পথের স্বচ্ছতা। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যে পরিমাণ সংবেদনশীলতা উদারতা ও মহানুভবতা রয়েছে এবং যে পরিমাণ উচ্চাভিলাষ, মর্যাদা ও ভালোবাসা অর্জন করতে চায়, এই কোরআন ঠিক সেই পরিমাণেই তাকে হেদায়াত দান করে। তাই বলা যায় যে, কোরআন এমন একটা প্রাণবন্ত সত্ত্বা যা বন্ধু-প্রতিম হৃদয়গুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং যারা তার দিকে এগিয়ে আসে, তাদের দিকে সেও ভাবাবেগ সহকারে এগিয়ে যায়।

'যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও আখেরাতে বিশ্বাস করে।' তাদের সম্পর্কেই ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলকাম।'

এ কথা স্বতসিদ্ধ যে, যে সুপথ প্রাপ্ত হয়, সে-ই সফলকাম হয়। কেননা সে আলোর পথের যাত্রী, সে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে, দুনিয়ার জীবনে সে গোমরাহী থেকে মুক্ত এবং আখেরাতেও গোমরাহীর কুফল থেকে মুক্ত। এই পৃথিবীতে জীবন যাপনকালে সে নিশ্চিন্ত যে, সমগ্র প্রকৃতি ও সৃষ্টিজগতের সাথে সে পুরোপুরি একাত্ম। তাই সে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি সখ্য অনুভব করে।

আল্লাহ তায়ালার কেতাব দ্বারা হেদায়াত তথা সুপথপ্রাপ্ত সেসব সৎলোক যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়। আখেরাতে বিশ্বাস করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম– এরা একটা গোষ্ঠী। আর এদের বিপরীতে রয়েছে আরো একটা গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীটা সম্পর্কে ৬ ও ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা মন ভোলানো কথা কিনে আনে .... '

'লাহউল হাদীস' শব্দটা দ্বারা এমন কথা বুঝানো হয়েছে যা মনকে উদাসীন করে দেয়, সময়ের অপচয় ঘটায়, কোন সুফল বয়ে আনে না এবং তা দ্বারা এমন কোন জিনিস অর্জিত হয় না, যা এই পৃথিবীতে কল্যাণ, ন্যায় বিচার ও সার্বিক সংস্কারের কাজ করার জন্য খেলাফতের দায়িত্বে নিয়োজিত মানুষের মৌলিক দায়িত্ব পালনে কোন সাহায্য করে। খেলাফতের এই দায়িত্বের প্রকৃতি, চৌহদ্দী, তা পালনের উপায়-উপকরণ ও পথ-পন্থা ইসলামই নির্ধারণ করে দিয়েছে। আয়াতে 'এমন কিছু লোক রয়েছে' বলে যে শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে, তা সকল যুগে সকল স্থানে পাওয়া যায়। কিছু কিছু বর্ণনায় জানা যায় যে, এ দ্বারা রসূল (সঃ)-এর যুগের একটা বিশেষ ঘটনার দিকে ইংগীত দেয়া হয়েছে।

নযর ইবনুল হারেস পারস্যের কীংবদন্তী, তাদের জাতীয় বীর ও যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী সম্বলিত পুস্তকাদি কিনতো, তারপর যে পথ দিয়ে মুসলমানরা রসূল (স.)-এর কাছে কোরআন শুনতে যেতো, সেই পথের পাশে বসে পড়তো। সেখানে বসে তাদেরকে সেই সব কিংবদন্তী ও কেসসা কাহিনীর দিকে আকৃষ্ট ও কোরআনের কেসসা কাহিনীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করার চেষ্টা করতো। আয়াতটা এই বিশেষ ঘটনার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে-এ কথা সত্য হলেও এর ভাষা এ ঘটনার

চেয়েও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এতে স্পষ্টতই বিশেষ ধরনের গুণবৈশিষ্ট সম্বলিত এমন এক শ্রেণীর মানুষের ছবি এঁকে দেয়া হয়েছে, যা সর্বকালেই পাওয়া যায়। মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ে, যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল, তখনই এ শ্রেণীর কিছু লোক মক্কায় বিদ্যমান ছিল।

'কিছুলোক মন ভোলানো কথা খরিদ করে।'

অর্থাৎ নিজের অর্থ সম্পদ, সময় ও আয়ুষ্কালের ন্যায় বহু মূল্যবান জিনিসের বিনিময়ে এই সস্তা জিনিস খরিদ করে। তাদের সীমাবদ্ধ জীবন এতে ব্যয়িত হয় অথচ তা আর কখনো ফিরে আসবে না এবং ফিরিয়ে আনাও যাবে না। এই সব দামী দামী সম্পদ দিয়ে তারা এই মনভোলানো কেসসা কাহিনী খরিদ করে শুধু এই উদ্দেশ্যে যেন, 'তারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে মানুষকে বিপথগামী করতে পারে......... '

বস্তুত এ ধরনের লোকেরা হয়ে থাকে সর্ম্পূণ অজ্ঞ ও মূর্খ। কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে তারা কোনো কাজ করে না এবং সুবিবেচনার আলোকে তারা কোন লক্ষ্য স্থির করে না। তারা যা-ই করে খারাপ উদ্দেশ্যে করে। আল্লাহর পথ থেকে নিজেকেও বিচ্যুত করতে চায়, অন্যকেও বিচ্যুত করতে চায়। আর এই কদর্য উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের মূল্যবান আয়ুষ্কালকে এই নিকৃষ্ট ধরনের মন ভোলানো কাজে ব্যয় করে। তারা বেয়াদব ও উচ্ছৃংখল। তাই আল্লাহ তায়ালার পথ তাদের কাছে উপহাসের ব্যাপার। তিনি মানুষের জন্য যে জীবন বিধান রচনা করে দিয়েছেন, তা তাদের ব্যংগ-বিদ্রূপের বিষয়। এ জন্য এই শ্রেণীর পূর্ণাংগ পরিচয় দেয়ার আগেই তাদেরকে অপমানজনক শাস্তির দুঃসংবাদ দিয়েছে, 'তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' এখানে শাস্তিকে 'অপমানজনক' বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যেই যে, তারা মহান আল্লাহর মহিমান্বিত দ্বীনকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাধ্যমে যেভাবে অবমাননার শিকার করতো, ঠিক সেইভাবে আল্লাহ তায়ালাও তাদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

এরপর এই শ্রেণীর বাদ বাকী পরিচয় দেয়া হচ্ছে ৭ নং আয়াতে,

'আর যখন তাকে আমার আয়াতগুলো পড়ে শোনানো হয় তখন এমন দম্ভের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে যেন তা সে শোনেইনি'

এখানে এমন একটা সচল দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যা তাচ্ছিল্যের সাথে ও অবমাননাকর পন্থায় সদম্ভে প্রত্যাখ্যানকারীর আচরণকে চিত্রিত করে। তাই এমন একটা অপমানজনক ভাষায় তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা তার এই আচরণকে আরো হীন ও তুচ্ছ আকারে তুলে ধরে। বলা হয়েছে,

'যেন তার উভয় কানে কোন ভারী জিনিস রয়েছে।'

আর তার কানের এই ভারী জিনিস যেন তাকে আল্লাহ তায়ালার আয়াত শুনতে বাধা দেয়। নচেত যার কান আছে, সে এগুলো শুনে এমন জঘন্যভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। অতপর এই তাচ্ছিল্যজনক বর্ণনাকে পূর্ণতা দেয়া হয়েছে বিদ্রূপাত্মক হুমকির মধ্য দিয়ে,

'অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।'

এই বিষয়ে সুসংবাদ দান এক ধরনের অপমানজনক হুমকি ছাড়া কিছু নয়। এ ধরনের হুমকি একমাত্র দাম্ভিক বিদ্রূপকারীদেরই উপযুক্ত।

প্রত্যাখ্যানকারী দাম্ভিক কাফেরদের আলোচনা প্রসংগে এবার সৎকর্মশীল মোমেনদের বিষয় আলোচিত হচ্ছে, যাদের সম্পর্কে সূরার শুরুতেই বক্তব্য এসেছে। তবে সেখানে তাদের পুরস্কার সংক্ষেপে এবং এখানে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বাগিচাসমূহ।.......'

পবিত্র কোরআনের যেখানেই ভালো প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তার পূর্বে ঈমানের সাথে সৎকাজ করার উল্লেখ রয়েছে। বস্তুত ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের প্রকৃতিই এমন যে, তার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস নিছক সুপ্ত, নিস্ক্রিয় ও নিশ্চল বিশ্বাস হিসাবেই থেকে যেতে প্রস্তুত হয় না বরং তা একটা জীবন্ত সক্রিয় ও সচল বিশ্বাসে পরিণত হতে চায় এবং নিজেকে কাজে, কর্মে ও আচরণে প্রকাশ না করে অন্তরে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে রাযী হয় না। বিবেক ও মনমগযের জগতে তা যে রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে বিরাজমান, বাস্তব জগতে লক্ষণীয় আলামতের মাধ্যমে নিজের সেই রূপ ও প্রকৃতিকে প্রকাশ না করে সে ক্ষান্ত হয় না।

'যারা ঈমান এনেছে ও ঈমানকে সৎ কাজের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করেছে, তাদের জন্য নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত রয়েছে, যার মধ্যে তারা চিরদিন বসবাস করবে আল্লাহ তায়ালার সত্য ওয়াদা হিসাবে।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অভ্রান্ত ও অলংঘনীয় ওয়াদা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই এই জান্নাত ও জান্নাতে চিরস্থায়ী বসবাস তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। বস্তুত এটা আল্লাহ তায়ালার অতি বড় করুণা যে, তিনি তাঁর বান্দাহদের সাথে ওয়াদা করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করাকে বাধ্যতামূলক ও অপরিহার্য করে নিয়েছেন। অথচ এ কাজটা করেছেন তাদের সেই সৎকর্মের প্রতিদান হিসাবে, যা তারা আল্লাহ তায়ালার কোনো উপকারের জন্য নয় বরং নিজেদের উপকারের জন্যই করে থাকে। কেননা তিনি কারো কাছ থেকেই কোন উপকার বা অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী নন।

সৃষ্টিজগতের পাতায় পাতায় আল্লাহর নিদর্শন

'আর তিনি মহাপরাক্রমশালী মহাকুশলী।'

অর্থাৎ নিজের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষমতা তার রয়েছে এবং সৃষ্টি করা, ওয়াদা করা ও ওয়াদা বাস্তবায়নের কলাকৌশল তার জানা আছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মহান আল্লাহ যে এতো ক্ষমতার অধিকারী এবং এত বিজ্ঞ কুশলী তার লক্ষণাদি ও নিদর্শনাবলী কোথায়? আর এ সূরায় তাওহীদ, আখেরাত, রেসালাত ও অন্য যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তার প্রমাণই বা কী? এর জবাবে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ সবের নিদর্শনাবলী ও সাক্ষাৎ প্রমাণ হলো এই বিশাল ও প্রকান্ড মহাবিশ্ব, যার সম্পর্কে কোনো মানুষ দাবী করতে পারে না যে, এটাকে সে অথবা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে। এ বিশ্বজগতের পরিচালনা ব্যবস্থা এত সুষ্ঠু সুশৃংখল ও ভারসাম্যপূর্ণ যে, তা সকলের মনমগযকে স্তম্ভিত করে দেয়। প্রতিটি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের সামনে তা এতো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ যে, কেউ তা উপেক্ষা করতে পারে না এর মহান স্রষ্টার একত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং তাঁর সাথে যারা অন্য কাউকে শরীক করে তাদেরকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্যের প্রতি অত্যাচারকারী ও বিপথগামী বলে আখ্যায়িত না, করে পারে না। (আয়াত ১০-১১)

এখানে যে আকাশের কথা বলা হয়েছে, তার সম্পর্কে জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনায় না গিয়েও নিছক বাহ্যিক অর্থের আলোকেই বলা যায় যে, এই সুপ্রশস্ত আকাশ মানুষের দৃষ্টি ও অনুভূতিকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে। যে মহাশূন্যের প্রকৃত রহস্য ও চতুঃসীমা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না, সেই মহাশূন্যে প্রদক্ষিণরত ও পরিভ্রমণরত গ্রহনক্ষত্র, ছায়াপথ ও নিহারীকাগুলোকেই আকাশ মনে করা হোক অথবা খালি চোখে দৃশ্যমান আমাদের মাথার ওপরের

এই আকাশকেই আকাশ বলা হোক– এর কোলে বহু অতিকায় সৃষ্টি কোন স্তম্ভ বা খুঁটি ছাড়াই ঝুলন্ত রয়েছে। মানুষ তার দৃষ্টিসীমার ভেতরে এ সব সৃষ্টির কোনো কোনোটা দিনে বা রাতে দেখতে পায়।

এসব সৃষ্টির বিশালত্বের প্রকৃত পরিমাণ উপলব্ধি না করলেও খালি চোখে এগুলোর আপাত দৃশ্যমান কুলকিনারাহীন বিশালত্ব দেখে যে কোন মানুষের স্নায়ুতন্ত্রী শিহরিত হয় ও মাথা ঘুরে যায়। কী বিস্ময়কর শৃংখলা সমন্বয় এই সৃষ্টিগুলোকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ রাখে এবং কী অতুলনীয় সৌন্দর্য দ্বারা এগুলো দৃষ্টিকে বিমোহিত, মনকে চিন্তা গবেষণায় অনুপ্রাণিত ও স্নায়ুকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তা অভাবনীয়। এমতাবস্থায় মানুষ যদি জানতে পারে যে, মহাশূন্যে সন্তরণরত এসব সৃষ্টির প্রত্যেকটার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের চেয়ে বহুগুণ বড় এবং পৃথিবী সেগুলোর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ ছোট, তাহলে তার মনোভাব কী হতে পারে, ভেবে দেখার মতো।

মহাশূন্যের এই দুর্জেয় রহস্য সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে 'তিনি আকাশকে এমন কোন স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাও' এই কথাটা বলার পর আয়াতের পরবর্তী অংশে ক্ষুদ্র পৃথিবীর দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। পৃথিবীটা এতই ক্ষুদ্র যে, বিশালায়তন মহাবিশ্বের সামনে তা একটা বিন্দুর সমান। অথচ মানুষ এই পৃথিবীটাকেও এত প্রশস্ত দেখতে পায় যে, কোন ব্যক্তি তার সমগ্র জীবন পৃথিবী পরিভ্রমণে কাটিয়ে দিলেও সে এর শেষ প্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। আয়াতে এই পৃথিবীর দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে যাতে সে এদিকে সচেতন দৃষ্টি দেয় এবং যাতে এই পৃথিবীর বিস্ময়কর দৃশ্যগুলোর ওপর বারবার দৃষ্টি দেয়ার এক-ঘেয়েমি দূর হয়,

'আর পৃথিবীতে তিনি বহু নোঙ্গর ফেলেছেন, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। ....'

নোংগর দ্বারা পাহাড় পর্বতকে বুঝানো হয়েছে। ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের কিছু উঁচু নীচু জায়গা থাকে, যা ভূ-গর্ভের প্রচন্ড ঠান্ডা থেকে জন্মে। ঠান্ডার জন্য ভূ-গর্ভে গ্যাস জমাট বাঁধে ও তার আকৃতি সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের আকৃতি আঁকাবাকা ও উঁচু নীচু হয়ে যায়। এ কারণে কোথাও উঁচু পাহাড় পর্বত আবার কোথাও নিম্ন জলাভূমির সৃষ্টি হয় এবং সেটা ঠান্ডার দরুন গ্যাসের আকৃতির আভ্যন্তরীণ ওঠানামার তারতম্য অনুসারেই হয়। ভূ-তত্ত্ববিদদের এ মতবাদ ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক। আল্লাহ তায়ালার কেতাব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে, এসব পাহাড় পর্বত পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে। এগুলো থাকার কারণে পৃথিবী কোনো দিকে হেলে পড়ে না, দোদুল্যমান হয় না; বা নড়বড়ে হয় না। ভূ-তত্ত্ববিদদের মতবাদ সঠিকও হতে পারে। আভ্যন্তরীণ গ্যাসের ওঠানামা ও ভূ-পৃষ্ঠের এখানে সেখানে চুপসে যাওয়ার সময় হয়তো পাহাড় পর্বত তার ভারসাম্য রক্ষা করে। পাহাড় পর্বতের উচ্চতা ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও কোথাও ধ্বসে যাওয়া বা দেবে যাওয়ার পরিপূরক হয়ে থাকতে পারে। যা হোক, আল্লাহ তায়ালার কথা সর্বাবস্থায় সবার ওপরে থাকবেই। কেননা তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী।

'এবং তিনি এই পৃথিবীতে সব ধরনের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন।'

এটা পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব এমন এক রহস্য। যার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে-এমন দাবী আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। প্রাণের প্রাথমিক ও আদি রূপ-যা একটা ক্ষুদ্র, মামুলী ধরনের কোষের ভেতরে অবস্থান করে, সেটাই এক মহা রহস্য। উপরন্তু সেই প্রাণ যদি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ও বিভিন্ন দেহের সাথে মিলিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং এত

ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে, যার কোন সীমা-সরহদ মানুষের জানা থাকে না। তাহলে সেই রহস্য কতো বড় হয়ে দাঁড়ায় ভেবে দেখার মতো। তথাপি মানুষ এসব বিস্ময় ও রহস্য দেখেও না দেখার ভান করে। এমনভাবে এর পাশ দিয়ে চলে যায়, যেন একটা নগন্য জিনিসই দেখেছে এবং তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার কিছু নেই। পক্ষান্তরে তারা মানুষের তৈরী একটা অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং তা দেখে তাদের সংজ্ঞা লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। অথচ একটা জীবন্ত প্রাণকোষ এবং তার বিস্ময়কর ও সুসংবদ্ধ তৎপরতা মানুষের তৈরী যে কোন যন্ত্রের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং তার নির্মাণ শৈলী মানুষের জ্ঞানের সীমারেখারই বাইরে। জটিল প্রাণীগুলোর কথা এবং মানুষের কথা না হয় বাদই থাকুক– যাদের দেহে শত শত বিস্ময়কর রাসায়নিক কারখানা, বন্টন ও সংরক্ষণের জন্য শত শত রক্ষণাগার। তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য শত শত বেতার কেন্দ্র এবং শত শত এমন ধরনের জটিল কর্মকান্ড রয়েছে, যার রহস্য একমাত্র মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

'আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি .... সুন্দর জিনিসপত্র উৎপাদন করিয়েছি। (আয়াত ১০)

এখানে আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত মেঘমালা থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, আসমান থেকে পানি বর্ষণ প্রকৃতি জগতে আল্লাহ তায়ালার বিস্ময়কর কুদরত ও অসীম ক্ষমতারই এক নিদর্শন। বারিধারার এ প্রবাহ বে-খবর লোকদের শিক্ষার জন্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

আসমান থেকে বর্ষিত এ বৃষ্টির পানির প্রবাহ বৃক্ষরাজীকে সজীব করে তোলে। নদ নদী ও সমুদ্রকে কানায় কানায় ভরে তোলে, আর ঝর্ণাধারাকে করে তোলে প্রবাহমান।

আসমান থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণের মাধ্যমে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার এক অতীব সুক্ষ্ম সম্পৃক্ততার প্রক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, অথচ আসমান ও যমীনের মধ্যে এর নিয়মাবলীর মধ্যে অনেক দূরত্ব ও ব্যবধান বিদ্যমান, আর তার প্রকৃতি ও কৌশলগত দিকের মধ্যেও রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য।

বর্ষণের পর সে পানির সাহায্যে যমীনের বুক চিরে চারাগাছ উদগমের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালার অভিনব কৌশলের প্রমাণ নিহিত রয়েছে। এ এমন এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়া, যার অব্যাহত ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত আর সমাপ্ত হয় না। সে চারাগাছের উদ্ভাবন, তার পরিবর্ধন, তার সজীবতা, তার বৈচিত্রময় আকৃতি, পৃথক পৃথক বৈশিষ্টমন্ডিত ডালপালার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাদের বংশধারা বিস্তারের অভিনব পদ্ধতি, প্রথম উদগমের পর কচি চারাগাছ আকৃতি থেকে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হওয়া এ বৃক্ষরাজীর নানাবিধ রূপ ও আকৃতি ধারণ বিচিত্র স্বাদের বর্ণের ও আকৃতির ফলফুল, পুষ্টি ও হৃদয়ের শক্তিবর্ধক রোগ প্রতিষেধক মূল্যবান ফল ফলাদির প্রতিও লক্ষ্য করুন, এ সব কিছু কি আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের গভীর উপলব্ধি ও চেতনাকে বিকশিত করে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়কে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দেয় না? মূলত এসব কিছুই হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি, তার সীমাহীন কুদরতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও বিশ্বাসবাদী জীবন চেতনার উৎস।

এখানে আল কোরআন তার এ সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা এ মহাসত্যকে স্বতসিদ্ধভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক উৎপাদিত এ গাছগুলোকেও তিনি যুগলভাবে সৃষ্টি করেন। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে,

'কল্যাণকরভাবে তিনি সব কিছুই যুগল সৃষ্টি করেছেন।'

এসব কিছুকে তিনি সন্দেহাতীতভাবে এমন প্রক্রিয়ায় নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তারা যুগলভাবে উদগম হওয়ার পর অত্যন্ত অন্তরংগ পরিবেশে কাছাকাছি থেকে যুগলভাবেই বেড়ে ওঠে। প্রতিটি উদগত কচি চারাগাছই পৃথক পৃথক স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট সংরক্ষণ করে নর ও মাদা হিসাবে বর্ধিত হতে থাকে। কখনও এক বৃন্তে বা একই ডালে, নর-নারী একত্রে তাদের শিশু থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে পূর্ণতা ও বার্ধ্যকে উপনীত হয়। আবার কখনও একই কলি ও বৃন্তে একই ডাল ও শাখায় অথবা পৃথক পৃথক বৃন্তে, ডালে ও আলাদা আলাদা বৃক্ষ রূপে পরিবর্ধিত হতে থাকে। এমনভাবে যুগল উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজী তাদের কর্ম তৎপরতাকে অব্যাহত রাখে, ফলফুল ফসল প্রদান করে। পূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়ে মানব সমাজের ও প্রাণীকূলের অনুরূপ তাদের প্রাকৃতিক জীবন ধারা অতিবাহিত করে।

এখানে 'যাওজ' শব্দটিকে 'কারীম' শব্দ-এর বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যুগল সৃষ্টি এক মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ মেহেরবাণীতে সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ে মানব বংশের সৃষ্টি বর্ধিত হচ্ছে এবং এর সাথে প্রতিটি নব নব সৃষ্টি সংযোজিত হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা প্রচ্ছন্নভাবে মানবকূলের দৃষ্টির সামনে এ প্রশ্ন উত্থাপন করছেন, এ যে সম্প্রসারিত সৃষ্টিকূল যে বৃক্ষ ও তৃণলতার প্রতিটি প্রভাবে নব নব সংস্করণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হচ্ছে এ সব কি একমাত্র আমারই সৃষ্টি নয়? মানব সমাজকে চ্যালেঞ্জ ও হুমকির ভাষায় এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে, বলো আমার সৃষ্টির বাইরে যাদেরকে তোমরা আমার সাথে শরীক বানাচ্ছো আমার অংশীদারিত্বে যাদের জড়িত করছো তাদের সৃষ্ট বস্তু প্রাণীকূল কোথায়? বলা হয়েছে,

'আমাকে দেখিয়ে দাও, আমি আল্লাহ ছাড়া অপর যে সকল শক্তির সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে বলে তোমরা মনে করো তাদের সৃষ্টি কোথায়?' (আয়াত ১১)

অতপর এ চ্যালেঞ্জের পর সমকালীন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা চূড়ান্ত রায় প্রদান করে বলেছেন,

'এসবই তো আল্লাহর সৃষ্টি, অতপর আমাকে দেখাও আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে স্রষ্টা মনে কর তাদের সৃষ্টি কোথায়? আসলেই এ সকল যালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে ও গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।'

এখানে বিভ্রান্তি ও যুলুম বলতে আল্লাহর সাথে শেরেকের যুলুম-এর বিভ্রান্তিকে বুঝানো হয়েছে। আর যুলুম হচ্ছে আল্লাহর সাথে শেরেকে লিপ্ত হওয়ার অনধিকার চর্চা। আল্লাহর সাথে শেরেক করার চেয়ে বড় যুলুম আর কী হতে পারে? প্রকৃতির বুকে আল্লাহর অনন্ত সৃষ্টিকূলই তো আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ তথা একক একচ্ছত্র ক্ষমতার সুস্পষ্ট ও জ্বলন্ত প্রমাণ।

এ সকল শক্তিশালী সুস্পষ্ট প্রমাণ উত্থাপনের মাধ্যমে এ সূরার হৃদয়গ্রাহী প্রাণস্পর্শী প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রথম স্তরের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলো সমাপ্ত করা হয়েছে।

হযরত লোকমানের উপদেশনামা

অতপর দ্বিতীয় স্তরের প্রমাণ ও তার প্রভাবকে উত্থাপন করে নতুন পদ্ধতিতে নতুন ঘটনাসমূহ ও তাৎপর্যের আলোকে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এক আল্লাহর শোকর আদায়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট রোগের প্রতিষেধক, শেরেক থেকে পবিত্র হওয়ার পন্থা এবং ঘটনার পশ্চাতে অপর একটি প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আমি লোকমানকে হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছি; যেন সে, আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে। ....তিনি পরম প্রশংসিত।' (আয়াত ১২)

এ পর্যায়ে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা হযরত লোকমানের প্রসিদ্ধ ঘটনাকে কোরআনুল কারীমে তাওহীদের জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবে তার নিজের ভাষা দিয়েই প্রমাণ করার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রসংগও হযরত লোকমানের ঘটনায় তিনি উপস্থাপন করেছেন।

হযরত লোকমান সম্পর্কে কারো কারো অভিমত হচ্ছে, তিনি নবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনেকেরই মত হচ্ছে তিনি আল্লাহ তায়ালার একজন নেক বান্দা, জ্ঞানী পন্ডিত ও বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– তিনি নবী ছিলেন না। অধিকাংশের নিকট দ্বিতীয় অভিমত গ্রহণযোগ্য। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি শাসক ও বিচারক ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের বিচারক মন্ডলীর একজন বড়ো বিচারক ছিলেন। আবার কেউ কেউ তাকে ইরিত্রিয়ার কাফ্রী ক্রীতদাস বলে উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আল কোরআনের ভাষ্যের ওপর যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করে এ মতকেই প্রাধান্য দিতে পারি যে, কোরআনে হাকীমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ জাল্লা-শানুহু উল্লেখ করেছেন যে, আমি লোকমানকে এমন প্রজ্ঞা দান করেছি যে প্রজ্ঞা তাকে আল্লাহর শোকর আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে।

'আমি অবশ্যই লোকমানকে আল্লাহর শোকর আদায়ের জন্য হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছি।' (আয়াত ১২)

এ হচ্ছে এমন এক শিক্ষা ও ব্যাখ্যা যাতে কোরআনে হাকীমে ইংগিত করা হয়েছে যে, লোকমান-এর পান্ডিত্য ও গভীর জ্ঞান তাকে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায়ের বৈশিষ্টমন্ডিত করেছে। মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী প্রজ্ঞাবান, তারাও এ প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তির অনুসরণ করে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। পান্ডিত্যের প্রমাণ নাস্তিকতা নয়; পান্ডিত্যের ও প্রজ্ঞার নিদর্শন ও প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি স্বীকৃতি ও আস্থাবান হওয়া এবং আল্লাহর শোকর আদায় করা। আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত আয়াতে প্রজ্ঞাবান গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী লোকমানের এ ঘটনাকে পরবর্তী মানব গোষ্ঠীর মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী– তারা অবশ্যই আল্লাহর শোকর আদায় করার শিক্ষা গ্রহণ করবে, এ জন্যই তিনি এ ঘটনাকে বাছাই করেছেন।

আয়াতের শেষ অংশটুকু দ্বারা মহান রাব্বুল আলামীন অপর একটি শিক্ষা ও তাৎপর্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। বলা হয়েছে মানুষ কর্তৃক রাশি রাশি শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা মহান আল্লাহ তায়ালার কোনো ফায়দা নেই। বরং এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও শোকরিয়া আদায়ের মধ্যে আদায়কারীরই উপকার নিহিত রয়েছে। মানুষ তার শোকরিয়া আদায় করুক এ জন্য আল্লাহ তায়ালা লালায়িত ও মুখাপেক্ষী নন। বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা বান্দাই লাভবান ও উপকৃত হয়। আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশের দ্বারা বান্দার নিজেই উপকার সাধিত হয়।

আল্লাহ তায়ালা বে-নিয়ায ও অভাবমুক্ত। আল্লাহ তায়ালা ও তার সত্ত্বা এমনিই প্রশংসিত। সৃষ্টিলোকের কেউ তার হামদ ও শোকর আদায় না করলেও তিনি প্রশংসিত। তাই কোরআনে হাকীমে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

'যে শোকর করে সে তা নিজের জন্যই করে, আর যে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে (তার জেনে রাখা উচিৎ যে) আল্লাহ তায়ালা অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।' (আয়াত ১২)

এ ঘোষণা থেকে স্বতসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, যারা তাদের প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যের দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও তার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার মহামূল্যবান সম্পদকে অস্বীকার করে তাদের চেয়ে আহমক আর কেউ হতে পারে না।

অতপর পরবর্তী আয়াতসমূহে এ বিশ্বনন্দিত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি লোকমান কর্তৃক সমকালীন তরুণ সমাজকে লক্ষ্য করে উপদেশ প্রদান তথা ওসীয়তের ভাষায় বলা হচ্ছে,

'যখন লোকমান তার সন্তানদেরকে (সমকালীন যুব সমাজকে সমবেত করে) বললেন, হে আমার সন্তান! আল্লাহর সাথে শেরেকে লিপ্ত হয়ো না। নিশ্চয়ই শেরেক হচ্ছে জঘন্যতম যুলুম।' (আয়াত ১৩)

এ ছিল সমাজের শীর্ষস্থানীয় এক জ্ঞানী পিতা কর্তৃক তার সন্তানদের (তথা সমকালীন যুব সমাজের প্রতি) প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বাণী। তিনি উপদেশ স্থলে তাদের প্রতি এ নসীহত প্রদান করেছেন। পিতা আসলে কখনও সন্তানের কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই কামনা করেন না। পিতা কখনও সন্তানকে নসীহত করা ছাড়া থাকতে পারে না।

তাই প্রসিদ্ধ জ্ঞানী লোকমান সন্তানদেরকে শেরেক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন, আর এ বিরত থাকার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, শেরেক হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধরনের যুলুম। এর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে তিনি দু-দু'বার জোর দিয়ে বাক্যটি বলেছেন। প্রথম হচ্ছে 'ইন্না' শব্দটি সুনিশ্চিত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার যুলুম শব্দের পূর্বে 'লাম' শব্দটি 'অবশ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় 'সুনিশ্চিতভাবে অবশ্যই শেরেক হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ।'

আয়াতটি তৎকালীন আরব সমাজের শেরেক তথা এ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত থাকার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত ও দ্বন্দ্বের মূল বিষয়টিই ছিলো তারা তাওহীদকে বর্জন করে এ জঘন্য পাপাচার তথা শেরেকে লিপ্ত ছিলো। অথচ কোরায়শসহ তৎকালীন আরব সম্প্রদায় রাসূলের বিরুদ্ধে এ অপবাদ ও অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো যে, তাদের শেরেকমুক্ত খালেস তাওহীদের দাওয়াতের তিনি তাদের কর্তৃত্ব, প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হতে অপসারিত করে নিজ কর্তৃত্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চান।

শেরেক বর্জন করে রাসূল কর্তৃক উত্থাপিত তাওহীদের দাওয়াতকে গ্রহণ করলে তাদের কর্তৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও কায়েমী স্বার্থ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এ আশংকা তারা করছিলো। তাই রাসূলের বিরুদ্ধে শেরেক বর্জনের দাওয়াতের আড়ালে ক্ষমতা দখলের প্রয়াসের অভিযোগ তারা উত্থাপন করেছিলো।

এখানে স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী সমকালীন যুব সমাজের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল ও নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় কি লোকমানের মনেও বিদ্যমান ছিলো? সমাজে প্রভাব, প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব তো তার প্রতিষ্ঠিত ছিলই। অথচ হযরত লোকমান তার সন্তানদেরকে উপদেশ প্রদানের মধ্যে কোন স্বার্থপর মানসিকতাই বিদ্যমান ছিলো না। পিতা কর্তৃক সন্তানদের উপদেশ বাণীর মধ্যে কোনো প্রকার স্বার্থপরতার সাথে দূরতম সম্পর্কও কল্পনা করা যায় না! বরং আয়াত থেকে এ মহাসত্য উদ্ভাসিত হচ্ছে যে, এ চিরন্তন কালজয়ী নীতিই আবহমানকাল থেকে চলে আসছে যে, সৃষ্টিকূলের মধ্যে যাদের আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত হেকমাত ও প্রজ্ঞার অধিকারী করেন তারা নিস্বার্থভাবে স্বীয় সন্তানদের কল্যাণ কামনাই করে থাকেন। তাদের উপদেশ ও নসীহতের আড়ালে মানব সমাজের কোনো ক্ষতির চিন্তা লুকায়িত থাকে না। কোনো খারাপ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তারা কাউকে নসীহত করেন না। এ মনস্তাত্তিক যুক্তিটিও আলোচ্য আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে।

মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ

প্রকৃতপক্ষে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার উপদেশমালার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থপরতা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতা নয় বরং তার আড়ালে এক অবর্ণনীয় অকল্পনীয় আপাত্য স্নেহ-মমতা ও সন্তানের কল্যাণ কামনার মধুর সম্পর্কই লুকায়িত থাকে। আর এ সম্পর্ক হচ্ছে সন্তানের প্রতি পিতৃস্নেহের এক জীবন্ত রূপ। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আমি মানবকূলের প্রতি তাদের পিতামাতার সৌজন্যমূলক আচরণের নির্দেশ প্রদান করেছি। ......আর আমি তোমাদের সকল কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবগত করাবো।' (আয়াত ১৪)

আল্লাহ তায়ালা সন্তানদেরকে মাতাপিতার প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে উপদেশ প্রদান করেছেন। বিশেষ করে মায়ের প্রতি সন্তানের খেদমতের ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্বসহ উপদেশ দেয়া হয়েছে অথচ সন্তানের তার পিতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে তেমন কিছু এখানে উল্লেখ করেননি। কেননা সন্তানের গর্ভ ধারণ, প্রসবকালীন ও শিশুর দুগ্ধপান করানো ও লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মা-ই বেশী কষ্ট ও যাতনা ভোগ করেন। বিশেষ করে উল্লেখিত বিশেষ অবস্থায় সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ও গর্ভে সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে মা-ই অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেন। আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতিগতভাবেই পিতার চেয়ে মায়ের প্রতি এ সুনির্দিষ্ট সময়ে সন্তান লালন-পালনের অধিকতর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

তাই প্রকৃতিগতভাবেই ভাবী বংশধরের লালন পালন ও তাদের সুন্দর জীবন গঠনের দায়িত্ব জীবনের প্রথম স্তরে মায়ের ওপরই অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা মাতাপিতার হৃদয়ে সন্তানের প্রতি মায়া মমতার এক অনুপম চেতনা সৃষ্টি করে রেখেছেন। মা-বাপ তাদের সন্তানের জন্য তাদের দেহের প্রতিটি রক্তকণা, অংগ-প্রত্যংগ, জীবন ও অর্থ সম্পদ– আল্লাহ প্রদত্ত এ মমতা ও স্নেহের কারণেই অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারেন। সন্তানের প্রতি এসব ত্যাগের মধ্যে তাদের অন্তরে কোন মানসিক উদ্বিগ্নতা-দুশ্চিন্তা আফসোস থাকে না। বরং মাতা-পিতা প্রফুল্ল হৃদয়ে হাসি খুশী ও পরম আনন্দের সাথে সন্তানের জন্য সকল কিছু পরিত্যাগ করেন। নিজে কষ্টে ও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করেও সন্তানকে তা বুঝতে দেন না। অনেক কষ্ট সহ্য করেও সন্তানের সকল দাবী, আবদার ও প্রয়োজন পূরণ করেন। তাই মাতা-পিতার প্রতি এ ব্যাপারে উপদেশ প্রদানের প্রয়োজনীয়তাকে এতো গুরুত্বপূর্ণ করে দেখানো হয়েছে। মা-বাপ যেন প্রকৃতিগতভাবেই এ বোঝা বহনের দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। স্বেচ্ছায় সানন্দে এ দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে তারা তুলে নিয়েছেন।

তাই প্রকৃতিগতভাবে সন্তানের প্রতি পিতামাতার সাথে আচরণের ক্ষেত্রে উপদেশসমূহের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে। সন্তানদের জন্যই উপদেশের প্রয়োজন। মাতা-পিতাই ভাবী বংশধরদের চিন্তা, গবেষণা, পরিকল্পনা শ্রম সাধনা দুঃখ যাতনায় স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সকল কিছু অকাতরে বিলিয়ে দেন। সন্তানের জীবন গঠনের পথে এমন কিছু নেই, যা তারা অকাতরে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করেন।

প্রিয় সন্তানের জীবনকে সুখী ও আনন্দময় করে তোলার জন্য ভাবী বংশধরদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য তারা তাদের হৃদয় নিংড়ানো সকল স্নেহমমতা উজাড় করে দেন। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়, রক্ত ঝরা শ্রম দেহের শোনিত ধারাকে ঘামরূপে প্রবাহিত করে সন্তান লালন পালন ও শিক্ষিত করে তোলেন। মাতাপিতার বিরামহীন প্রানান্তকর শ্রমের পর ও এ নযীরবিহীন ত্যাগ ও কোরবানীর পর যখন তারা বার্ধক্যে উপনীত হন যখন তাদের অস্থি গ্রন্থী দুর্বল হয়ে তাদের

কর্মশক্তি স্থবির হয়ে পড়ে তখন সন্তান জীবিত থাকলে মাতাপিতা তাদের ত্যাগ কোরবানীর বিনিময়ে সন্তানের কাছ থেকে সে দয়া অনুগ্রহ ফিরে পাওয়ার ন্যায্য অধিকার রাখেন। সন্তানের কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৌজন্যমূলক আচরণ প্রাপ্তি মাতা-পিতার প্রকৃতিগত পাওনা। এ পর্যায়ে আয়াতে উপদেশের মাধ্যমে মা-বাপের এ প্রকৃতগত পাওনা সন্তানের তরফ থেকে বিনিময় প্রাপ্তির হিসেবেও দেখানো হয়েছে,

'তার মা তাকে যাতনার পর যাতনা সহ্য করে গর্ভ ধারণ করেছে। অতপর মাতৃগর্ভ থেকে প্রসবের পর তার মধ্যে মায়ের দুধপান হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মেয়াদ দু বছর।' (আয়াত ১৪)

আয়াতে মায়ের এ মহান ত্যাগ ও কষ্টকে অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ভাষায় চিহ্নিত করা হয়েছে। মা-ই প্রকৃতপক্ষে গর্ভধারণ, প্রসবকালীন ও দুগ্ধ পানকালীন সময়ে শিশুর প্রতি বেশীরভাগ দায়িত্ব পালন করেন বরং বলা যেতে পারে, সম্পূর্ণ কষ্টকর দায়িত্ব স্বভাবিকভাবে মায়ের ওপরই ন্যস্ত থাকে। এ অসহনীয় বোঝা মা-ই বহন করে। মা-ই সন্তানের প্রতি অধিকতর মমতা, গভীর ও মধুময় আপাত্য স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দেয়। তাই মার প্রতি সন্তানের খেদমতের ব্যাপারে আল কোরআন ও সুন্নাহ অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রশাসনিক ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে পিতার প্রতি অবশ্য অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছে।

মায়ের হক আদায় ও খেদমতের গুরুত্ব সম্পর্কে আবু বকর বাযযার তার মোসনাদে বায্যার এ একটি হাদীস নিম্নোক্ত সনদে সংকলিত করেছেন,

'আবু বকর বায়যার বুরাইদ থেকে, বুরাইদ তার পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, এক ব্যক্তি কাবাঘরের তাওয়াফ করার সময়ে তার বৃদ্ধা মাতাকে কাঁধে বহন করে তাওয়াফ করছিলো। এ অবস্থা দেখে নবী কারীম (স.) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তোমার মায়ের হক আদায় করতে পেরেছো? যে ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি সে হক বিন্দুমাত্রও আদায় করতে পারিনি। এমনকি মায়ের যাতনাজড়িত একটি শ্বাসগ্রহণের 'হক'ও আদায় করতে পারিনি। মা গর্ভধারণকালীন অথবা প্রসবকালীন সময়ে কষ্টের কারণে একটি শ্বাস প্রশ্বাস নিক্ষেপ ও গ্রহণ যে কষ্ট করেছেন সে পরিমাণ হকটুকুও আমি আদায় করতে পারিনি। (মোসনাদে রাযযার) তাই আয়াতে বলা হয়েছে

'মা তাকে যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা সহ্য করে গর্ভ ধারণ করেছে।'

আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কারোই আনুগত্য নেই

কোরআনে কারীমে উল্লেখিত আয়াতের প্রেক্ষিতে সন্তানের প্রতি সর্বপ্রথম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠতম অবদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ দ্বারা ইসলামের মহান নীতিমালার দুটো ফরয আদায়ের দায়িত্ব সন্তানের প্রতি অর্পিত হয়েছে। প্রথম হচ্ছে আল্লাহর শোকর আদায়, অতপর মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'সর্ব প্রথম আমার অতপর তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' (আয়াত ১৪)

এতদসংগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সংযোজনকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে,

'অতপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।' (আয়াত ১৪)

বস্তুত মাতা-পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক সকল অবস্থায়ই স্নেহ মমতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। আর প্রকৃত পক্ষে শর্তহীন আনুগত্য আকীদার দিক থেকে আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত। স্তর বিন্যাসের দিক থেকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের গুরুত্বই সকলের আগে। আল্লাহর

আনুগত্যের বিপরীত হলে মাতা-পিতার প্রতি আনুগত্য এক্ষেত্রে লুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক সকল অবস্থায়ই বিদ্যমান থাকবে। তবে আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীত হলে মাতা-পিতার আনুগত্যের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কোরআনে হাকীমে এরশাদ হচ্ছে,

'মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে শেরেকে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, যে ব্যাপারে সঠিকভাবে তুমি কোন কিছুই অবগত নও, প্রাণান্তকরভাবে প্রচেষ্টা চালায় তবে এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করো না।' (আয়াত ১৫)

এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কারভাবে আল্লাহর আনুগত্যের খেলাফ হলে মাতা-পিতার আনুগত্যের ফরয বিলুপ্ত ঘোষিত হয়। সব কিছুর উর্ধে শেরেক বর্জিত তাওহীদের আকীদার প্রাধান্যই সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার স্নেহ মমতা, তাদের অবদান, তাদের শ্রম সাধনা কিছুতেই আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়াতের চেয়ে বেশী প্রাধান্য পেতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার তাওহীদের আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞতা-প্রসূত কোন কারণে মাতা-পিতার স্নেহ মমতা ও অনুগ্রহের কারণে আল্লাহর সাথে শেরেকে কখনো লিপ্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের বিপরীত সকল কর্তৃত্বকেই বর্জন করতে হবে। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপরীত সকল আনুগত্য বর্জন ও বিলুপ্তির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের অধিকারই সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক প্রাধান্য পাবে।

আয়াতের নির্দেশনার এ ব্যাপারটি গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আকীদার ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে মাতা-পিতার আনুগত্য বর্জনের নির্দেশ সত্বেও ব্যবহারিক জীবনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, মার্জিত আচরণ ও সদ্ব্যবহার ও তাদের সামাজিক সম্পর্ক সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের অধিকার আদায়ের ফরয যথাযথ অব্যাহত থাকবে। আয়াতে বলা হয়েছে,

(শেরেকে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য বর্জনের নির্দেশনা সত্ত্বেও) 'তোমরা পৃথিবীতে সামাজিক জীবন যাপনের সময় তাদের সাথে সহ অবস্থান ও সৌজন্যমূলক উত্তম আচরণের ভিত্তিতে বসবাস করবে।'

সামাজিক সহ অবস্থানের ভিত্তিতে জীবন যাপনের উত্তম আচরণভিত্তিক জীবন পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মার্জিত আচরণ মূলত শেরেক বর্জিত তাওহীদভিত্তিক বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কোন ক্রিয়াশীল প্রভাব সৃষ্টি করে না। আয়াতের পরবর্তী অংশে তাই বলা হয়েছে,

'আর তাদের পথ অনুসরণ করো, যারা আমার অভিমুখে ধাবিত হয়।' (আয়াত ১৫)

অর্থাৎ মোমেনদের পথে, যারা আমার প্রদর্শিত পথের অনুগামী, যাদের জীবনের সকল চেতনা, প্রেরণা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উৎস আমি, যারা আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই আমার প্রতি ধাবিত হয় তাদের কথাই তোমরা মেনে চলো।

'তোমাদের প্রত্যাবর্তনের স্থল আমার নিকট'। (আয়াত ১৫)

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে স্বল্পকালীন অবস্থানের পর তোমরা অনন্ত জীবনে আমার নিকটেই ফিরে আসবে। অতপর তোমরা দুনিয়ার স্বল্প পরিসর জীবনে যা কিছুই করেছো তার সকল কিছুই অনন্ত আখেরাতে আমি তোমাদেরকে অবগত করবো।

অর্থাৎ তোমাদের ভালোমন্দ সকল ক্রিয়াকান্ড তোমাদের কৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সকল পরিণাম ও পরিণতি শাস্তি ও পুরস্কার, তাওহীদ ও শেরেকের সকল আকীদা-আমল তথা সকল ব্যাপারেই আমি তোমাদেরকে সম্যকভাবে অবগত করাবো।

হাদীসে বর্ণিত আছে, সূরা লোকমানের এই আয়াত ও একই ধরনের সূরা আনকাবুত ও সূরা আহকাফের আয়াতসমুহের শানে নযুল হচ্ছে, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও তার মা সম্পর্কিত ঘটনা, তিনি ঈমান গ্রহণের পর তার মা ঈমান বর্জন করার দাবীতে অনশন ব্রত পালন শুরু করে এবং বলে যে, তুমি পিতামাতার ধর্মে ফিরে না আসলে আমি অনাহারে মরে যাবো। তার মৃত্যুবরণের হুমকি প্রদানের পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অপর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই আয়াত সা'দ ইবনে মালেক (রা.)-এর ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবরানীর বর্ণনায় সা'দ ইবনে মালেক (রা.)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম শরীফে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস-এর ঘটনার কথা উল্লেখ রয়েছে। সনদ ও বর্ণনার দিক থেকে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়ক্কাস (রা.) ও তার মা সম্পর্কিত ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। এটিই বেশী প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য। (এ সম্পর্কে আমি সূরায়ে আনকাবুতের তাফসীরে আলোচনা করেছি।)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্বকে প্রথমে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ, আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় বন্ধন, আল্লাহর হক্বের প্রতিরক্ষাকে প্রথম ফরয হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কোরআনুল কারীমে পুন পুন আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্বের প্রতি তাকিদ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব, তাওহীদকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্যের এর মূলনীতিকে সর্বাধিক ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সন্দেহাতীতভাবে কোরআনে হাকীমের বিভিন্ন সূরায় এ চিরন্তন শাশ্বত মূলনীতির চেতনা বিশ্বাস, প্রত্যয় ও অনুভূতিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মেরও হিসাব দিতে হবে

আলোচ্য আয়াতে হযরত লোকমানের ওসীয়াতের মধ্যবর্তী স্তরে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা তাওহীদ, শেরেক ও আনুগত্য সম্পর্কিত শাশ্বত মূলনীতি উপস্থাপনের পর পরবর্তী আয়াতসমূহে পুনরায় হযরত লোকমানের ওসীয়াতের ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু করেছেন। উপদেশমূলক ওসীয়াতের আয়াতে মানব জীবনের বিভিন্ন সুক্ষবিষয়ের বিবরণ, আখেরাতের ইনসাফপূর্ণ বিচার, জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মের হিসাব, মানুষের এ জীবনে মৃত্তিকার তলদেশে, সমুদ্রে, মহাশূন্যে সর্বত্রকৃত কর্মকান্ডের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম হিসাব ইত্যাদি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী প্রাণস্পর্ষী শব্দ দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। অনুপম এই রচনাশৈলী মানব হৃদয় ও অনুভূতিতে বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভাব ও শব্দ সম্ভারে সজ্জিত করে পরিবেশন করেছে। জীবন্ত ও প্রাণবন্ত চেতনা সৃষ্টিকারী, আল্লাহ সোবাহানাহু তায়ালার জটিল ও সুক্ষ সংরক্ষণ পদ্ধতিকেও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এ ওসিয়াতটি শুধু সাদামাটা এক উপদেশ আকারেই উপস্থাপিত হয়নি; বরং তাকে এক অসাধারণ ভাব গম্ভীর সুকুমার ভাষাশৈলী, পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য অনুভূতিসহ পেশ করা হয়েছে। অনন্ত জগতে আল্লাহ তায়ালার ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সুক্ষ বিচারের ও তার দৃশ্য জগতের জ্ঞানের বিবরণও তাতে সন্নিবেশিত রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে আমার বৎস। কোন বস্তু যদি– তা সরিষার বীজসম হয় অতপর তা যদি প্রস্তর খন্ডের ভেতরেও থাকে.........।' (আয়াত ১৬)

আয়াতে শুধু আল্লাহ তায়ালার সকল ব্যাপারে অবগতির জ্ঞান সম্পর্কেই উল্লেখিত হয়নি, বরং আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের গভীরতা, অসীমতা ও সুক্ষাতিসুক্ষভাবে সকল ব্যাপারে অবগতির ও গোপন রহস্য সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞানের বিষয়ও এতে শামিল রয়েছে। এতদসংগে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার অনন্ত কুদরত, বিচার দিবসে সুক্ষাতিসুক্ষ, অণুপরমাণু, সরিষাবীজ পরিমাণ

কোন কিছুর ক্ষেত্রেও ন্যায় দন্ডের তাৎপর্য ও বিশ্লেষণের দৃশ্য এতে সন্নিবেশিত রয়েছে। এ হচ্ছে অলৌকিক গ্রন্থ আল কোরআনে কোনো বিষয়কে অনুপম বর্ণনাভংগী ও রচনাশৈলীতে উপস্থাপনের এক নিজস্ব প্রক্রিয়া পদ্ধতি। এ অপরূপ সৌন্দর্যময় রচনা ও উপস্থাপন পদ্ধতি প্রকৃত পক্ষে আল কোরআনের একক বৈশিষ্ট।(১)

'সরিষার বীজ বা দানা পরিমাণ।' অংশদ্বারা এমন এক ক্ষুদ্র বস্তু বুঝানো হয়েছে, যার তেমন কোন ওযন, মূল্য বা গুরুত্ব নেই; অথচ তাও সেখানে উপস্থিত করা হবে।

'তা যদি প্রস্তরখন্ডের অভ্যন্তরেও থাকে'। অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে যা পরিদৃষ্ট হয় না, যা প্রকাশ্যে দৃশ্যমান নয়, যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অথচ সে কর্মটুকুরও হিসাব গ্রহণ করা হবে, এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও আল্লাহর আদালতে মানুষদের জবাবদিহি করতে হবে।

'অথবা থাকে যদি আসমানের কোথাও'

অর্থাৎ আকাশপুঞ্জে, দূরদূরান্তে মহাশূন্যে যার অবস্থান। যে জগতে বিশাল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্ররাজী নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। এমন জগতের একটি পরমাণু ও বিন্দু পরিমাণ একটি অবহেলিত ছোট্ট অপরাধও গুরুত্ব সহকারে মহান আদালতে সেদিন বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে।

'কিংবা থাকে যদি যমীনের কোথাও'

খুবই সামান্য যা ধূলিকণা বা পাথর কুচির সাথে মিশ্রিত বা আচ্ছাদিত হয়ে আছে, যা প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না তাও সেখানে উপস্থিত করা হবে।

'তাকেও আল্লাহ তায়ালা এনে হাযির করবেন'

এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা পরিমাণ বিষয়ের জ্ঞানও আল্লাহর এলেমের বাইরে থাকবে না। তা বাদ পড়বে না। তাও আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞান ও অনন্ত কুদরাতের আয়াত্তাধীন থাকবে।

এ ছোট্ট বাক্যটির অন্তরালে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার ক্ষুদ্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারে অবগতির দিককে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যে সব কিছুই উপস্থিত করবেন তার ঘোষণাও রয়েছে।

মহাশূন্যে, প্রস্তর খন্ডের অভ্যন্তরে, যমীনের বালুকারাজি পাথর কুচির সংমিশ্রণে যেখানে বিন্দু পরিমাণ কোন তৎপরতা ও ক্রিয়াকান্ড বিদ্যমান রয়েছে, তার সকল কিছুকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ন্যায়দন্ড ও বিচারমঞ্চে সেদিন উপস্থিত করা হবে। কোন সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ব্যাপারও সুক্ষ্মদর্শী, শক্তিমান সত্ত্বা আল্লাহর জ্ঞান ও অবগতির বাইরে থাকবে না, আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের পরিধি, অনন্ত অসীম। অদৃশ্য জগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তার জ্ঞান ও অবগতির বাইরে নয়। তিনি সকল কিছুকেই স্ব-স্ব অবস্থান থেকে বিচার দিবসে সংশ্লিষ্ট জায়গায় এনে হাযির করবেন। আল কোরআনের এই বর্ণনা ভংগীও এ উপস্থাপনা মানবচিত্তে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার প্রত্যয় ও ভীতি সৃষ্টি করে। মানুষের মনে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন, আল্লাহর কাছে রুজু হওয়া, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের অনুপ্রেরণা মানব হৃদয় উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত করে। সে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্রষ্টা গোপন রাজ্যের সব কিছু সম্পর্কেই অবগত রয়েছেন তাঁর কাছে কোন কিছুই গায়ব নয়, অনুপস্থিত নয়, অদৃশ্যমান নয়; বরং সব কিছুই তার কাছে দৃশ্যমান ও গোচরীভূত।

আল কোরআন অভিনব বিস্ময়কর পদ্ধতিতে এ মহাসত্যকে মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এ সত্যকে স্বীকৃতি প্রদান করে তাকে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়রূপে গ্রহণের শিক্ষাও আলোচ্য এই আয়াতে আমাদের দেয়া হয়েছে।

---

(১) তরীকাতুল কোরআন পরিচ্ছেদে 'আত্তাছওয়ীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে হযরত লোকমানের উপদেশ

হযরত লোকমান (আ.) তার সন্তান তথা ভাবী প্রজন্ম ও তরুণ সমাজের নিকট পর্যায়ক্রমে সর্বপ্রথম শেরেক বর্জিত আল্লাহর তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস এর কথা বলেছেন। অতপর পার্থিব জীবনের সমাপ্তির পর অনন্ত জীবন আখেরাতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও কেয়ামত দিবসে মহা বিচার ও আদালতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা রয়েছে। সেদিন বিচার মুহূর্তে একটি সরিষা-কণা পরিমাণ কোন বস্তুও বিচার ও ন্যায়দন্ড থেকে বাদ যাবে না। এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সাবলীল, হৃদয়গ্রাহী অনুভূতি ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভাষায় উপদেশ দেয়ার পরে পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহর সাথে গভীরভাবে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী মৌলিক এবাদাত নামাযের কথা বলা হয়েছে। মানব প্রকৃতিকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোনিবেশ করা, আল্লাহর পথে দাওয়াতে নিয়োজিত জনশক্তি ও সংগঠনের প্রতি তাগুতি শক্তির যুলুম নির্যাতন ও প্রলোভনের সময় ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা অবলম্বনের উপদেশও এতে প্রদান করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে আমার বৎস! (হে আমার ভাবী বংশধর) নামায কায়েম করো। সৎ কাজের আদেশ দাও। অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো। (আর এ দায়িত্ব পালনের কারণে) তোমার ওপর যে মুসীবত পতিত হয়, তাতে ধৈর্য ধারণ করো। আর এ ধৈর্য ধারণ করাটা নিশ্চয়ই একটা সাহসিকতাপূর্ণ কঠিন কাজের অন্তর্ভুক্ত।' (আয়াত ১৭)

এটা হচ্ছে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী তাওহীদ বিশ্বাসের প্রতীক, আল্লাহ তায়ালার সুবিচারের প্রতি গভীর আস্থা ও আল্লাহ তায়ালার আযাবের ভয় সম্পর্কে সচেতন ও সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা। এ বর্ণনাভংগী মানব গোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের প্রতি দাওয়াত, তাদের সংস্কার ও সংশোধনের দিকে ধাবিত করে। অসত্য থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও পাথেয় সংগ্রহের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে, আর এ পথের মূল পাথেয় ও রসদ যে, আল্লাহর বন্দেগী বা এবাদাত তাও বলা হয়েছে। এবাদাতের প্রক্রিয়া নামায কায়েমের মাধ্যমেই দাওয়াতের মূল পাথেয় গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নামাযের পরক্ষণেই দাওয়াতের অন্যতম পাথেয় ও এ মানযিলে পৌঁছার অন্যতম বৈশিষ্ট সবর তথা ধৈর্য অবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। দাওয়াত ইলাল্লাহর প্রতি বিরোধী শক্তির হুমকি ধমকি প্রলোভন ও যুলুম নির্যাতনসহ তাদের অশ্লীল গালি গালায ভর্ৎসনা, চোখ রাংগানী অশালীন মন্তব্য বিদ্রূপ হাসি ঠাট্টা সন্ত্রাস ইত্যাদি পরীক্ষায়ও ধৈর্যের মহান বৈশিষ্ট অর্জন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই ধৈর্য অবলম্বন করা হচ্ছে অসীম দুঃসাহসিকতাপূর্ণ বড় কঠিন কাজ।' (আয়াত ১৭)

কারণ দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাগুত তথা তাওহীদ বিরোধী শক্তির বিরোধিতা, প্রতিবন্ধকতা, সংঘাত, নির্মম আঘাত, যুলুম নির্যাতন, প্রলোভন, বিদ্রূপ অবশ্যম্ভাবী। এ চরম বিরোধিতা, নির্যাতন যুলুমের বিভীষিকার মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করা নিসন্দেহে একটি সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।

বাতিলের কঠোর যুলুম-নির্যাতনের উদ্বিগ্নতার চরম মহূর্তে দাওয়াতের মহান দায়িত্বে ধৈর্যের সাথে দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থিতিশীলতার মনযিলে অগ্রসর হওয়া আসলেই একটি কঠিন কাজ।

আল কোরআন হযরত লোকমান (আ.)-এর উপদেশমালা আল্লাহর পথে আহবানকারীর বৈশিষ্টকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। দাওয়াত ইলাল্লাহর লক্ষ্য মানব গোষ্ঠীর ওপর আহবানকারীর কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নয়, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাও নয়; বরং মানব সমাজের সার্বিক

কল্যাণ সাধন করাই তার অন্যতম লক্ষ্য। এ মহান বৈশিষ্টের অন্তরালে মানব কল্যাণের এই লক্ষের পরিবর্তে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনা যদি লুকায়িত থাকে তবে তা হবে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট।

অতপর হযরত লোকমানের এ উপদেশমালা তার ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে বলা হয়েছে,

'মানব সমাজে তুমি আত্ম অভিমানে গাল ফুলিয়ে রেখো না ....নিশ্চয়ই গাধার আওয়ায সর্বাধিক অপছন্দনীয়।'

আলোচ্য আয়াতে 'ছোয়ার' বলতে উটের এক ধরনের রোগকে বুঝানো হয়েছে, যে রোগে আক্রান্ত হলে উটের গাল ফুলে যায় এবং ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়। কোরআনে হাকীমে এ গাল ফুলা ও ঘাড় বক্রতার রোগকে প্রকৃতির আত্মাভিমান ও অহংকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। চলার সময় দাম্ভিকতাপূর্ণ চলা ও দ্রুতবেগে পথ চলার পরিবর্তে মধ্যবর্তী পন্থায় পথচলার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা অহংকার ও দ্রুতবেগে পথ চলা হচ্ছে গণসংযোগ বিচ্ছিন্ন অহংকারীদের বৈশিষ্ট। অহংকার ও গণ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন হচ্ছে এক মারাত্মক মানসিক ব্যাধি, নৈতিকতা বিরোধী ঘৃণ্য আচরণ। এ ধরনের আচরণ একমাত্র দাম্ভিক অহংকারীদের পক্ষেই শোভা পায়, একজন চরিত্রবান ব্যক্তির পক্ষে এ ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন কিছুতেই শোভা পায় না। বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (আয়াত ১৮)

অহংকার দাম্ভিকতাপূর্ণ চলা বর্জনের উপদেশ দেয়ার পরক্ষণেই পথচলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা এমনিভাবে পথচলার মধ্যে শালীনতা ও গাম্ভীর্য সংরক্ষিত হয়। অহংকারমুক্ত ও বিপদমুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে পথ অতিক্রম করা যায়। এতে জনগণের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সংযোগ ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। বিপদ, দুর্ঘটনা ও আশংকামুক্তভাবে পথ অতিক্রম করাও এতে সহজ হয়।

'ওয়াগদুদ মিন ছওতেকা' বাক্যদ্বারা কণ্ঠস্বর নীচু করার কতিপয় মহৎগুণাবলীর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মৃদু মধুর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর মানুষের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, স্থিরচিত্ততা, গাম্ভীর্য, সত্যনিষ্ঠা ও সৌজন্যমূলক আচরণের পরিচায়ক। রুক্ষতা ও কঠোরতার পরিবর্তে তা অমায়িক ও মধুর আচরণের প্রমাণ বহন করে। বক্তব্যকে নির্ভুল, সাবলীল ও পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপন করাও সহজ হয়। শ্রুতিকটু ও ভুল ভ্রান্তি থেকে এতে করে বক্তব্যকে রক্ষা করা যায়। অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ থেকে বক্তব্যকে মুক্ত রাখে। বাক্যকে বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম থেকে সংযত রাখে। ব্যক্তিত্বের মূল্য ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে, সর্বোপরি সকল রুক্ষ ও কঠোরতা থেকে বক্তব্য বিষয়কে স্বচ্ছ ও পরিস্কার করে দেয়।

অতপর পরবর্তী বাক্যে কথা বলার পদ্ধতি উপস্থাপন করে বিকট শব্দে অতি উচ্চ কণ্ঠে কথা বলাকে হীন ও নিকৃষ্ট পন্থা বলে চিহ্নিত করেছে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা ও নীচু কণ্ঠে কথা বলার নির্দেশনা প্রদানের পর পরই বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই গাধার কণ্ঠস্বর হলো অপছন্দনীয় স্বর।'

মূলত উচ্চ কণ্ঠস্বর মানব চরিত্রে অপ্রীতিকর আচরণের মননশীলতা, অট্টহাসি, ঠাট্টা বিদ্রূপ ও হাস্যকর স্বভাবের উদ্রেক ঘটায়। বিকট ও চীৎকার করে কথা বলা ইত্যাদি হাস্যকর বাক্যভংগীকে রূপকভাবে গাধার অপ্রীতিকর স্বরের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। আর এভাবেই উপদেশমালার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হচ্ছে। কোরআনে হাকীম এমনিভাবে শালীন পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলার ভংগী শিক্ষাদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ

اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ

إِلٰى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ وَمَن يُّسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَن

كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلٰى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

রুকু ৩

২০. তোমরা কি (একথা কখনো) চিন্তা করে দেখোনি, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে, যা কিছু রয়েছে যমীনের মধ্যে, আল্লাহ তায়ালা তা তোমাদের অধীন করে রেখেছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি তাঁর দেখা অদেখা যাবতীয় নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন; (কিন্তু এ সত্ত্বেও) মানুষের মাঝে কিছু এমন আছে যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে (অর্থহীন) তর্ক করে, (তাদের কাছে) না আছে (তর্ক করার মতো) কোনো জ্ঞান, না আছে কোনো দীপ্তিমান গ্রন্থ! ২১. আর যখন তাদের বলা হয়, (আল্লাহ তায়ালা) যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো, (তখন) তারা বলে, আমরা কেবল সে বস্তুরই অনুসরণ করবো যার ওপর আমরা আমাদের বাপদাদাদের পেয়েছি; (কিন্তু) শয়তান যদি তাদের (বাপদাদাদের) জাহান্নামের আযাবের দিকে ডাকতে থাকে (তাহলেও কি এরা তাদের অনুসরণ করবে)? ২২. যদি কোনো ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজেকে (সম্পূর্ণ) সঁপে দেয়, (তাহলে) সে (যেন মনে করে এর দ্বারা) একটা মযবুত হাতল ধরেছে; (কেননা) যাবতীয় কাজকর্মের চূড়ান্ত পরিণাম আল্লাহ তায়ালার কাছে। ২৩. যদি কেউ কুফরী করে তবে তার কুফরী যেন (হে নবী,) তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে; (কারণ) তাদের তো আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতপর আমি তাদের বলে দেবো, (দুনিয়ায়) তারা কি আমল করে এসেছে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে যা কিছু লুকায়িত আছে সে ব্যাপারে সম্যক অবগত রয়েছেন। ২৪. আমি তাদের স্বল্প সময়ের জন্যে কিছু জীবনোপকরণ দিয়ে রাখবো, অতপর আমি তাদের কঠিন আযাবের দিকে টেনে নিয়ে যাবো।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ

لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ

اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ

وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ

فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ

اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ

دُونِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

২৫. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে পয়দা করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে (হাঁ), আল্লাহ তায়ালাই (সৃষ্টি করেছেন); তুমি বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই বুঝে না। ২৬. আকাশমালা ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা (সবই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) অভাবমুক্ত এবং তিনি সমস্ত প্রশংসার মালিক। ২৭. যমীনের সমস্ত গাছ যদি কলম হয় এবং মহাসমুদ্রগুলোর সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে তা কালি হয়, তবুও আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কিত কথাগুলো লিখে শেষ করা যাবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। ২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের সৃষ্টি করা, তোমাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করা (মূলত আল্লাহ তায়ালার কাছে) একজন মানুষের সৃষ্টি ও তার পুনরুত্থানের মতোই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং দেখেন। ২৯. তুমি কি চিন্তা করে দেখোনি, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান, আবার দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, (কিভাবে) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তাঁর হুকুমের) অধীন করে রাখেন, প্রত্যেক (গ্রহ উপগ্রহই আপন কক্ষপথে) এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে, নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। ৩০. এটাই (চূড়ান্ত), যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সত্য, (তাই) তাঁকে ছাড়া এরা অন্য যা কিছুকেই ডাকুক না কেন তা বাতিল (বলে গণ্য হবে), মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি সুউচ্চ ও অতি মহান।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ
آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ
كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ
وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا
يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

৩১. তুমি কি (এটা) লক্ষ্য করোনি, (উত্তাল) সাগরে (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেই জলযান ভেসে চলেছে, যাতে করে তিনি (এর মাধ্যমে) তোমাদের তাঁর (সৃষ্টি বৈচিত্রের) নিদর্শনসমূহ দেখাতে পারেন; অবশ্যই প্রতিটি ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। ৩২. যখন (সমুদ্রের) তরঙ্গমালা চাঁদোয়ার মতো হয়ে তাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে– দ্বীন একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যেই নিবেদন করে, অতপর যখন আমি তাদের ভূখন্ডে এনে উদ্ধার করি তখন তাদের কিছু লোক বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝামাঝি অবস্থান করে; অবশ্য যখন স্থলভাগে পৌঁছে দেই (মূলত) বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউই আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে না! ৩৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো এবং এমন একটি দিনকে ভয় করো, যেদিন কোনো পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করবে না, না কোনো সন্তান তার পিতার পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করতে পারবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, সুতরাং (হে মানুষ), এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কোনোরকম প্রতারিত করতে না পারে এবং প্রতারক (শয়তানও) যেন কখনো তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো ধোকা দিতে না পারে। ৩৪. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে কেয়ামতের (সময়) জ্ঞান আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন যা শুক্রকীটের মাঝে মজুদ রয়েছে; কোনো মানুষই বলতে পারে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে; না কেউ এ কথা বলতে পারে কোন্ যমীনে সে মৃত্যুবরণ করবে; নিসন্দেহে (এ তথ্যগুলো একমাত্র) আল্লাহ তায়ালাই জানেন, (তিনি) সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

তাফসীর

আয়াত ২০-৩৪

কোরআনে আল্লাহর পথে আহবানকারীর মূল দায়িত্ব বলা হয়েছে, 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' ধৈর্য দৃঢ়তা, নীচু আওয়ায, মধ্যমপন্থায় পদচারণা, মধুর বাঁচনভংগী কর্কষ কণ্ঠস্বর বর্জন। এসব বৈশিষ্ট উল্লেখের পর তৃতীয় স্তরে মানব জীবনের কল্যাণার্থে তাদের জীবন ধারার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত আল্লাহ তায়ালার অন্তহীন কুদরত ও প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহের প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ হচ্ছে সকল নেয়ামত, যা থেকে তোমরা প্রতিনিয়ত জীবনধারণের বিভিন্ন উপায় উপকরণ গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছো। আল্লাহ তায়ালার এ অন্তহীন নেয়ামত, অনুগ্রহ ও অশেষ অনুদান ভোগ করেও তোমাদের হৃদয়ে আল্লাহর সাথে দ্বন্দ্বে ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে এতটুকু লজ্জা ও অনুতপ্ততার অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে না। এমনিভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে মানুষের ব্যাধি সমূহের নিরাময়ের ব্যবস্থা বলার পর অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল পন্থায় তৃতীয় স্তরে মানসিক ব্যাধিসমূহ দূরীকরণের পন্থা বাতলিয়ে দেয়া হচ্ছে।

অসংখ্য নেয়ামতে ঘেরা আমাদের জীবন

এরশাদ হচ্ছে, 'তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের .... যদিও শয়তান তাদেরকে ভীষণ শাস্তির দিকেই আহ্বান জানায়।' (আয়াত ২০-২১)

এ ভাষ্য কোরআনুল কারীমে বিভিন্ন বাচনভংগী ও পদ্ধতিতে বারবার উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেকবারই তা একটি নবতর আবেদনে উদ্ভাসিত হয়েছে। মানব মন গভীর অনুভূতি ও আবেগ সহকারে যতবার প্রকৃতি জগতে আল্লাহর অসীম কুদরতসমূহ নিদর্শন করবে ও আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের প্রতি চিন্তা ও গবেষণায় নিয়োজিত হবে ততোবারই তা নতুন নতুন রূপ নিয়ে তার কছে প্রকাশিত হবে। মানুষ যখন গভীর মনোনিবেশ সহকারে আকাশ ও যমীনে আল্লাহ তায়ালার অন্তহীন সৃষ্টি, এর তাৎপর্য চিন্তা করে, তখন সে বুঝতে পারে যে, এর বিস্ময়কর অপরূপ কলাকৌশল সে তার সমগ্র জীবনব্যাপী চিন্তা গবেষণা দ্বারাও সমাপ্ত করতে পারবে না। যতোবার মানুষ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, ততোবারই তা নতুনরূপে, নতুন সাজে তার সামনে ভেসে উঠবে। মানুষ অবাক ও বিস্ময়ের সাথে এ প্রকৃতির রূপ সুধা পান করবে। তার অবস্থান ও অস্তিত্বকে হৃদয়ের সকল অনুভূতি, আবেগ, উচ্ছ্বাস ও মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে উপভোগ করবে।

মানব জীবনের সামষ্টিক প্রয়োজন পূরণের প্রেক্ষিতে বিশ্ব প্রকৃতি প্রতিনিয়ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে। প্রকৃতির ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সকল বস্তু, পদার্থ ও শক্তি অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহতভাবে মানুষের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের নিদর্শন রয়েছে। এ সব কিছুর পশ্চাতে একক শক্তিমান সত্ত্বার অস্তিত্ব ও তারই সুষ্ঠু পরিকল্পনা রয়েছে– এ বিশ্বাস আনা ছাড়া মানুষের আসলে কোনো গত্যন্তরও নেই। এক অদৃশ্যমান মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও তার অস্তিত্বের প্রতি আত্মসমর্পণ ও আস্থা স্থাপনেরও কোনো বিকল্প নেই। এ সৃষ্টিকূলে, মহাশূন্যে, দূর দূরান্তের একটি ক্ষুদ্রতম গ্রহের অবস্থান ও পৃথিবীর বুকে সকল সৃষ্টির সৃষ্টি নৈপুণ্য বিন্যাস সাধনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও কুদরতের অন্তহীন নিদর্শন ও প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এ সমগ্র পৃথিবীর অস্তিত্ব আল্লাহ তায়ালার কুল মাখলুকাতের তুলনায় একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দুসম। এ সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় মানুষও দুর্বল জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অণু পরিমাণ মাত্র। একটু ক্ষুদ্র কণার চেয়ে মানুষের ক্ষমতা ও অস্তিত্ব বরং আরও ক্ষুদ্র। পারিপার্শিক সৃষ্টিকূলের তুলনায় বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের দৃষ্টিতেও মানুষের অস্তিত্ব ওযন ও শক্তির পরিমাণ খুবই সামান্য। অথচ আল্লাহ তায়ালার মহান অনুগ্রহে আল্লাহ তায়ালা মানব দেহে আত্মা ফুঁকে দেয়ার মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার নেয়ামতে তাকে সম্মান ও মর্যাদা দানের কারণে মানুষ নিজের

চেয়ে অনেক বেশী ওযন, পরিধি ও শক্তিসম্পন্ন প্রাণী ও প্রাকৃতিক শক্তিকেও নিজের সেবায় নিজের আনুগত্যে নিয়োজিত করতে পেরেছে। বিশ্ব প্রকৃতিতে এ ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিকণাটিও আল্লাহর পুঞ্জীভূত রহমত ও কল্যাণের অবদান। মানুষের প্রতি আল্লাহর এ সীমাহীন অনুগ্রহ অনন্ত প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে সমগ্র সৃষ্টিকূলকেই তাদের কল্যাণের নিমিত্তেই তাদের সেবা ও আনুগত্যে নিয়োজিত রেখেছেন, উল্লেখিত আয়াতে সে বিষয়ের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইংগিত নিহিত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নেয়ামত ও প্রকৃতি রাজ্যকে মানুষের অনুগত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুগ্রহ ও অনুদানের কথা বর্ণিত রয়েছে। আয়াতে আসমান ও যমীনের সমগ্র সৃষ্টিকেই মানব কল্যাণে মানুসের সেবায় অনুগত ও বশীভূত করার মহান নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। আসলে এ ক্ষুদ্রতম সৃষ্টি মানুষের অস্তিত্বই তো আল্লাহ তায়ালার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। এ ক্ষুদ্র মানবকূলকে অপরাপর বিশাল সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য, শক্তি, সম্মান ও মর্যাদা প্রদানও মহান রাব্বুল আলামীনের মহা নেয়ামাত। মানব কূলের হেদায়াত, মুক্তি ও শান্তির জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ, হেদায়াতের নিখুঁত ও নির্ভুল উৎস আসমানী কেতাবসমূহ অবতীর্ণ করা ও তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। আল্লাহর সাথে মানবাত্মার গভীর সম্পর্ক মানুষের প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তের প্রতিকণার প্রবাহ, হৃদয় ও শিরার প্রতিটি স্পন্দনের সাথে জড়িত। বিশ্ব প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত প্রতিটি শব্দ ও আওয়ায, অন্তরে উদ্বেলিত প্রতিটি অনুভূতি ও চিন্তা, প্রতিটি মস্তিষ্ক উদগত বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা কি এ আল্লাহর মহান অনুগ্রহ ছাড়া আসলেই কল্পনা করা যায়? মানুষ কি কখনও আল্লাহর নেয়ামত, অনুগ্রহ ও দান ছাড়া এ সব কিছুর সন্ধান পেতো?

আকাশ রাজ্যের সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। সূর্যের রশ্মি, চাঁদের জোৎস্না, দিক-নির্দেশনার জন্য সপ্তর্ষিমন্ডল, অগণিত গ্রহ, নক্ষত্র, তারকারাজী, মেঘমালা, বৃষ্টি, প্রবাহমান বায়ূতরংগ বিদ্যুত সকল কিছুই তো আল্লাহর মহান অনুগ্রহে মানব সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। মানুষের জন্যই তো আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা এ বিশ্ব জগতের সকল সৃষ্টিকে তার অনুগত করে দিয়েছেন।

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এ বিশাল রাজ্যে এ বিস্তীর্ণ ভূখন্ডে খেলাফতের মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছেন, এ যমীনের রাষ্ট্র ক্ষমতা তাকে অর্পণ করেছেন। মানুষের জন্যই সমুদ্রের অতলে, ধরাপৃষ্ঠের গভীর নিম্নে অসংখ্য প্রাণীকূল, অগণিত মূল্যবান খনিজ সম্পদ সঞ্চিত করে রেখেছেন। এর মধ্যে অনেক কিছুকে প্রকাশ্য মানুষের দৃষ্টি গোচরে রেখেছেন, অনেক নেয়ামত মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে এখনও গুপ্ত ও গচ্ছিত রয়েছে। এর মধ্যে এমন নেয়ামত রয়েছে যা মানুষের ইন্দ্রিয় স্পর্শ ও দৃশ্যমান, অনেক এমন আছে যার কোনো আকার নেই বরং মানুষের অনুভূতি চিন্তার জগতে তা বিদ্যমান। মানুষ তা শুধু অনুভবই করতে পারে; ইন্দ্রিয় চোখে তার কিছুই দেখতে পায় না। আবার এমন এক নেয়ামত আছে যা মানুষের আবেগ-অনুভূতির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতেও ধরা যায় না। সে অনন্ত রহস্য রুহানী ও ঈমানী শক্তি দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। দিন ও রাতের প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর এ অনন্ত অসীম নেয়ামতসমূহ দ্বারা মানব জীবন পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। আল্লাহর নেয়ামতের অন্তহীন চাদরের প্রান্তসীমা, সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষ কিছুতেই খুঁজে পায় না। আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের পরিসংখ্যান কম্পিউটার কেন আরও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়াও গুণে শেষ করতে পারে না।

মানব জাতির কলংক নাস্তিক গোষ্ঠী

অথচ আফসোস! মানব সমাজে এমন কিছুসংখ্যক নাস্তিক মুরতাদ রয়েছে, যারা তাদের চারিপার্শ্বে বিদ্যমান এ অন্তহীন নেয়ামত সম্পর্কে ক্ষণিকের জন্য চিন্তা-গবেষণা করে না। আল্লাহর যেকেরে লিপ্ত হয় না, আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করে না, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না,। আল্লাহ তায়ালার অন্তহীন নেয়ামতের তীব্র অনুভূতি তাদের হৃদয় অনুভব করে না। আল্লাহ তায়ালার এ বিশাল অনুগ্রহ এ এক অদৃশ্য মহান শক্তিমান সত্ত্বার অস্তিত্ব ও কুদরতকে তারা স্বীকার করে না, বরং নাস্তিক ও মুরতাদ বলে পরিচয় দিতে তারা গর্ববোধ করে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'মানব মন্ডলীর মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক লোক রয়েছে যারা কোন প্রকার এলম, পথ নির্দেশনা ও উজ্জ্বল গ্রন্থের প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে দ্বন্দ্ব ও বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হয়।' (আয়াত ২০)

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট হেদায়াত ও বিশ্ব প্রকৃতির অন্তহীন নেয়ামতের নিদর্শন সত্ত্বেও মানব সমাজে এমন কিছুসংখ্যক নাস্তিক অবিশ্বাসী কাফের মুরতাদ রয়েছে যারা অসীম নেয়ামতের পরিবেষ্টনীর মধ্যে জীবন যাপন করে এর অপূর্ণ নেয়ামত থেকে প্রতিনিয়ত ফায়দা হাসিল করে। কিন্তু সত্তেও তারা কোনো হেদায়াতের গ্রন্থের প্রমাণ ব্যতীতই আল্লাহর ব্যাপারে অনর্থক দ্বন্দ্ব ও বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। অত্যন্ত নিকৃষ্ট জঘন্য ও ঘৃণিত পন্থায় প্রকৃত সত্য ও প্রকৃতিগত দ্বীনের প্রতি অস্বীকৃতি জানায়। তাদের এ ঘৃণিত আচরণে প্রকৃত হৃদয়বান ও আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাসী ব্যক্তির অন্তরাত্মা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এ অবিশ্বাসী সম্প্রদায় আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কেই অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে অযথাই দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। তারা আল্লাহদ্রোহী হিসাবেই জীবন যাপন করে ও এভাবেই অন্যদের সাথে তাদের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা প্রকৃতি বিরোধী নাস্তিক্যবাদী জীবনযাত্রা শুরু করে। তারা আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের দাওয়াতকেও বর্জন করে।

তারা আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামতকে অস্বীকার করতে কোনোপ্রকার লজ্জা ও সংকোচ তা বোধ করে না। আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ, আল্লাহর পরিপূর্ণ নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে তারা কোনো এলম পথ-নির্দেশনা, যুক্তি প্রমাণ, তথ্য ও উজ্জ্বল কেতাবের প্রমাণ উপস্থাপনের ওপর নির্ভর করে না। বরং তারা নিছক অজ্ঞতা, ও বক্রতার কারণেই বিভ্রান্ত পথের অনুসারী হয়। এর পাশাপাশি তারা আল্লাহর অবতীর্ণ কেতাবের অনুসরণের পথে বাপ দাদাদের অনুসৃত চিরাচরিত প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারেরই অনুসরণ করে, যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ কেতাবের অনুসরণ করো, তখন তারা বলে, আমরা বরং আমাদের মা বাপকে যে ব্যবস্থার ওপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করবো।' (আয়াত ২১)

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অন্ধ অনুসরণের এ আবেগই হচ্ছে তাদের একমাত্র প্রমাণ বা সনদ। এ অদ্ভুত দাবীই তাদের একমাত্র সম্বল। তাদের অনুসরণের পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে কোন জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, সুস্থ বিবেক বুদ্ধি, যুক্তি প্রমাণ ও সুস্থ চিন্তা ভিত্তিক নয়, বরং তা একান্তভাবে অন্ধ আবেগের ওপর নির্ভরশীল। ইসলাম মূলত মানুষকে এ অন্ধ বিশ্বাস আবেগ ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-চেতনা থেকে মুক্ত করতে চায়। অন্ধ মানসিক গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্ত করে ইসলাম মানুষের চিন্তা-চেতনা বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনাকে জাগ্রত করতে চায়। মানুষের

সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও উন্মেষের মুক্ত রাজপথে তাকে টেনে আনতে চায়। অথচ সমাজের কতিপয় গবেট মূর্খজীবী, ইসলামের আলোকোজ্জ্বল পথে আসার পরিবর্তে, প্রচলিত বিপর্যস্ত সমাজ ব্যবস্থার মানসিক গোলামী, কুপমন্ডকতা ও ভ্রান্ত ব্যবস্থার জিঞ্জিরে বন্দী থাকাকেই যুক্তিসংগত মনে করে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অনুসরণই হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি ও প্রমাণ।

মূলত ইসলাম হচ্ছে মুক্ত চিন্তার আদর্শ। ইসলাম মুক্ত বিবেকের বাণী। ইসলাম মুক্ত চেতনার প্রতীক। ইসলামই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল ও অন্ধ মানসিক গোলামী থেকে মুক্তির প্রগতিশীল আদর্শ। ইসলামই জড়তা নির্জীবতা, নিষ্ক্রিয়তা মুক্ত ও কর্মময় জীবনের আদর্শ। এতদসত্তেও মানব সমাজের পেঁচক ও চামচিকে স্বভাবের কিছুসংখ্যক লোক প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার তাগুতের অন্ধ গোলামীতে নিজেদেরকে বন্দী করে রাখতে চায়। অন্তরাত্মাকে আলোকিত করার এ জ্যোতির্ময় হেদায়াতকে তারা প্রতিহত করতে চায়। এ অন্ধ আবেগ তাড়িত বুদ্ধিজীবী নামধারী মূর্খজীবীরা উজ্জ্বল গ্রন্থের প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নিরর্থক বিতর্ক দ্বন্দ্ব ও বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। এ আয়াতের পরবর্তী অংশে তাই অন্ধ মানসিক গোলামীতে লিপ্ত অজ্ঞ মূর্খ সম্প্রদায়ের অজ্ঞতার পরিণতি সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে, অনন্ত আখেরাতে তাদের সন্দেহবাদী অন্ধ গোলামীর বিভীষিকাময় শাস্তির কথা বলা হয়েছে,

'যদিও শয়তান তাদেরকে আহ্বান করছে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির দিকে।' (আয়াত ২১)

আয়াতের আলোচ্য অংশে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় এ অন্ধ অনুসরণকারীদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই এ আহ্বান আল্লাহর পথের দাওয়াত নয় বরং এ হচ্ছে শয়তানের পথের আহ্বান, আর এ আহ্বানের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে জাহান্নামের কঠোরতম শাস্তি। এরপরও কি এ অজ্ঞ জাহেল সম্প্রদায় জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে জাহান্নামের কঠোর আযাবের পথের অনুগামী হবে? আয়াতে এ অভিশপ্ত, বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অজ্ঞতাপ্রসূত পথ নির্দেশনা ও হঠকারী পথের অনুসরণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

মোমেনদের সফলতা ও কাফেরদের ব্যর্থতা

আল্লাহর পথে চলার পক্ষে মূল্যবান দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের পরক্ষণেই আল্লাহর অনন্ত নেয়ামতের প্রতি আস্থাপনকারী কৃতজ্ঞ লোকদের প্রতি ইংগিত প্রদান করা হয়েছে,

'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করে। (স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে) সে যেন একটি মযবুত রজ্জু (হাতল) ধারণ করলো, মানুষের সকল কর্মের চূড়ান্ত ফলাফল তো আল্লাহর নিকট রয়েছে।

'উরওয়াতুল উসকা'-এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তা মানুষের জন্যে এমন এক বন্ধন যা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। সুখে দুঃখে যা কোনপ্রকার খেয়ানত, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে না। রাতের তিমির অন্ধকারেও এই মজবুত রজ্জু (হাতল) ধারণকারী ব্যক্তি পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হয় না। 'উরওয়াতুল উসকা' হচ্ছে এমন এক দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও মযবুত বিশ্বাস, এমন এক স্থির সংযোগ ও এমন এক স্থির আত্মা যে সকল অবস্থায় সকল পরিবেশে আল্লাহ তায়ালার মর্জির ওপর সন্তুষ্ট থাকে, এ ধরনের হৃদয় স্বস্তি ও একাগ্রচিত্ততার সাথে তার রবের সিদ্ধান্ত ও মর্জীর কাছে স্বতস্ফূর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, তা হৃষ্টচিত্তে আল্লাহ তায়ালার সকল সিদ্ধান্তকে কবুল করে। তার জীবনে আবর্তিত ও সকল ঘটনা সকল পরিবর্তনকে সে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলে যেমন তার মনে বিন্দুমাত্র গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হয় না, তেমনি কঠিন বিপদ-আপদ ও মুসীবতের মধ্যেও সে হৃদয় ভেংগে পড়ে না, নুয়ে যায় না, হীনমন্যতায় ভোগে না, হতাশ ও

নিরাশায় পতিত হয় না। কোন আকস্মিকতা ও দুর্ঘটনায় তার স্মৃতিভ্রম হয় না। সকল পরিবেশে ঈমানের দৃঢ়তাকেই সে সংরক্ষণ করে। বিশ্বাসের পতাকাকে সমুন্নত রাখে। কোন কঠিন পরিণতি তার মধ্যে বিরূপ মনোভাব ও প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক করে না। মতিভ্রম, চিন্তার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে লিপ্ত হতে দেয় না।

আসলে দ্বন্দ্ব সংঘাত ও আশংকা ভরা মানুষের জীবনের এ সফর দীর্ঘ । এ পৃথিবীতে না পাওয়ার ব্যথা বেদনা ও দারিদ্র ও বঞ্চনার চেয়ে সম্পদশালী হওয়া ও অত্যধিক প্রাপ্তির ফেতনা কোনোক্রমেই ছোট নয়। বিপদ ও মুসীবতের যন্ত্রণা ও যাতনার আনন্দ বিলাসে 'উরওয়াতুল উসকা' অবলম্বনকারী তাই দৃঢ়ভাবে এ রজ্জু (হাতল) ধারণ করে থাকে। কখনও রজ্জু থেকে সে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। সকল পরিস্থিতি ও পরিবেশে দৃঢ়ভাবে সে এ রজ্জুকেই আঁকড়ে থাকে।

এ আয়াতে 'উরওয়াতুল উসকা' বলতে আল্লাহর রজ্জু, ইসলামের রজ্জু তথা নিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্ততার সাথে আল্লাহর নিকট স্বতস্ফূর্ত আত্মসমর্পণকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, সে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ তো মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবজাত ধর্ম হওয়া উচিৎ যে, আল্লাহর নিকট প্রত্যাগমনই তার চূড়ান্ত ও সর্বশেষ আবাসস্থল। তাই মানুষের মুখমন্ডল ও দৃষ্টি একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ ও সমর্পিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সকল মানুষের একমাত্র আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত হেদায়াতের পথই অবলম্বন করা জরুরী। অতপর এরশাদ হচ্ছে,

'যে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, তার কুফরী ....অতপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো।' (আয়াত ২৩-২৪)

পূর্ববর্তী আয়াতে যারা আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আল্লাহর মর্জির নিকট আত্মসমর্পণ করে তাদের বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের পরিচিতি ও পরিণতির চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহর সাথে যারা কুফরী করে তাদের পরিণতি, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসের উপকরণ ও সম্পদ যে তাদের জন্য একটি আত্মপ্রতারণা বৈ আর কিছুই নয়, তার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব ভোগ বিলাস সম্পদ উপভোগ ও আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতার কারণে তাদের চূড়ান্ত পরিণাম যে জাহান্নামের কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি– তারও উল্লেখ রয়েছে।

'যে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে তার কুফরী যেন তোমাকে দুশ্চিন্তায় ও উদ্বিগ্নতায় লিপ্ত না করে।' (আয়াত ২৩)

ওদের কুফরী তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন করার মতো কোনো ব্যাপার নয়। ওরা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার পাকড়াওর মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালার পাকড়াও খুব কঠিন, তা থেকে তাদের মুক্তি ও রেহাই পাওয়ার কোনো পথ নেই। ওরা ওদের কর্মতৎপরতার অপরাধেই আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যাবে। ওদের প্রকাশ্য ও গোপন এমন কি ওদের হৃদয়ে যে গোপন প্রত্যাশা, অসৎ নিয়ত ও বাসনা নিহিত রয়েছে তা আল্লাহর অবগতির বাইরে নয় তাও আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবে জানেন। এবার আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হচ্ছে,

'আমারই নিকট তাদের প্রত্যাগমন স্থল। অতপর আমি তাদের সকল কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করাবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরের সকল বিষয় সম্পর্কেও অবগত।' (আয়াত ২৩)

এ পৃথিবীর স্বল্পকালীন ও সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোগ-বিলাসের উপায়-উপকরণ হিসেবে যে সকল সম্পদ আমি তাদের দিয়েছি, যার মূল্য খুবই নগণ্য, এটা খুবই ক্ষণস্থায়ী গুরুত্বহীন, যা তাদেরকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে রেখেছে. আখেরাতে এর প্রতিদান পরিশোধ করার তারা কোনোই ক্ষমতা রাখে না। আখেরাত হচ্ছে অন্তহীন। একবার যে আখেরাতের যিন্দেগীতে পদার্পণ করবে, তার সেখান থেকে ফিরে আসার কোনো উপায়ই থাকবে না। দুনিয়ার স্বল্পমেয়াদী জীবনে আমি তাদেরকে যে সম্পদ ও নেয়ামত দিয়েছি, আখেরাতে এর প্রতিদান প্রদানের কোনো সামর্থ কারোই থাকবে না।

অতপর আয়াতের বাকী অংশে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর মর্জির নিকট আত্মসমর্পণের বদলে অবাধ্যতা, নাফরমানী, কুফরীর পথ বেছে নিয়েছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা হবে। এ প্রসংগ উথাপন করে বলা হয়েছে,

'তাদেরকে তাড়িয়ে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির পানে নেয়া হবে।' (আয়াত ২৪)

এটা শাস্তি গ্রহণে বাধ্য করার প্রসংগের উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত আযাব হচ্ছে দু'ধরনের, একটি মানসিক যা অপমানজনক। অপরটি দৈহিক যা কষ্টদায়ক। আয়াতে 'গালীয'শব্দ যারা দৈহিক কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের উপস্থাপনাভংগী এ ব্যাপারে সত্যিই বিস্ময়কর। কোনো কোনো আয়াতে 'মাহীন' শব্দ দ্বারা মানসিক অপমানজনক শাস্তির উল্লেখ রয়েছে; আর এ আয়াতে কোরআনের নিজস্ব বাচনভংগীতে 'গালীয' শব্দ হতে দৈহিক কষ্টদায়ক শাস্তির প্রতি ইংগিত রয়েছে। আবার অন্যান্য আয়াতে 'আলীম' শব্দদ্বারা শারীরিক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। 'নাদতররু' শব্দ দ্বারা তাদেরকে আযাবের দিকে যেতে বাধ্য করার প্রসংগ আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ আযাবের এ বিভীষিকা ও ভয়াবহতা অবলোকন করে কেউ সানন্দে স্বেচ্ছায় হেসে খেলে নেচে গেয়ে আযাবের দিকে যাবে না, বরং আযাব থেকে পলায়নের জন্য ছাগলের মতো পিছটান দিতে চাইবে, তখন ফেরেশতারা শেকল দিয়ে বেঁধে তাদের টেনে হেঁচড়ে আযাবের দিকে যেতে বাধ্য করবে। আল কোরআনের অদ্ভূত ও বিস্ময়কর বাচনভংগী এটা! এখানে 'ইদতেরার' অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে আযাবের দিকে যেতে বাধ্য করা হবে এ দ্বারা এ দিকের প্রতিও প্রচ্ছন্ন ইংগিত রয়েছে যে তারা আযাব থেকে বেঁচে থাকার প্রত্যাশা পোষণ করলেও তাদের বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। আযাবের দিকে না গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করলে বা আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যেতে চাইলে পালাতে পারবে না। আয়াতে তাদের অসহায়তা, অক্ষমতা ও অপারগতার এক করুন চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, বাধ্য হয়েই তাদেরকে এই কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে হবে।

আয়াতে মোমেনদের অবস্থার প্রতিও ইংগিত প্রদান করা হয়েছে। এদের প্রশান্ত অবস্থা বলা হচ্ছে, যে এরা আল্লাহর মর্জির ওপর সন্তুষ্ট, শান্ত ও স্থির। একে একনিষ্ঠতা একাগ্রচিত্ততার সাথে আত্মসমর্পণকারীদের অবস্থার এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আল্লাহর নিকট মযবুত রজ্জু বা হাতল ধারণকারী স্পতস্ফূর্তভাবে আত্মসমর্পণকারী সম্প্রদায় আর নিরেট অজ্ঞতা প্রসূত প্রমাণহীনভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহবাদী কুফরীর পথগামী নাস্তিক মুরতাদদের মধ্যে কতো দূরত্ব কতো যোজন ব্যবধান তাও এখানে দেখানো হয়েছে। আল্লাহর সাথে মযবুত সম্পর্ক স্থাপনের ফলশ্রুতিতে আল্লাহর রজ্জু ও হাতলকে মযবুতভাবে ধারণ করে তারা আল্লাহর হেদায়াতকে গ্রহণ করে। পরিনামে তারা আল্লাহর পথের অনুগামী হয়।

তাওহীদের প্রতি মানবপ্রকৃতির স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতি

এখানে কাফেরদের সামনেও এ মহাসত্যের আবেদন তুলে ধরা হয়েছে। তারা এ স্বভাবজাত মহা সত্যের স্বীকৃতি দেয় না সুসমন্বিত আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে কবুল করে না। বরং তারা সুদৃঢ় মহাসত্যকে অস্বীকার করে এক বক্র পথেরই অনুগামী হয় । পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা কে? ....নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অভাব মুক্ত সম্পদশালী ও পরম প্রশংসিত।' (আয়াত ২৫)

মানব মনের স্বভাবজাত প্রকৃতি মানুষের সুস্থ বিবেকের নিকট যদি এ প্রশ্ন উথাপন করা হয় যে আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা কে? তখন সে এ মহা সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না যে, অনন্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মানুষের মননশীলতা, মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি, বিস্তৃত মহাকাশ, এ সীমাহীন পৃথিবীর অবস্থান, এ চলমান বিশ্বের সকল কর্মচাঞ্চল্য প্রতিটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণেই এ লক্ষণ বিদ্যমান। সৃষ্টির পরিচালনা, উদ্ভব, উৎপাদন; পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের মধ্যে প্রতিনিয়ত এক অদৃশ্য শক্তিমান সত্ত্বার ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে। সে অদৃশ্য শক্তিমান সত্ত্বা এক একক। এ পৃথিবীর কোনো কিছুরই স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অপর কেউ'– এটা কেউই কখনো দাবী করে না। কেউ এর অংশীদারিত্বের দাবীও করে না। এ বিশ্বাস সবাই করে যে কোন এক অদৃশ্য ক্রিয়াশীল সত্তার অস্তিত্ব ও তারই সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া এসব কিছুর কল্পনাই করা যায় না।

মানুষের মন স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্নের স্বতস্ফূর্তভাবে এই জবাব প্রদান করে যে, এ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা একক শক্তিমান সত্ত্বা আল্লাহ তায়ালা। মানব প্রকৃতি স্বতসিদ্ধভাবে এ মহাসত্যের স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য। এ স্বভাবজাত মহাসত্যকে অস্বীকার ও বর্জন করার কোনো যৌক্তিকতা সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। এ চিরন্তন সত্যের স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতির প্রমাণই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। মক্কার পৌত্তলিক মোশরেকরা তাদের হঠকারিতার কারণে অজ্ঞতা প্রসূতভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খালেস তাওহীদের বিরোধিতার কারণে তাদের শেরেক মিশ্রিত আকীদার অপনোদন করা ও তাকে মিথ্যা প্রমাণ করার লক্ষ্যেই এই আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এ প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক দলীল তাদের সামনে উথাপনের পর তাদের নিজস্ব স্বীকৃতিমূলক উচ্চারণের পরে কোন যুক্তি প্রমাণের অবতারণার প্রয়োজনই আর অবশিষ্ট থাকে না। বিশেষ করে যখন তাদের বিবেকের সামনে এ প্রশ্ন উথাপন করা হয়,

'বল আসমান ও যমীনকে কে পয়দা করেছে? উত্তরে তারা বললো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।'

এ জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (স.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যেন তিনি ওদের এই জবাবটি দিতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর প্রশংসা দ্বারা কথা শুরু করেন। এ কথার নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি বলছেন,

'বল আলহামদু লিল্লাহ' .....

অর্থাৎ প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে সত্য সুস্পষ্টভাবে বিরাজ করছে, এই চিরসত্য বিষয়টি যখন তোমরা নিয়ত দেখতে পাচ্ছ তখন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও কৃতিত্বের কথা ঘোষণা কর– এ জন্যও আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর প্রশংসা করো যে সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে সর্বত্র তাঁর শক্তি ক্ষমতার নিদর্শনগুলো, তোমরা দেখতে না চাইলেও তোমাদের নযরে পড়ছে; সুতরাং সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর প্রশংসাগীতি গাইতে থাকো। এরপর, কেন আল্লাহ তায়ালার কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করা হবে তা জানাতে গিয়ে আরও জোরালো একটি যুক্তি প্রদর্শন করার পর বলা হচ্ছে,

বরং অধিকাংশ মানুষ জানে না বা তাদের জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে না। আর এই কারণেই তারা নানা প্রকার যুক্তিহীন তর্ক-বিতর্ক করে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সত্যটি পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে তা ইচ্ছা করেই ভুলে যায়, অর্থাৎ তা দেখেও দেখে না, এমনকি গোটা বিশ্বের সবকিছু প্রতিনিয়ত যে মহা স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা জানাচ্ছে সেটাও তারা উপেক্ষা করে।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এ কথার স্বীকৃতি অবশ্যই তাদের প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তারা এ কথাও স্বীকার করে যে, বিশ্ব জাহানের মধ্যে অবস্থিত যেখানে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর মালিক একমাত্র তিনিই। সৃষ্টির এ সবকিছুর মধ্যে কিছু বস্তুকে তিনি মানুষের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন এবং আরও অনেক কিছু আছে যে সবের মধ্যে মানুষের কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই। তারপরও এটা সত্য যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যকার সব কিছু থেকে তিনি মুখাপেক্ষিহীন। তিনি নিজে নিজেই চির প্রশংসিত; এমনকি কোন একজন মানুষও যদি তাঁর প্রশংসা না করে তবুও তাঁর প্রশংসার কোনো অভাব নেই,

'আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, নিশ্চয়ই তিনি অভাবমুক্ত প্রশংসিত।'

আল্লাহর প্রশংসা লেখা কখনো শেষ হবেনা

জগৎ জোড়া দৃশ্যের ছবি সামনে তুলে ধরে আলোচনার ধারাকে এখানেই সমাপ্ত করা হচ্ছে। এ ছবির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা জানাতে চেয়েছেন যে তিনি সকল কিছুর প্রয়োজন ও সকল দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর প্রাচুর্য সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি বলছেন যে তাঁর ভান্ডার অফুরন্ত এবং সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধে এবং তাঁর জ্ঞানেরও নেই কোন সীমা বা শেষ। তাঁর নতুন নতুন জিনিস দান করার ক্ষমতার কোনো শেষ নেই, তাঁর কুদরত অন্তহীন। আকাশ মন্ডলী পৃথিবীর মধ্যে কোথাও তাঁর স্বাধীন ইচ্ছাকে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

যমীনের .... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (আয়াত ২৭)

'আর সারা পৃথিবীর গাছ-গাছালি যদি কলম হত ..... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শুনেন সব কিছু দেখেন। (আয়াত ২৭)

ওপরের আয়াতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে এবং যে সব দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তা মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতেও বুঝতে অসুবিধা হয় না। কথাগুলো এ জন্য বলা হচ্ছে যেন, মানুষ অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা সম্পর্কে চিন্তা করে– স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে নয়। আসলে এ ধরনের বস্তুগত জিনিস ও উদাহরণ ছাড়া মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সম্পর্কে বুঝবার অন্য কোনো মাধ্যম নেই।

মানুষ তার জ্ঞান-গরিমার কথা লিপিবদ্ধ করে, তাদের কথাগুলোকে বিধিবদ্ধ করে রাখে এবং তাদের কলমের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান-গবেষণার কথা অপরের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে; আর এসব কলম তারা সংগ্রহ করে ঝোপ-ঝাড়-জংগল বা পৃথিবীর খনিজ পদার্থ থেকে এবং এসব থেকে নির্গত বিভিন্ন উপাদান থেকে নির্মিত কলম ব্যবহার করতে গিয়ে কালি বা অনুরূপ কিছুকে তারা কাজে লাগায়, কিন্তু এ সব কালি হয় তারা দোয়াতে অথবা কোন শিশিতে রাখে। এ জন্যই এই কালি ও কলমের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা লিখতে গিয়ে পৃথিবীর সকল গাছ পালাকে যদি কলম বানানো হতো এবং পৃথিবীর সকল সমুদ্রকে যদি কালিতে পরিণত করা হত, এমনকি আজকের এই সাত মহাসাগরগুলোর সাথে যদি যোগ করা হতো অনুরূপ আরও সাতটি মহাসাগরকে অতপর এসব সম্মিলিত পানি যদি কালিতে

রূপান্তরিত হয়ে সে কলমসমূহের জন্য লেখার উপাদানে পরিণত হতো এবং সেসব কলম একত্রিত হয়ে যদি লিখতে শুরু করে দিতো আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান-গরিমার কথা ও তাঁর কীর্তি গাথা; তাহলে বিশ্বজোড়া সাগর-মহাসাগর রূপ কালি সবই ফুরিয়ে যেত, তবুও মহামহিম আল্লাহ পাকেরই কথা ফুরাতো না। আসলে লেখক ও লেখার সকল উপাদান যতো বেশীই হোক না কেন-এসবই তো সীমাবদ্ধ; কিন্তু লেখা হবে যাঁর কথা, যাঁর অসীম জ্ঞানের কথা, তিনি ও তাঁর জ্ঞান সবই সীমাহীন। সুতরাং সীমাহীন-এর কথা সীমাবদ্ধ জীব ও উপকরণ-এর আওতাভুক্ত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। সেই কারণেই দেখা যায়, পৃথিবীর সূচনা থেকে লেখকরা আজ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার কথা লিখেছেন ও লিখে চলেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত যতো কথাই লেখা হয়েছে, কেউ দাবী করতে পারেনি যে তাঁর কথা লেখা শেষ হয়ে গেছে। আবহমান কাল ধরে লেখা চলতে থাকলেও তাঁর সম্পর্কে লেখা কোনো দিন শেষ হবে না। দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি যখন তাঁর কথা লেখে তখন সে তার সীমাবদ্ধ যোগ্যতা দ্বারা অসীমের কথা লিখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। সে যতো চেষ্টাই করুক না কেন তার সকল যোগ্যতা ও শক্তি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কথা কোনোদিন শেষ হবে না। অবশ্য তাঁর গুণগান কেউ গাইতে পারুক আর নাই পারুক তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না, তাঁর গুণাবলীর কথা কেউ লিখতে পারুক আর নাইই পারুক তা কোনদিন ফুরিয়ে যাবে না, কারণ তাঁর জ্ঞানের কোনো সীমা নেই এবং নেই তার কোনো শেষ। তাঁর ইচ্ছা কোনো দিন থামবে না তাঁর ইচ্ছা এবং সেই অনুযায়ী কাজ চলতেই থাকবে, তাঁর ইচ্ছার কোনো সীমা নেই, নেই কোনো প্রতিবন্ধকতা।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর কথা লিখতে সকল গাছপালা কলম হয়ে কাজ করার পর অবশেষে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে এবং সকল সাগর মহাসাগর কালি হয়ে লেখার খেদমত আনজাম দিতে দিতে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবুও আল্লাহ তায়ালার কথা ফুরাবে না। বিশ্ব জগতের প্রাণী ও প্রাণহীন সকল বস্তু শেষ হয়ে যাবে। সকল রূপ-রস-গন্ধ এবং সকল আকৃতি ও প্রকৃতি ও বিনীত মানুষের অন্তর চিরস্থায়ী সৃষ্টিকর্তার সামনে অমলীন ও অপরিবর্তিত অবস্থায় শুধু টিকে থাকবে, এ অন্তর কোনো দিন তাঁর সামনে থেকে দূরে সরে যাবে না। মহাশক্তিমান, মহা বিজ্ঞানময় সকল বিষয়ের পরিচালনাকারী সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার পরিধি কোন দিন বিলীন হয়ে যাবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিমান মহা বিজ্ঞানময়।'

এই বিশ্বজোড়া ভীত-সন্ত্রস্ত, অনুগত ও বিনয়-নম্রতা-ভরা দৃশ্য যখন সামনে আসে তখন অতি সুন্দরভাবে মানুষের সামনে প্রমাণিত হয় যে, তাদেরকে সৃষ্টি করা ও পুনরায় তাদেরকে যিন্দা করে তোলা আল্লাহ সোবহানহু ওয়া তায়ালার কাছে অতি সহজ ও সাধারণ ব্যাপার, এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদেরকে সৃষ্টি করা ও পুনরায় যিন্দা করা (আল্লাহ পাকের কাছে) একটি মাত্র প্রাণীকে সৃষ্টি করার শামিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শুনেন ও দেখেন।'

আল্লাহ তায়ালার মহান ইচ্ছা শক্তি সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, যখনই কোন কিছুকে তিনি সৃষ্টি করার এরাদা করেন, তখনই তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। এ সৃষ্টিক্রিয়া একজন বা একাধিক মানুষের জন্য সমান কথা (অর্থাৎ, একজনকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁর যে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন, বহু জনের জন্যও সেই একটিমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট)। এই বেশীর জন্য তাঁর যে একটু বেশী চেষ্টা প্রয়োজন তা কখনও নয় এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদাভাবেও তাঁর কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা লাগে না। কাজেই একজনের জন্য যে ইচ্ছা শক্তিকে তিনি প্রয়োগ করেন,

কোটি কোটি প্রাণীর জন্যও সেই একই ইচ্ছা শক্তি যথেষ্ট। এ জন্য একটিমাত্র কথাই যথেষ্ট; 'হয়ে যাও' অর্থাৎ এই একটি কথাতেই তাঁর মহান ইচ্ছা যখন প্রকাশিত হয় তখনই তা বাস্তবে এসে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই তাঁর কাজ হচ্ছে এই, যখন তিনি কিছু করার এরাদা করেন তার জন্য শুধু বলেন, 'হও' আর অমনি হয়ে যায়।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর জ্ঞান-এর শক্তি এবং এর প্রয়োগের ফলই হচ্ছে সৃষ্টি, পুনরুত্থান এবং এ দুই অবস্থাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হবে হিসাব নিকাশ এবং সূক্ষ্ম ও পুংখানুপুংখ বিচার করার পর সংঘটিত হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার প্রতিদান দেয়ার পালা। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শুনেন ও দেখেন।'

মহাবিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর চিরঞ্জীব সত্ত্বার ছায়া

পরিশেষে এ সূরাটির পরিসমাপ্তিতে শেষ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা সেই একই বিষয় যার ওপর ইতিপূর্বে তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সত্য ও চিরস্থায়ী এবং তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা সবই ক্ষণস্থায়ী, মিথ্যা এবং ধ্বংসশীল। বাতিল সেসব জিনিস যাদেরকে ভ্রান্ত মানুষ আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার মনে করে, তাদের সামনে মাথা নোয়ায় এবং তাদের কাছে সাহায্যের জন্য মিনতি করে প্রার্থনা জানায়। এ কারণেই এই শেষের অধ্যায়টিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারও সামনে মাথা নত করা যাবে না। না বুঝে কারো ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা চলবে না এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীন ব্যতীত কাউকেই নিরংকুশ আনুগত্য দেয়া যাবে না। এ প্রসংগে শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে স্থিরভাবে বুঝা গেল যে, এটা হবে সেই ভয়াবহ দিন যে দিন পিতা-পুত্রের কোনো কাজে লাগবে না এবং কোনো সন্তান ও পিতার কোনো উপকারে আসবে না। এ সব বিষয়ের সাথে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বহু নতুন ও মযবুত কথা জানা যায়, যার বিশদ বর্ণনা এ প্রসংগে এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

তুমি কি এ বিষয়টি চিন্তা করে দেখোনি, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান আবার দিনকে রাতের ....মহান সত্ত্বাই হচ্ছেন সত্য! তাকে ছাড়া এরা অন্য যা কিছুই ডাকুক না কেন তা (সম্পূর্ণ) বাতিল, মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি সুউচ্চ ও অতি মহান। (আয়াত ২৯-৩০)

এরপর আসছে দিবাভাগের মধ্যে রাতের প্রবিষ্ট হওয়ার দৃশ্য, আসছে রাত্রির মধ্যে দিনের প্রবেশের অভিজ্ঞতা, আর এই উভয় অবস্থার মধ্যে মৌসুম পরিবর্তনকালে কখনও হয় দিন বড়, আবার কখনও হয় রাত বড়। এখানে বিস্ময়কর যে বিষয়টি আমরা দেখতে পাই তা হচ্ছে, এক নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুসারে এই কম বেশী হওয়ার অবস্থাটি আবহমান কাল ধরে চলে আসছে, এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম কেউ কোনদিন দেখতে পায়নি। কিন্তু বড়ই আজব ব্যাপার! মানুষের অন্তরে মহাবিস্ময়কর ব্যাপারটি একটুও দাগ কাটে না। হ্যাঁ এতটুকু বুঝা যায় যে সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের সামনে যখন কোনো ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে এবং খুব কাছাকাছি থেকে এবং অতি সহজে যখন মানুষ কোনো মূল্যবান তথ্য লাভ করে, তখন তার সঠিক মূল্যায়ন করা তার জন্য মুশকিল হয়ে পড়ে; সে অবস্থায় তার চেতনা স্তিমিত এবং ভোঁতা হয়ে যায়, তখন কোনো বিস্ময়ই আর তার মনে দোলা দেয় না, তার দৃষ্টি এ সবের রহস্যের দিকে আকৃষ্ট হয় না, তার হৃদয়ে এ সব প্রশ্ন জাগায় না যে, কে এর পরিচালক, কার ইচ্ছাতে এ মহাবিশ্ব একই নিয়মে চলছে, কোন

মহাশক্তিধরের বলিষ্ঠ হাত এসব কিছুকে এমন এক কঠিন নিয়ম-শৃংখলায় বেঁধে রেখেছে যার মধ্যে কেউ কোনো দিন! কোনো ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেনি একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখুন, সে আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত রহস্যরাজির দিকে, যার নিরন্তর অনিরুদ্ধ আবর্তন ও পরিক্রমা শ্রান্তি ক্লান্তিহীনভাবে আবহমানকাল ধরে চলছে, যার কোনো ব্যতিক্রম কোনো দিন হয়নি, যা কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও থেমে যায়নি। অনুসন্ধিৎসু নয়ন মেলে একবার তাকান, আপনার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, পরম পরিতৃপ্তিতে আপনার প্রাণ ঠান্ডা হয়ে যাবে, দেখবেন আপনার হৃদয়ের গভীর থেকে, আপনার অজান্তেই উত্থিত হয়ে আসছে একটি কথা। হ্যাঁ, অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এসব কিছু করতে সক্ষম, তিনি এ সবের সৃষ্টি ক্রিয়া শুরু করেছেন এবং তিনিই এসব কিছুকে, তাঁরই ইচ্ছামত এক নির্দিষ্ট নিয়মে প্রসারিত করে চলেছেন।

সূর্য ও চাঁদের সাথে আবর্তনের সম্পর্ক এবং এক নির্দিষ্ট ধারায় এগুলোর গতিতে চলতে থাকার দিকে তাকালে এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝা যায়। সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রণ করা যেমন এক বিস্ময়কর ব্যাপার তেমনি রাত ও দিন এবং তাদের মধ্যে কম-বেশী হওয়ার যে ধারা চলছে তার থেকেও সূর্য ও চাঁদের নিয়ন্ত্রিত থাকাটা আরও বেশী আজব ব্যাপার। একমাত্র মহাশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালাই এদেরকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনিই সেই মহাশক্তিমান পরওয়ারদেগার যিনি সব কিছু করতে সক্ষম এবং যিনি জানেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এসব গ্রহ উপগ্রহ ও আলোর গোলকসমূহ নিজ নিজ গতিপথে কতোকাল ধরে চলতে থাকবে। একইভাবে দিনের মধ্যে রাতের প্রবেশ করা এবং রাতের মধ্যে দিনের প্রবেশ করা কতোকাল ধরে চলবে? একমাত্র তিনিই জানেন সূর্য ও চাঁদকে এই নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় চালানোর রহস্য কি। সূর্য ও চাঁদ এমন দুটি সত্ত্বা যা নিরন্তর মানুষের নযরে পড়ছে এবং যার দ্বারা সরাসরিভাবে মানুষ উপকার পাচ্ছে, এ দুটি গোলক রাত ও দিনের গতির মতই বিস্ময়কর বলে স্পষ্টভাবে মানুষ প্রতিদিনই দেখতে পাচ্ছে, এ জন্য এ দুটি সম্পর্কে এই একই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা সেসব বিষয়ে খবর রাখেন যা তোমরা করছো।'

এইভাবে সৃষ্টিলোকের বাস্তবতার মধ্যে এই গায়বী সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে। এ এমন এক শক্তি, মানব জীবনের সাথে যার মজবুত ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সত্য

তারপর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ অনুভব করে যে, ওপরে বর্ণিত তিনটি সত্য সকল শক্তির বড় শক্তি আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত, যার ইচ্ছাতে দৃশ্য অদৃশ্য সকল বিস্ময়কর বস্তুগুলো টিকে রয়েছে। তিনিই সেই প্রথম ও চূড়ান্ত সত্য, যাঁর থেকে অন্যান্য বাস্তবতা প্রকাশ পায়। এই মহাশক্তি থেকে শক্তি পেয়ে সকল গ্রহ-উপগ্রহ ও ছায়ালোকে অবস্থিত সকল তারকারাজি আবর্তিত হচ্ছে। নীচের আয়াতটি এসব কথার প্রমাণ হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে,

'খেয়াল করে, চিরস্থায়ী সত্য একমাত্র আল্লাহ, আর তিনি ছাড়া অন্য যাদেরকে তারা ডাকে সেগুলো সবই মিথ্যা ও ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ তায়ালাই মহান-তিনিই বড়।'

সৃষ্টির মধ্যে এই হচ্ছে সেই মহাবিস্ময়, যা সদা-সর্বদা টিকে আছে এবং সুক্ষ্ম রশিতে পরস্পর সবাই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এসব তথ্য এই মহা সত্য ব্যক্ত করছে যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে সত্য ও সঠিক। যেসব ব্যক্তি বা বস্তুর পূজা ওরা করে এবং যাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় ওরা প্রার্থনা জানায় তা সবই মিথ্যা। সারা জগৎব্যাপী সুশৃংখল এ

মহা ব্যবস্থাপনা পাক পরওয়ারদেগারের সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণেই এ বিশ্বের সব কিছুর অস্তিত্ব বরাবর টিকে আছে। আল্লাহর অস্তিত্বই চিরসত্য, তিনি সকল সীমাবদ্ধতা ও কমতি থেকে পবিত্র। তিনিই এ সৃষ্টি জগতকে বাস্তবায়িত করেছেন, তিনিই এর হেফাযত করছেন। তিনিই একে পরিচালনা করছেন, সবাইকে টিকিয়ে রাখা ও স্থায়িত্ব দান করা পারস্পরিক সম্পর্কের কাজ করার যোগ্যতা দান করা– এ সব সে মহান সত্ত্বারই কাজ। আল্লাহ তায়ালা যা চান, তাইই হয় ......।

'এসব এই জন্য যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই সত্য।'

আর তিনি ছাড়া যা কিছু আছে সবই বাতিল-মিথ্যা। তিনি ছাড়া যা কিছু আছে সবই পরিবর্তনশীল, সবই মিথ্যা, সবই ধ্বংসশীল। তিনি ছাড়া বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সব বাড়তি-কমতি আছে। সবার মধ্যেই পর্যায়ক্রমে শক্তি ও দুর্বলতা, উন্নতি ও অবনতি, অগ্রগতি ও পশ্চাতগতি আসে এবং তিনি ছাড়া সবাই না থেকে হ্যাঁ-তে এসেছে, আর বাস্তবে আসার পর একদিন তারা আবার সবাই শেষ হয়ে যাবে। তিনি একক, পবিত্র তিনি, সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার ঊর্ধে তিনি। তিনি চিরস্থায়ী, চির অম্লান। অব্যয় অক্ষয়, সকল প্রকার পরিবর্তনের ঊর্ধে, তাঁর কোন শুরু নাই, নাই তাঁর কোন শেষ।

এরপর বাকি থাকবেন তিনি চিরদিন, নিজ অস্তিত্বের মধ্যেই তিনি চিরদিন থাকবেন, সকল প্রকার কল্পনার ঊর্ধে। তাই বলা হয়েছে, 'হাঁ এইটিই হবে যেহেতু তিনিই সত্য।' আছেন তিনি চিরদিন থাকবেনও চিরদিন .... তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার মত কোন ভাষা মানুষের কাছে নেই, কোন মানুষ তাঁর শক্তি ক্ষমতার কোন ব্যাখ্যাও দিতে পারে না। চিরদিন তিনি আছেন। যার শক্তি ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ অন্তরে অনুভবই করতে পারে, তার বিবেক দিয়ে তাঁকে বুঝতে পারে এবং মানবজাতি তার সকল সত্ত্বায় তাঁর কথা ভাবতে পারে, কিন্তু কতো বড় তিনি, কতো মহান তিনি, কত বিপুল তাঁর ক্ষমতা এগুলো অনুধাবন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আর এই ভাবে 'আল্লাহ তায়ালা, তিনি মহান তিনিই বড়' অর্থাৎ তিনি ছাড়া এমন মহান আর কেউ হতে পারে না। আর বড় একমাত্র তিনি। এই রহস্যভরা মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সম্পর্কে যে অনবদ্য বর্ণনা এসেছে, অনুরূপ কোনো বর্ণনা পৃথিবীর আর কেউ কোনো দিন দিতে পারেনি। আমি তো মনে করি আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা সম্পর্কে আল কোরআনে পরিবেশিত তথ্যরাজির সমকক্ষ তথ্য আর কেউ দিতে পারে না, সে মর্যাদাবান প্রভু প্রতিপালকের মর্যাদায় ব্যাখ্যাও কেউ দিতে পারে না। তাঁর মর্যাদাতে তিনি একক, তাঁর মাহাত্ম বাড়ে কমে না। তাঁর মর্যাদা বয়ান করতে গিয়ে আল কোরআনের উপস্থাপনা যেমন হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে, তেমনি আর কারও কথা, ভাষা-ব্যাখ্যা জাগাতে পারে না।

পানির বুকে নৌ চলাচল আল্লাহর এক অপূর্ব নিদর্শন

বিশ্ব প্রকৃতির বৈচিত্রময় দৃশ্যের বর্ণনা শেষে আসছে আর একটি আলোকময় অবস্থার বর্ণনা, এমন একটি অবস্থার চিত্র যা মানুষের জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, আর তা হচ্ছে সাগরের বুকে পরিভ্রমণরত নৌ-জাহাজের দৃশ্য। অকূল সাগরে যখন এই নৌবহর পাড়ি জমায়, দেশ থেকে দেশ-দেশান্তরে এগিয়ে চলে, বিশাল এই সাগর বক্ষে যখন এসব জাহাজ প্রচন্ড ঝড় তুফানের মুখোমুখি হয়, তখন হতাশাগ্রস্ত এ নৌবহরের যাত্রীদেরকে বাঁচানোর মত কেউ থাকে না। চরম এই অসহায় অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন বড় মেহেরবাণী করে তাদেরকে রক্ষা করেন এবং অবশেষে নিরাপদে তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনেন। মানুষ যখন মহাসাগরের বুকে এ বিভীষিকাময় বিপর্যস্ত অবস্থায় পতিত হয় তখন তাদের কী ভীষণ দুর্দশা হয় তার এক অনুপম ছবি আঁকা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। কূল কিনারাহীন এই সাগর বক্ষে জাহাজের আরোহীদের হৃদয়

যখন মহা-বিপদাশংকায় গাছের পাতার মতো প্রকম্পিত হতে থাকে, তাদেরকে উদ্ধার করা ও স্থলভাগে পৌঁছে দেয়ার যে মর্মস্পর্শী বর্ণনা এখানে পাওয়া যায় তা তুলনাহীন। দেখুন এরশাদ হচ্ছে,

তোমরা কি (এটা) লক্ষ্য করোনি যে, (উত্তাল) সাগরে (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে জলযান ভেসে চলেছে, যাতে করে তিনি.........তখন তাদের কিছুলোক (বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের) মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে, অবশ্য আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহকে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউই অস্বীকার করতে পারে না! (আয়াত ৩১-৩২)

এই যে নৌবহর সাগর-মহাসাগরের বুকে পাড়ি জমায়, একবার ভেবে দেখুন, কার ওপর ভরসা করে, কোন শক্তি বলে এগুলো সাগরের বুকে চলে? কোন শক্তি এ সব নৌবহরকে তাদের গন্তব্য স্থলে নিয়ে যায়, এ সবই আল্লাহ পাকের মেহেরবাণী! তিনি তাঁর অপার করুণায় মানুষকে দেশ-দেশান্তরে নিয়ে যান, যেন তারা একে অপরের সাথে বাণিজ্য-বিনিময় করে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত এসব জাহাজ ঘোর বিপদ সংকুল সাগরের বুকে মহান আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ নিয়মে চলে। তাঁর এ নিয়ম পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে পানি ভাগে, স্থলভাগে, আকাশ ও অন্তরীক্ষের সবখানে। তিনি এ নিয়ম অনুসারে চলার দায়িত্ব দিয়েছেন সমুদ্রকে, জাহাজকে, বাতাসকে, পৃথিবীকে ও আকাশকে। প্রাকৃতিক এসব আইনের কারণেই এসব নৌবহরের পক্ষে কূল-কিনারাহীন সাগরের বুক চিরে পাড়ি জমানো সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে গিয়ে এতো বিশাল তরংগাভিঘাতেও এসব জাহাজ যে সে মহাসাগরের মধ্যে ডুবে যায় না অথবা স্থির হয়ে থেকেও যায় না তা একমাত্র পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালারই ইচ্ছায়। ওপরে বর্ণিত সে সকল বস্তুকে প্রদত্ত বৈশিষ্টের মধ্যে যদি সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটে তাহলে কোন জাহাজের পক্ষে মহাসাগরের বুকে চলাচল করা সম্ভব হত না। পানির তরলতায় সামান্য একটু পরিবর্তন যদি হয়ে যেত, যদি এ পানি হয়ে যেত সামান্য একটু ঘন অথবা জাহাজ নির্মাণের ধাতব পদার্থ যদি আর একটু ভারী হয়ে যেত তাহলে তা সে গভীর সাগরের বুকে ভেসে থাকতে পারত না। লক্ষণীয় যে বাতাসের বর্তমান চাপ থেকে সাগর বক্ষে যদি আর একটু বেশী চাপ পড়তো যদি পানির স্রোত এবং বাতাসের গতি এখন যেভাবে চলছে, তার থেকে একটু ভিন্ন হয়ে যেতো, যদি পানিকে পানি বানিয়ে রাখার প্রয়োজনে প্রদত্ত তাপমাত্রার মধ্যে কোনো পরিবর্তন করে দেয়া হতো। বর্তমান পানির স্রোত, বাতাসের গতি যে সীমায় আছে তার থেকে একটু এদিক ওদিক যদি হয়ে যেত তাহলে সব কিছুই লন্ডভন্ড হয়ে যেতো।

এটা আল্লাহ তায়ালারই মেহেরবাণী যে তিনি সব কিছু তদারক করে চলেছেন এবং প্রত্যেকটি জিনিসকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় এমনভাবে স্থাপন করে রেখেছেন যে সব কিছু আপন আপন লক্ষ্যেকে ঠিক রেখে সুসামঞ্জস্যভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে তীব্র স্রোত, বৃষ্টি-বাদল, ঝড় তুফান যাই আসুক না কেন, সব কিছুই, আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত এক বিশেষ নিয়মের অধীন কাজ করে চলেছে এবং এ জন্য যাদেরকে তিনি আপন আপন ঘরে পৌঁছে দেবেন বলে পূর্বেই ঠিক করে রেখেছেন তারা ঠিকই শত বিপদের মধ্য দিয়ে এ মহাসাগরসমূহে পাড়ি দেয় এবং নিরাপদে আবার ঘরে ফিরে আসে। সমুদ্র ভ্রমণকালে এসব জাহাজের নাবিক ও যাত্রীরা ঠিকই অনুভব করে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই বাঁচানেওয়ালা নেই। এসব জাহাজ সর্বাবস্থায় তাঁরই ইচ্ছা ও মেহেরবাণীতে সমুদ্র বুকে পাড়ি জমায়। এরপর এসব জাহাজ তাঁরই নেয়ামত ও মেহেরবাণী বহন করে দেশ-দেশান্তরে পৌঁছে দেয়। এসব তথ্যের ব্যাখ্যায় যে কথাটা আসে তা হচ্ছে,

'যেন তিনি তোমাদেরকে (এসব নেয়ামতের মধ্যে) তাঁর মেহেরবাণীর নিদর্শনসমূহ থেকে কিছু কিছু অংশ দেখিয়ে দেন।'

অর্থাৎ, তাঁর মেহেরবাণীর এসব নিদর্শন তিনি বান্দাদের নযরের সামনে পেশ করেন। যেন তারা এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাঁর এসব নিদর্শন তারাই দেখতে পায় যারা দুটি চোখ মেলে দেখতে চায়, যারা এসব নিদর্শন থেকে চোখ বন্ধ করে নেয় না বা তারা এগুলোকে গোপনও করতে চায় না ...... তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি এবং কৃতজ্ঞ চিত্ত লোকের জন্য ....।'

অর্থাৎ তারাই দেখতে পায় যারা দুঃখ-বেদনায় অবিচল ও সত্যনিষ্ঠ থাকে এবং যারা স্বাচ্ছন্দে থাকাকালে কৃতজ্ঞতা ভরে আল্লাহ পাকের দরবারে লুটিয়ে পড়ে। সত্যিকারে বলতে কি, ওপরে উল্লেখিত উভয় অবস্থাতেই মানুষ ভ্রান্তিজালে আটকা পড়ে যায় এবং নানা প্রকার অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে বসে।

বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া

মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন এবং তাকে নানা প্রকার জ্ঞান গরিমা-দ্বারা ভূষিত করেছেন; কিন্তু মানুষ একটু কষ্টে পড়লে ঘাবড়ে যায়, দৃঢ়-চিত্ততা অবলম্বন করতে পারে না। আবার যখন নানাবিধ নেয়ামত পায় তখন সে যে নেয়ামত দাতার শোকরিয়া আদায় করতে গিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আত্ম-নিবেদিত প্রাণ হয়ে যাবে– তা হয় না; বরং দেখা যায়, তাদেরকে কোনো মুসীবত স্পর্শ করলে তারা ব্যাকুল চিত্তে কাতর ধ্বনি করতে থাকে, আর যখন তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নানাবিধ কষ্ট থেকে নাজাত দেন, তখন তাদের মধ্যে খুবই অল্প কিছুসংখ্যক লোক-ছাড়া বাকি লোকেরা না শোকরি করতে থাকে; অর্থাৎ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা সূচক কথা না বলে তাঁর প্রশংসা ও কৃতিত্বের কথা ঘোষণা না করে এবং তাঁর হুকুম পালনে যত্নবান না হয়ে অন্য কারও কৃতিত্বের কথা প্রচার করতে শুরু করে দেয়। আয়াতে এই কথাটাই প্রকাশ পেয়েছে,

'আর যখন পাহাড়সম ঢেউ এসে তাদের ঢেকে ফেলে তখন তারা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাঁর সমীপে ব্যাকুল চিত্তে মিনতি জানাতে থাকে।'

সে মহা বিপদের উদাহরণ হচ্ছে এই যে, পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ যখন তাদের ওপর দিয়ে এসে তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং জাহাজটি যখন বিশাল মহাসাগরের বুকে উত্তাল তরংগের প্রচন্ড আঘাতে ওযনবিহীন পাখনার মত দুলতে থাকে তখন মানুষের শক্তি-ক্ষমতার মিথ্যা আত্মবিশ্বাস মুহূর্তেই দূর হয়ে যায়। তখন তারা তাদের কাল্পনিক শক্তি-ক্ষমতার কথা ভুলে যায়। এ আত্মবিশ্বাসই তাদেরকে সচ্ছলতার সময়ে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে এবং কর্তব্য কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাদেরকে তাদের মধ্যে অবস্থিত স্বাভাবিক দুর্বলতা এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা থেকে ভুলিয়ে রেখেছে। অবশেষে যখন তাদের এসব বাধা-বিঘ্ন কেটে গেছে এবং তাদের আমল প্রকৃতি যখন সকল পর্দা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে, দৃঢ়তার সাথে তারা যখন তাদের রব-এর দিকে, এগিয়ে গেছে তাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে মনোযোগী হয়েছে এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁকে আনুগত্য দিয়েছে; তখন তারা তাদের সকল শরীকদেরকে অস্বীকার করেছে, সকল হস্তক্ষেপকারীকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডেকেছে।

'তারপর যখন তিনি তাদেরকে রক্ষা করে স্থলভাগের দিকে নিয়ে যান, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ(বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝে দোল খায়।'

মোমেনের আত্মমর্যাদার দাবী হচ্ছে, সে সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করবে এবং সর্বাবস্থায় এবং সকল কিছুর জন্য আল্লাহ পাকের কৃতিত্ব ঘোষণা করবে এবং একমাত্র তাঁর কাছেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। প্রকৃতপক্ষে সকল কিছুর শোকরিয়া পাওয়ার অধিকারী একমাত্র তিনি। সুতরাং এ বিষয়ে মধ্যম পথ অবলম্বনকারী হওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রকারান্তরে এ কথাই জানানো যে, শক্তি-ক্ষমতা ও কৃতিত্বের কিছু অংশ অন্য কারও হাতে আংশিক হলেও আছে বলে স্বীকার করা।

ওদের মধ্যে আরও একটি গ্রুপ আছে যারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর কৃতিত্ব মানতে চায় না, বরং বিপদমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ও সুদিনের মুখ দেখামাত্র তারা তাঁর ক্ষমতার নিদর্শনগুলোকে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার কথা জানাতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

('আমি সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ বলছি), আমার (শক্তি-ক্ষমতার) নিদর্শনগুলোকে একমাত্র তারাই অস্বীকার করে যারা চরম অবাধ্য ও ধোঁকাবাজ।' ....এখানে 'খাত্তার' শব্দটি বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা ভীষণ ও মারাত্মক রকমের বিশ্বাসঘাতক এবং 'কাফূর' বলতে বুঝায় সেসব মানুষকে যারা, আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর নেয়ামতসমূহকে ভীষণভাবে অস্বীকারকারী এবং চরম অকৃতজ্ঞ। এই চরম অর্থবোধক শব্দগুলোই এখানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর শক্তি ক্ষমতার এতোসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা সত্তেও যারা তাঁকে মানতে চায় না, একমাত্র তাঁর কাছে মাথা নত না করে তারা অলীক ও অতি ক্ষণস্থায়ী কিছু ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষমতাধিকারী মনে করে; আর শুধু মনে করেই যে ক্ষান্ত হয়, তাও নয়, বরং শক্তি-ক্ষমতার মিথ্যা দাবীদার ও কল্পিত ক্ষমতাধরদের প্রতিভূ মনে করে নিজ হাতের প্রস্তুত করা (দেব-দেবতার) মূর্তিসমূহের সামনে তারা তাদের মাথা নত করে, তাদের কাছে সাহায্য চায় এবং তাদেরকেই ভাল-মন্দের কর্তা মনে করে। সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে বড়ই মহব্বত করেন এবং ওই সব অকূল সাগরের বুকে উত্তাল তরংগের মধ্যে পতিত হতাশাগ্রস্ত যাত্রীদের এমন দয়া করে উদ্ধার করার পর তারা তাঁর গুণগান না করে অন্য কারো গুণ কীর্তন করবে এটা কতো কঠিন কথা, এর দ্বারা সুস্পষ্ট সত্যকে তারা অস্বীকার করে এবং এর দ্বারা তারা তাদের প্রকৃতিকে কত ভীষণভাবে অপমান করে তা একটুও ভেবে দেখে না।

তরংগাভিঘাতে বিক্ষুব্ধ মহাসাগর বক্ষের বিভীষিকাময় সে অবস্থার দিকে লক্ষ্য করুন এবং সে ভীষণ বিপদে পতিত হতাশাগ্রস্ত জাহাজের যাত্রীদের দিকেও একবার কল্পনার দৃষ্টিতে দেখুন; সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং সবাইকে ভুলে গিয়ে কিভাবে কায়মনোবাক্যে তারা রব্বুল আলামীনকে ডাকছে! আসলে এই সময়েই তারা তাদের সত্য সঠিক প্রকৃতির মুখোমুখী হয় এবং এই সময়েই তারা সঠিকভাবে তাদের স্রষ্টাকে চিনতে পারে, এই সময়েই তাদের আন্তরিকতা, তাদের জ্ঞানের গর্ব ও শক্তি-ক্ষমতার বড়াই সব দূর হয়ে যায়। জীবনে যতো বিপদই আসুক না কেন– কূলহীন, কিনারাহীন সাগরবক্ষে এ মহা বিপদের কোনো তুলনা নেই, পৃথিবীর সকল বিপদের মধ্যে এটাই সব থেকে বড় বিপদ। এ মহা বিপদকালে মানুষ তাদের তুচ্ছতা, তাদের দুর্বলতা এবং তাদের সীমাবদ্ধতার কথা সম্যক উপলব্ধি করে। এ সময়ে, এমনই এক কঠিন

বিপদের মধ্যে তারা পতিত হয় যে তখন কারও কথা মনে থাকে না। পরিবার পরিজন ও দুনিয়ার সকল শক্তি ক্ষমতার কথা ভুলে তারা একাগ্রচিত্তে নিজেদেরকে বিশ্বপ্রভুর দরবারে নিবেদন করে। এ সময় পিতা তার সন্তানের কথা ভুলে যায়। বিপদের ঘনঘটা সন্তান ও পিতার মাঝে এমনভাবে আড় হয়ে দাঁড়ায় যে তখন দুনিয়ার কোনো কিছুই মনে থাকে না, কারও কথাই মনে করার অবসর থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন নিজেকে একান্ত একাকী অনুভব করে। অনুভব করে যে, তাকে সাহায্য করার কেউ নেই। কারও ক্ষমতা নেই সামান্যতম সহায়তা দেয়ার, তখন সকল আত্মীয়তা ও সকল বন্ধন শুধু অবান্তর অনভিপ্রেত অনাকাংখিতই মনে হয়– তাইই নয়। বরং তখন সকল আত্মীয়তা ও সকল বন্ধন যেন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যেদিন কেউই কারো উপকার করতে পারবেনা

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, এমন একটি দিনকেও ভয় করো, যেদিন কোনো পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় ....জীবন তোমাদের কোনোরকম প্রতারিত করতে না পারে এবং প্রতারক (শয়তান) যেন কখনো তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো ধোঁকা দিতে না পারে। (আয়াত ৩৩)

কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে যে কঠিন আতংক মানুষকে পেয়ে বসবে তা হচ্ছে তাদের মানসিক আতংক। এ আতংক তাদের চেতনা ও অন্তরকে এমন কঠিনভাবে অবসাদগ্রস্ত করে দেবে যে দেহের সকল শক্তি নিঃশেষে খতম হয়ে যাবে।(১) এ সময়ে আত্মীয়তা ও সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, দয়া মায়া মমতার সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। বংশীয় সম্পর্ক সবই কেটে যাবে, সন্তান ও পিতার ভালোবাসার সকল বন্ধন শেষ হয়ে যাবে– আরও যত প্রকার সম্পর্ক আছে তাও হাশরের সে কঠিন দিনে শেষ হয়ে যাবে। প্রতিটি মানুষ নিজেকে সেদিন একান্ত একাকী ও অসহায় অনুভব করবে। কেউ কাউকে সে মহা বিপদে সাহায্য করতে পারবে না। সেদিন নিজের কাজ ও নিজের পাওনা পাওয়া ছাড়া এ সময়ে কেউ কারও কোনও উপকার করতে পারবে না। এত কঠিন এ সময়কার এই বিপদ যার কোনো তুলনা করা যায় না। এ জন্য আজ সময় থাকতেই মানুষকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই আল্লাহ ভীতিই মানুষকে সেদিন আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র হতে সাহায্য করবে এবং তাদের মিনতি সেদিন বৃথা যাবে না। আখেরাতের অবস্থার চিত্রটি এখানে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে যা যে কোনো হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য।'

অর্থাৎ তিনি তাঁর ওয়াদা খেলাফ করবেন না এবং তাঁর ওয়াদা করা শাস্তি বা প্রতিদানকে তিনি বিলম্বিতও করবেন না। সেদিনকার কঠিন ও ভয়াবহ দিন থেকে কেউ কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না এবং কেউ সে দিনের সুক্ষ্ম হিসাব গ্রহণ থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না। যে যেটুকু করেছে তার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিচার করে যার যেটুকু পাওনা তাকে তা যথাযথভাবে বুঝে দেয়া হবে। এ বিচারের হাত থেকে না পিতা রেহাই দিতে পারে সন্তানকে, না সন্তান পিতাকে!

'সুতরাং, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়' ....।

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন এবং এ জীবনে যা কিছু আকর্ষণীয়, তা যেন তোমাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে না রাখে যে, চাকচিক্যময় তোমাদের এ জীবন বরাবর একই রকম থাকবে। একটু খেয়াল করে দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমাদের এখানকার ভোগ-বিলাসের যাবতীয় দ্রব্য

(১) দেখুন 'মাশাহিদুল আলামে ফিল কোরআনে'–গ্রন্থে 'আল আলামুল আখারুফিল ক্বোরআন অধ্যায়টি পৃঃ ৪২-৪৪

এবং আমোদ-ফূর্তির বিষয়সমূহ সবই সাময়িক এবং অতি ক্ষণস্থায়ী। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই এসব তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। সীমাবদ্ধ সে সময়টি শেষ হয়ে গেলেই এগুলো তোমাদের থেকে দূরে সরে যাবে; অতএব বুঝা দরকার যে এগুলো দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে যে, ভোগ-বিলাসের এসব জিনিসের মধ্যে তোমরা মজে যাও, না তোমাদের পরবর্তী যিন্দেগীকে সমৃদ্ধ করার জন্য তোমরা ব্রতী হও। আবারও স্মরণ করানো হচ্ছে,

'এবং তোমাদেরকে যেন (এসব বস্তু) আল্লাহ থেকে গাফেল না করে দেয়' ....।

অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভুলে থাকার জন্য সম্পদ-সমৃদ্ধির আকর্ষণ তোমাদেরকে দারুণভাবে প্রলুব্ধ করে, নানা কর্মব্যস্ততা পরকালীন জীবনের কথা মনে করা থেকে ভুলিয়ে রাখে, অথবা শয়তান এমন সব আজে বাজে কথা মনের মধ্যে জাগাতে থাকে যে মানুষকে কিছুতেই স্মরণ করতে দেয় না যে এ জীবনের কোনো শেষ আছে এবং পরকাল বলে কিছু থাকতে পারে। এসব শয়তানও তো আছে অনেক কিসিমের, যেমন সম্পদের প্রতি অদম্য লোভ এবং সম্পদের অহংকার এক শয়তান, জ্ঞানের অহংকার এক শয়তান, বয়সের অহংকার এক শয়তান, শক্তির দর্প এক শয়তান, ক্ষমতার বড়াই এক শয়তান, কুপ্রবৃত্তির তাড়ন এক শয়তান এবং দুর্দম যৌন আবেগ এক শয়তান। অপর দিকে এসব শয়তানকে ঠেকানোর জন্য ডাল স্বরূপ কাজ করে আল্লাহ তায়ালার ভয় এবং আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস!

যে বিষয়গুলো একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন

আলোচ্য সূরাটির চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে আখেরাতের এই ভয়াবহ দৃশ্য পেশ করার পর গভীরভাবে হৃদয়কে বশীভূত করার জন্য আখেরাত সংঘটিত হওয়ার কথাটি অত্যন্ত জোরালোভাবে আসছে, যাতে করে আখেরাতের ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা হৃদয়কে বিগলিত করতে পারে। এ বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর জ্ঞানকে ছবির মতো তুলে ধরা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে মানুষ গায়ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আর এটাই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় কমতি। সূরাটির সকল অংশে এ কথাটিকে তুলে ধরা হয়েছে, বরং এই মহা বিস্ময়কর কেতাবের সর্বত্র মানুষের এই দুর্বলতার কথাটিকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যেন মানুষ তার সীমাবদ্ধতাকে স্মরণ করে নতি স্বীকার করে এবং কেয়ামতের বাস্তবতা অনুধাবন করে,সময় থাকতেই সাবধান হয়। এরশাদ হচ্ছে,

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে কেয়ামতের আগমনের (সঠিক) জ্ঞান আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন (তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না কখন কোথায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে), তিনিই জানেন যা শুক্রকীটে (মজুদ) রয়েছে (তা ছেলে না মেয়ে, শুক্রকণায় থাকা পর্যন্ত তা কেউই জানে না), কোনো মানুষই বলতে পারে না (সে নিজে) আগামীকাল সে কি (রেযেক কিংবা কি কর্মফল) কামাই করবে, না কেউ এ কথা বলতে পারে যে কোন্ যমীনে সে মৃত্যুবরণ করবে, নিসন্দেহে (এ তথ্যগুলো একমাত্র) আল্লাহ তায়ালাই জানেন, (তিনি) সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে (তিনি অবহিত)। (আয়াতা ৩৪)

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা কেয়ামতকে মানুষের কাছে অদৃশ্য বানিয়ে রেখেছেন। একমাত্র তিনি ছাড়া সে দিনের রহস্য সম্পর্কে আর কেউ কিছুই জানে না। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টিকে পরিপূর্ণভাবে রহস্যময় করে রাখতে চেয়েছেন, যাতে করে মানুষ এ বিষয়ের ব্যাপারে সারাক্ষণ ভয়ে থাকে, এর জন্য প্রতীক্ষা করতে পারে এবং এর মুখোমুখী হওয়ার জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকে; অথচ কবে কেয়ামত সংঘটিত হবে তা কেউই জানে না; অবশ্যই যে কোনো মুহূর্তে হঠাৎ করে সে ভয়াবহ দিন এসে যাবে, সে সময়ে সে সফরের পাথেয় যোগাড় করার জন্য সে

কঠিন দিনকে বিলম্বিত করার কোনো সাধ্য কারও থাকবে না, কোনো কাজে আসবেন না না তার সহায় সম্পদ।

আর আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর বুঝমতোই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, বর্ষণ করেন সেই পরিমাণে যা তাঁর মর্জিতে আসে; আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দান করেছেন তার দ্বারা সে এমন এক পরিমাপ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার দ্বারা সে বৃষ্টি আসার পূর্বে তার পূর্বাভাস হয়তো জানতে পারে। তাই বলে সে বৃষ্টি আসার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না।

তাই আল্লাহ তায়ালার কালাম আমাদেরকে জানিয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। কারণ তিনিই সেই সব কারণ ও উপকরণাদি সৃষ্টি করেন যা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন। সুতরাং বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে বিশেষ ক্ষমতাটির প্রয়োগ জরুরী বলে আমরা জানি তা হচ্ছে বৃষ্টি আনয়নের জন্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি। আলোচ্য আয়াতটিতে এ পথটিকেই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, গায়বের খবর একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন, একান্তভাবে এ ক্ষমতাটি তাঁর হাতে নিবদ্ধ-একথাটি যারা মানতে চায় না তারা নানা প্রকার কল্পনাপ্রসূত কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়, অথচ ভ্রান্ত মানুষ এটা হিসাব করতে চায় না যে সকল বিষয়ের সকল অবস্থার প্রকৃত ও নিশ্চিত জ্ঞান এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও হাতে নেই। একমাত্র তাঁর জ্ঞানই সঠিক ও পূর্ণাংগ এবং সে জ্ঞান এমন চিরস্থায়ী যে তার মধ্যে কোনো কমবেশী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনিই (নিশ্চিতভাবে) জানেন যে মাতৃগর্ভে শুক্রকীটটির মধ্যে কি আছে। ....এখানে বলা হয়েছে, একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালাই জানেন কেয়ামতের জ্ঞান ও রহস্যের প্রতীক মাতৃগর্ভে অবস্থিত ভ্রুণ সম্পর্কে, বলা হচ্ছে, এ বিষয় দুটি শুধু তিনিই জানেন, আর কেউই এ বিষয়ে কিছু জানে না, জানে না নিশ্চিতভাবে এসব অন্য কেউ। জরায়ুর মধ্যে কি আছে, প্রতি মুহূর্তে কি বর্ধিত হচ্ছে, বাড়তি বা কমতি হওয়ায় কি উন্নতি হচ্ছে, সন্তান ধারণের পর জরায়ুর মধ্যে সংকোচন বা বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত জ্যান্ত না মৃত, পুরুষ না নারী ভ্রুণ- এ বিষয়ে নিশ্চয়তার সাথে কেউ কিছুই জানে না, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এ বিষয়ে জানেন। গর্ভ ধারণের প্রথম মুহূর্তে পুং জীবকোষ ও ডিম্বকোষের সম্মিলন কেমন করে হয় এবং কিভাবে ভ্রুণ গঠিত হয়, এর বৈশিষ্ট, অবস্থা এবং এর শক্তি ক্ষমতা সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না। এসবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছেই রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে;

'কোন ব্যক্তি জানে না, আগামীকাল কে কি রোযগার করবে।'

অর্থাৎ, কেউ জানে না, কে কি ভাল জিনিস উপার্জন করবে এবং কে কি মন্দ উপার্জন করবে, কে উপকৃত হবে, আর কে তার নিজ উপার্জন দ্বারা তার নিজেরই ক্ষতি ডেকে আনবে; কার জীবন সহজ হবে আর কার জীবন হবে সমস্যা-সংকুল; কে সুস্থ থাকবে আর কে হবে অসুস্থ। কে আল্লাহ তায়ালার অনুগত থাকবে আর কে করবে নাফরমানী। এখন উপার্জন শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় আগামীকাল মানুষ আর্থিক যেসব জিনিস লাভ করবে তার ওপর; কিন্তু আগামীকাল কি হবে না হবে সবই অদৃশ্যের আঁধারে আবদ্ধ হয়ে লুকিয়ে রয়েছে, তা পর্দার আড়ালে ঢাকা রয়েছে আর মানুষও রয়েছে অদৃশ্যের আঁধারের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, পর্দার ওপাশে কোন পরিণতি অপেক্ষা করছে তার জন্য তা দেখার ক্ষমতা তার নেই।

আর এইভাবে ' মানুষ জানে না কোন যমীনে সে মৃত্যু বরণ করবে।'

সেটা এমন এক বিষয় যা পুরোপুরি অজানার ঘন অন্ধকারে ঢাকা রয়েছে। সে অন্ধকারের পর্দা এতোই পুরু যে তা ভেদ করে সেখানকার কোনো খবর আমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না বা সে দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি স্পর্শ করে না।

এই কঠিন পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ বড়ই অসহায় বোধ করে এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গুটি গুটি হয়ে যায় এবং সে বিশ্ব সম্রাটের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় যেহেতু শত চেষ্টা করেও এ রহস্য জাল ভেদ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তখনই সে গভীরভাবে অনুভব করে যে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টি-শক্তি কতো সীমাবদ্ধ। সে তার অক্ষমতার কথা উপলব্ধি করে, তার মেকী অহংকার ও ভালমন্দ বিচার ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দাবী দূরীভূত হয়। গায়বের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, মহাবিশ্বের জ্ঞানভান্ডার থেকে অতি সামান্যই তাকে দেয়া হয়েছে এবং সে জানে না এ প্রাচীরের অপর দিকে কী নিগূঢ় রহস্য ভান্ডার রয়েছে যা কোনো দিন মানুষ জানতে পারেনি।

আর আগামীকাল কী ঘটবে তা তারা বুঝতে পারতো না! এমনকি পরবর্তী মুহূর্তে কী ঘটবে তাও তারা বুঝতে পারত না, আর এই অক্ষমতার উপলব্ধিই মানুষকে তার অংহকার এবং নিজের বড়ত্বের চেতনা থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে।

আল কোরআনের এই প্রবল প্রভাবপূর্ণ ও গভীর আলোচনার ধারা মানুষের অন্তরের মধ্যে হাশরের মাঠ সম্পর্কে প্রচন্ড এক আশংকার অনুভূতি জাগায়।

সকল যামানা ও সকল দেশ, বর্তমানের বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের দৃশ্যমান সত্য এবং দূর ভবিষ্যৎ ও সর্বকালের সর্ব অবস্থা ও সকল কিছুর তুলনায় প্রশস্ত সে ভয়ংকর হাশরের ময়দানের ভয় মানুষের অন্তরের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দখল করে রেখেছে; মানুষের আশা আকাংখার মধ্যে এবং মানুষের দৃঢ় চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও রয়েছে এ প্রচন্ড ভীতি; এ ভীতি হচ্ছে বহু দূরে অবস্থিত কেয়ামত সম্পর্কে, এ প্রচন্ড আশংকা হচ্ছে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত বৃষ্টির উৎস থেকে বারিবর্ষণ সম্পর্কে, এ কঠিন আতংক হচ্ছে চোখের আড়ালে গোপন স্থানে অবস্থিত বাচ্চাদানির মধ্যে ভ্রূণ সম্পর্কে। এ সংশয় হচ্ছে আগামীকালের উপার্জন সম্পর্কে, এ ভীতি রয়েছে সেসব জিনিসের জন্য যা নিকট দূরত্বে রয়েছে এবং যা রয়েছে অজানার মধ্যে অদৃশ্য, এ মারাত্মক ভয় বিরাজ করে মৃত্যু ও দাফনের দিন ক্ষণ ও মৃত্যুর পর কোথায় দাফন করা হবে সেই স্থান সম্পর্কে, অথচ এগুলো সবই হচ্ছে ধারণার অতীত ব্যাপার। কেয়ামতের সেই সুবিশাল ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে সর্বকালের সারাবিশ্বের সকল মানুষের কল্পনাতীত এ মহা-মহা সমাবেশে মানুষ ঊর্ধশ্বাসে তাদের শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করবে; কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বর্ণনার মধ্যে সে ভয়াবহ দিনের দৃশ্য এমন ছবির মত তুলে ধরা হয়েছে যে, এ বর্ণনা পাঠকালে যে কোনো ব্যক্তির অন্তর, সে ভয়ংকর দিনের সকল অবস্থার সংস্পর্শে এসে দুরু দুরু করে কাঁপতে থাকে। এ সময়ে সকল অবস্থা একত্রিত হয়ে, অন্তরের মধ্যে গায়বের প্রশ্নের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় এবং আমরা সবাই যেন একটি আবদ্ধ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে জানালার ওপাশের অবস্থা জানার জন্য আমরা অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকি। আমাদের কাছে মনে হতে থাকে; যদি সূঁচের ছিদ্রের মতো একটি অতি সূক্ষ ছিদ্র পথেও ওপাশের দৃশ্যটি দেখতে পেতাম তাহলে জানা অজানার ব্যবধান ঘুচে যেত এবং এই নিকট এবং সে দূর সবই একাকার হয়ে সকল রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে যেতো। আর তাহলে সব দূরের বিষয়ের জট আমাদের সামনে খুলে যেতো, তার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি-কাজে পিতামাতার ভূমিকা অন্যতম............... কিন্তু না, এ বাতায়ন পথে সে অজানা রহস্যকে জানার

জন্য কোনো সামান্যতম ছিদ্রও নেই এবং মানুষের কাছে এ রহস্যের দ্বার চিরদিন অবরুদ্ধই রয়ে গেছে।(১) কারণ এ বিষয়টি জানা মানুষের ক্ষমতার বাইরে এবং মানুষের জ্ঞান-সীমার সম্পূর্ণ বাইরের বিষয়। সে অজানা রহস্য একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালাই জানেন অন্য কারও পক্ষেই তা জানা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই গায়বী এলেম কাউকে যৎ কিঞ্চিৎ কিছু দিতে চাইলে দিতে পারেন, এটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে কেউ কোন বাহাদুরীর দাবী করতে পারে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাই (সকল বিষয়ে) ওয়াকেফহাল।'

অর্থাৎ জাননেওয়ালা এবং সকল বিষয়ে খবর রাখনেওয়ালা তিনি ছাড়া নেই আর কেউ।

এইভাবেই সূরাটি সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ সে ভয়ানক দূরবর্তী ও দিগন্তব্যাপী সর্ববিষয়ের গভীর ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই সূরাটির অবতারণা, যা জানার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে থাকে, চলমান জীবন যে মহাকালের সফরে থাকাকালে পার্থিব জীবনের মধ্যে ক্ষণিকের যাত্রা বিরতিতে আত্মতৃপ্তি বোধ করে, তাদের এই অসার প্রয়াসের তুচ্ছতা জানানো এবং দূরের হলেও সুনিশ্চিত পরিণতির দিকে তাদেরকে অগ্রসর করে দেয়াই সূরাটির কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য। তাই মানুষকে উদাত্ত কণ্ঠে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং পরবর্তীতে কী পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে, সে বিষয়টিকে রেখে নিজের জীবনের হীতকর্তব্য নির্ধারণ করে নিতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। দুনিয়ার বাস্তবতার মধ্য দিয়ে ধীর মন্থর পদক্ষেপে সে তো তার নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তার সামনে দিগন্তব্যাপী এক মহা পুস্তক এই গোটা বিশ্বে রয়েছে এবং তার মধ্যস্থিত দৃশ্যসমূহ ও বিশাল এ জীব জগৎ! এসব কিছুর দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করার জন্য তাকে বারবার আহ্বান জানানো হচ্ছে যেন সে নিজ মালিককে চিনতে পারে, তাঁরই পরিপূর্ণ আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং সময় থাকতেই মহাকালের সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহে তৎপর হতে পারে।

নাতিদীর্ঘ এ সূরাটি মাত্র চৌত্রিশটি আয়াত নিয়ে গঠিত। এরই মধ্যে মহাবিশ্বের মহান প্রতিপালক তাঁর সম্পর্কে জানানো ও মানুষকে কর্তব্য সচেতন করার জন্য যে অমিয় মহাবাণী প্রেরণ করেছেন তা বিদগ্ধ হৃদয়ে অবশ্যই গভীরভাবে রেখাপাত করে। সুতরাং বড়ই বরকতময় তিনি, অযাচিত যাঁর মেহেরবাণী, সকল অন্তরের তিনি সৃষ্টিকর্তা। আর হাঁ, সেই মহান আল্লাহ তায়ালাই তো মহামূল্যবান গ্রন্থ আল কোরআনের অবতরণকারী– অবশ্যই এ পাক কালাম মনের নানা জটিলতা ও বক্রতারূপ ব্যাধির আরোগ্য দানকারী এবং মোমেনদের জন্য তা হেদায়াত ও রহমত, যা মযলুম ও দুঃখী জনগণের ব্যথাহত অন্তরে নিরবধি সিঞ্চন করে যচ্ছে।

---

(১) এ বাক্যটি গৃহীত হয়েছে লেখকের রচিত: 'আত্তাসওয়ীরুল ফান্নিউ ফিল কোরআন' গ্রন্থের অধ্যায়– 'আত্ তানাসিকুল ফান্নিউ' থেকে।

সূরা আস সাজদা

আয়াত ৩০ রুকু ৩

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ① تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ② اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ③ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ④ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ⑤ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑥ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ⑦

রুকু ৪

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে—

১. আলিফ-লা-ম-মী-ম, ২. সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কেতাবের অবতরণ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; ৩. তারা কি একথা বলতে চায় যে, এ (কেতাব)-টা সে (ব্যক্তি) রচনা করে নিয়েছে? (না)— বরং এ হচ্ছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (নাযিল করা) একটি সত্য (কেতাব, আমি এটা এজন্যে নাযিল করেছি), যাতে করে এর দ্বারা তুমি এমন এক জাতিকে (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করে দিতে পারো, যাদের কাছে (নিকট অতীতে) তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি, সম্ভবত তারা হেদায়াত লাভ করতে পারে। ৪. আল্লাহ তায়ালা— যিনি আকাশমালা, যমীন ও উভয়ের মাঝে অবস্থিত (সবকিছু) ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন; (তিনি ছাড়া) তোমাদের কোনো অভিভাবক কিংবা সুপারিশকারী নেই; এর পরও কি তোমরা বুঝতে পাচ্ছো না! ৫. আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সবকিছু তিনিই পরিচালনা করেন, তারপর (সবকিছুকে) তিনি ওপরের দিকে নিয়ে যাবেন (এমন) এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর। ৬. তিনিই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু, ৭. যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সুন্দর (ও নিখুঁত) করেই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে,

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾ وَقَالُوْٓا

ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ۬ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ

كٰفِرُوْنَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ

تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ

اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا

كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ

৮. অতপর তিনি তার বংশধরদের তুচ্ছ তরল একটি পদার্থের নির্যাস থেকে বানিয়েছেন, ৯. পরে তিনি তাকে ঠিকঠাক করলেন এবং তার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের কাছ থেকে 'রূহ' ফুঁকে দিলেন এবং তোমাদের জন্যে (তাতে) কান, চোখ ও অন্তকরণ দান করলেন; তোমাদের খুব কম লোকই (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) শোকর কৃতজ্ঞতা আদায় করে। ১০. (আল্লাহ তায়ালাকে যারা অস্বীকার করে) তারা বলে, আমরা (মৃত্যুর পর) যখন মাটিতে মিশে যাবো তারপরও আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করা হবে? (মূলত) এরা তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাৎকারের বিষয়টিকেই অস্বীকার করে। ১১. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, জীবন হরণের ফেরেশতা- যাকে তোমাদের (মৃত্যুর) ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, (অচিরেই) তোমাদের জান কবয করে নেবে, অতপর তোমাদের সবাইকেই মালিকের দরবারে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

রুকু ২

১২. (হে নবী,) যদি তুমি (সে দৃশ্য) দেখতে- যখন অপরাধীরা নিজেদের মালিকের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে (এবং বলতে থাকবে), হে আমাদের মালিক, আমরা (তো আজ সবকিছুই) দেখলাম এবং (তোমার সিদ্ধান্তের কথাও) শোনলাম, অতএব তুমি আমাদের আরেকবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, নিশ্চয়ই আমরা (এখন) পূর্ণ বিশ্বাসী। ১৩. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) আমি চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়াত দিয়ে দিতাম, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে সে ঘোষণা আজ সত্য প্রমাণিত হলো যে, আমি মানুষ ও জ্বিনদের মধ্য থেকে (এদের) সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো। ১৪. অতপর (ওদের বলা হবে,) যাও, তোমরা জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করো, যেভাবে তোমরা আজকের এ সাক্ষাৎকারের কথা ভুলে গিয়েছিলে, আমিও (তেমনি আজ)

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ

إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ সাজদা

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ

يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي

كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ

الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

তোমাদের ভুলে গেলাম, যাও– তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসেবে (জাহান্নামের) চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করো। ১৫. আমার আয়াতসমূহের ওপর তারাই ঈমান আনে, যখন তাদের (আয়াত দ্বারা) উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সাথে সাথেই সাজদাবনত হয়ে পড়ে, উপরন্তু তারা তাদের মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং নিজেরা অহংকার করে না। ১৬. তাদের পার্শ্বদেশ (রাতের বেলায়) বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা (নিশুতি রাতে আযাবের) ভয়ে এবং (জান্নাতের) আশায় তাদের মালিককে ডাকে, তদুপরি আমি তাদের যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে। ১৭. কোনো মানুষই জানে না, কি ধরনের নয়ন প্রীতিকর (বিনিময়) তাদের জন্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, (মূলত) তা হবে তাদের কাজের (যথার্থ) পুরস্কার। ১৮. যে ব্যক্তি মোমেন, সে নাফরমান ব্যক্তির মতো হয়ে যাবে? (না,) এরা কখনো এক সমান হতে পারে না। ১৯. অতএব, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে (সুরম্য) জান্নাতে বাসস্থান হবে, এ মেহমানদারী হবে তাদের (নেক) কাজের পুরস্কার, যা তারা করে এসেছে। ২০. যারা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করবে তাদের বাসস্থান হবে (জাহান্নামের) আগুন; যখনি তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে, তখনি তাদের (ধাক্কা দিয়ে) তার ভেতরে ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, যাও, আগুনের সে আযাব ভোগ করে নাও, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে! ২১. (জাহান্নামের) বড়ো আযাবের আগে আমি অবশ্যই তাদের (দুনিয়ার) ছোটোখাটো আযাবও আস্বাদন করাবো (এ আশায়), হয়তো বা এতে করে তারা আমার দিকে ফিরে আসবে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ
وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا
صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۚ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

২২. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে ব্যক্তিকে তার মালিকের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হয়, অতপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; অবশ্যই আমি নাফরমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবো।

রুকু ৩

২৩. (হে নবী, তোমার আগে) আমি মূসাকেও কেতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার (আল্লাহর) সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিতে কোনোরকম সন্দেহ করো না, (আমি যে কেতাব তাকে দিয়েছি) তা আমি বনী ইসরাঈলদের জন্যে পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিয়েছিলাম, ২৪. আমি তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমারই আদেশে মানুষদের হেদায়াত করতো, যখন তারা (অত্যাচারের সামনে কঠোর) ধৈর্য ধারণ করেছে, (সর্বোপরি) তারা ছিলো আমার আয়াতের ওপর একান্ত বিশ্বাসী। ২৫. অবশ্যই (হে নবী), তোমার মালিক কেয়ামতের দিন সেসব কিছুর ফয়সালা করে দেবেন যে সব বিষয়ে তারা দুনিয়ায় মতবিরোধ করে বেড়াতো। ২৬. (হে নবী,) তোমার জাতির লোকদের কি এ থেকেও হেদায়াত আসেনি যে, আমি তাদের আগে কতো জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসস্থানসমূহের মাঝ দিয়েই তারা (সব সময়) চলাফেরা করে; অবশ্যই এতে তাদের (আল্লাহ তায়ালাকে জানা ও চেনার) জন্যে অনেকগুলো নিদর্শন রয়েছে; এরপরও কি এরা শোনবে না! ২৭. ওরা কি লক্ষ্য করে দেখে না, আমি (কিভাবে) উর্বর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করি এবং (পরে) তারই সাহায্যে আমি সে ভূমি থেকে ফসল বের করে আনি, যা থেকে তাদের গৃহপালিত জন্তুগুলো যেমনি খাবার গ্রহণ করে, তেমনি খায় তারা নিজেরাও, এ সত্ত্বেও কি এরা (আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের চিহ্ন) দেখতে পায় না?

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا

يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ

اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

২৮. তারা বলে, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে সে বিজয়ের ক্ষণটি কখন আসবে (যার কথা বলে তোমরা আমাদের ভয় দেখাচ্ছো)। ২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, যারা কুফরী করেছে, বিচারের দিন তাদের ঈমান কোনোই কাজে আসবে না, না তাদের কোনো রকম অবকাশ দেয়া হবে! ৩০. অতএব (হে নবী,) তুমি এদের (এসব কথাবার্তা) থেকে বিমুখ থাকো এবং তুমি (শেষ দিনের) অপেক্ষা করো, নিসন্দেহে তারাও (সেদিনের) অপেক্ষা করছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মানব প্রকৃতির মধ্যে যে সঠিক আকীদা ঘুমিয়ে রয়েছে তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য আল কোরআনের মধ্যে ইতিপূর্বে মর্মস্পর্শী আহ্বানের যে সব আদর্শ নমুনা পেশ করা হয়েছে আলোচ্য সূরার মধ্যে সেই রকমেরই আর একটি নমুনা পেশ করা হলো, যা হৃদয়ের মধ্যে পুরোপুরিই গেঁথে যায়; আর তা হচ্ছে, একমাত্র এক ও নিরংকুশ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার কথা, যিনি মানবজাতিসহ গোটা বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সামনে আনুগত্যের মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়া। একথা মেনে নেয়া যে তিনিই আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর পরিচালক এবং এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর রেসালাত অবশ্যই সত্য; আর এ কথাও মেনে নেয়া যে মানবমন্ডলীকে আল্লাহ তায়ালার দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাঁকে পথ প্রদর্শক হিসাবে পাঠানো হয়েছে। এটা বিশ্বাস করা যে পুনরুত্থান দিবস আছে, একদিন কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, হিসাব-নিকাশ হবে এবং যার যা পাওনা তা পুরোপুরিই তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

আলোচ্য সূরার মধ্যে এসব আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে, আর মক্কায় অবতীর্ণ সকল সূরাতেই বিশেষভাবে অদৃশ্য এসব আকীদা গ্রহণ করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। মূল কথাটির প্রতি সকল মানব-হৃদয়কে আকৃষ্ট করা হয়েছে তা হচ্ছে সবাইকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, এ কথাগুলো সেই মহান সত্ত্বার কাছ থেকে নাযিল হয়েছে যিনি সর্বজ্ঞ এবং সব কিছুই যাঁর জ্ঞান ভান্ডারের মধ্যে রয়েছে। সারাবিশ্বের সকল মানুষের অন্তরের মধ্যে যে চিন্তাস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে সবের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় অবস্থার খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। তিনিই জানেন সে চিন্তাধারার বাঁকে বাঁকে কতো জটিলতা রয়েছে এবং সেসব চিন্তাস্রোত জীবনের গিরি সংকট ও নানাবিধ বন্ধুর পথ অতিক্রম করার সময় কতো প্রকার বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়, তিনিই জানেন সে সব চিন্তাধারার প্রকৃতি কি এবং সে চিন্তাস্রোত কোন উৎসমূল থেকে উৎসারিত হয়; তিনিই জানেন কোন বলিষ্ঠ যুক্তি এসব বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে প্রভাবিত করে ও এককেন্দ্রিক করে এবং অনুকূল ও প্রতিকূল সকল পরিস্থিতির মধ্যে কোন মহামূল্যবান কথা এসব চিন্তাবিদদের হৃদয়ে সাড়া জাগায়।

সূরা আস সাজদা আকীদার বিষয়গুলোকে এমন কিছু নতুন এবং অভিনব পদ্ধতিতে পেশ করেছে যা এর পূর্বে অবতীর্ণ সূরা লোকমান পেশ করেনি। এ বিষয়ক কথাগুলোকে প্রথম দিককার আয়াতগুলোর মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে, পরে এসব কথাকে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ ভাষা ও পদ্ধতিতে মানব হৃদয়ের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যেন অমিয় এ সুধা গাফলতির ঘুমে নিদ্রিত কলবগুলোকে জাগিয়ে তোলে, সত্যের প্রদীপ্ত প্রভায় আত্মাগুলোকে আলোকিত করে, সংসার জীবনের ঘূর্ণাবর্তে পতিত পেরেশান এবং নগদ প্রাপ্তিতে মুগ্ধ হৃদয়গুলোকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে। ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলে, যেমন করে পূর্বে অবতীর্ণ অন্যান্য বহু সূরার মধ্যে সৃষ্টি বৈচিত্রের এসব বিষয়ের ওপর বহু যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা ও পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; আলোচনা এসেছে আখেরাতের সেই দৃশ্যাবলী সম্পর্কে, যার মধ্যে জীবন ও জীবনের স্পন্দন থাকবে, আলোচনা করা হয়েছে অতীতের সেই স্বার্থ সন্ধানী ক্ষমতাধর ও বলদর্পীদের করুণ পরিণতি সম্পর্কে, যার বিবরণে যে কোনো শ্রোতার মনে দাগ কেটে যায় এবং তাকে নিজ অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

ওপরে বর্ণিত সূরাটির ভূমিকার সাথে সাথে আরও যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, সূরাটি পাঠকালে অন্তরের মধ্যে প্রচন্ড এক ভীতির সঞ্চার হয় এবং নিজের অজান্তেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে মাথা নুয়ে পড়ে, সকল অহংকার ও আত্মম্ভরিতা দুর হয়ে যায়। অপর দিকে সত্যকে অস্বীকারকারী অন্তর, ওপরের বর্ণনার সংস্পর্শে এসে আরও বিদ্বেষী, আরও কঠিন এবং আরও জিদ্দী হয়ে যায়; এই জন্য এ উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের পরিণতি সম্পর্কে এমনভাবে জানানো হয়েছে যেন ভাল ও মন্দ সকল ব্যক্তির শেষ পরিণতির ছবিগুলো তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে এবং আল কোরআনের প্রত্যেক পাঠকই যেন এসব দৃশ্য দেখতে থাকে।

আলোচ্য সূরার মধ্যে পেশ করা প্রত্যেকটি বর্ণনা ও দৃশ্যই এমন কিছু বিষয়ের দিকে মানব হৃদয়কে আকৃষ্ট করে যা তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষকে চাংগা করতে থাকে এবং নিদ্রায় ঢলে পড়া মানুষকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে ও চিন্তা-ভাবনা করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে। কেয়ামতের ভয়াবহ বর্ণনা কখনও মনের মধ্যে প্রচন্ড ভয় জাগায়, আবার কখনও আশার সঞ্চার করে, কখনও সতর্ক ও সাবধান হওয়ার জন্য প্রেরণা যোগায়, কখনও লোভ জাগায়, আবার কখনও তৃপ্তি ও অল্পে তুষ্টি আনে। অবশেষে এসব মানসিক অবস্থা সেসব যুক্তি প্রমাণ গ্রহণের দিকে আহ্বান জানায় এবং তখন যে কোনো মানুষ নিজের জন্য একটি পদ্ধতি বেছে নেয় এবং জেনে বুঝে সঠিক ও সমুজ্জ্বল পদ্ধতি অনুসরণ করে তার শুভফলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

আলোচনা প্রসংগে দেখা যাচ্ছে যে, গোটা সূরাটিকে চার বা পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, যার প্রত্যেকটি পাশাপাশি অবস্থিত এবং একটি শেকলের মাধ্যমে তা পরস্পরের সাথে জড়িত। সূরাটি শুরু হচ্ছে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অক্ষর; 'আলিফ লাম ও মীম' দিয়ে। এর দ্বারা আল কোরআন জানাতে চায় যে এই অক্ষরগুলোর শ্রেণী থেকেই আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এগুলো দ্বারা আল্লাহর নিকট থেকে আল কোরআনের অবতরণ ও ওহী স্বরূপ আসা সম্পর্কে সকল সন্দেহের অপনোদন হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সবই রসূলের শিক্ষা এবং তাঁর রব-এর পক্ষ থেকে আগত বাণী সবই এক, যেন এর দ্বারাও রসূল তাঁর জাতিকে সতর্ক করতে পারেন এরশাদ হচ্ছে, 'যেন তারা হেদায়াত পায়'

আর এইটিই হচ্ছে আকীদার বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম বিষয়, অর্থাৎ ওহীর আগমন এবং বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীন সম্পর্কে মানুষকে জানানোর জন্য রসূলুল্লাহ (স.)-এর বার্তাবাহক হওয়ার সত্যতা।

এরপর পেশ করা হচ্ছে সারা জাহানের মালিক, সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং জীবন-মৃত্যুর একমাত্র ফায়সালা দাতা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এবং অস্তিত্বের বুকে তাঁর শক্তি ক্ষমতা ও যাবতীয় গুণাবলী ছড়িয়ে থাকার বিষয়, যা আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু বর্তমান রয়েছে সে সবকে বাস্তবে অস্তিত্ব দান করার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টির বুকে বিদ্যমান এ সব কিছুকে রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত বিষয়াদিকে নিয়ন্ত্রিত করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার শক্তির বহিপ্রকাশ ঘটেছে। পরিশেষে এগুলো সব কিছু যে তাঁর কাছে ফিরে যাবে ও অবশেষে তাঁর কাছেই সবাইকে চলে যেতে হবে, আলোচ্য সূরাতে এ কথাগুলোকে হৃদয়ংগম করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ....এরপর আরও বেশী দৃষ্টি আকর্ষণী যে বিষয়টি পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে; মানব সৃষ্টির সূচনা ও দুনিয়ার বুকে তার বিস্তার দান এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলছে এবং তাকে কান, চোখ ও বুঝ শক্তি দেয়া হয়েছে যেন সেগুলোর দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আর এসব সত্ত্বেও মানুষ খুব কমই আল্লাহ তায়ালার শোকরগোযারি করে

এবারে এখানে দ্বিতীয় বিষয়টিকে পেশ করা হচ্ছে; আর তা হচ্ছে জীবন মৃত্যুর মালিক ও সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর গুণবৈশিষ্ট সম্পর্কে জানানোর কাজ। এই 'উলুহিয়্যাৎ' শব্দটির মধ্যে যে গুণগুলো লুকিয়ে রয়েছে তা হচ্ছে; সৃজনী ক্ষমতা, পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষমতা, এহসান করার ক্ষমতা, পুরস্কার দানের ক্ষমতা, সকল জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার গুণ, দয়ামায়া মমতা ইত্যাদি আর এসব বিষয়ই ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ও পালন সম্পর্কিত আলোচনার প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর আসছে পুনরুত্থানের বিষয়টি; অর্থাৎ এ পার্থিব জীবন শেষে অবশ্যই মৃত্যু আসবে, তারপর এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মৃত অবস্থায় মাটির সাথে মিশে থাকার পর আল্লাহ তায়ালার হুকুমে সবাইকে আবার যিন্দা হয়ে উঠতে হবে। এই বিষয়টির ওপরই সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে সন্দেহ জাগে যে, পচে গলে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার পর আবার শরীরের অণু-পরমাণুগুলো কিভাবে একত্রিত হবে? আবার যিন্দা হওয়া, এটা এক অসম্ভব ব্যাপার ছাড়া আর কি? এ জন্য তাদের কথা উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'ওরা বলল, আমরা এ ধরার বুকে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার কি নতুন এক সৃষ্টিতে পরিণত হবো?' এখানে তাদের সন্দেহ সূচক অত্যন্ত দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তাপূর্ণ কথা দিয়ে এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

এবার আসছে তৃতীয় বিষয়টি। আর তা হচ্ছে কবর থেকে উঠে এসে আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়া আর এখানে এসে দেখা যায়, কেয়ামতের দৃশ্যসমূহের মধ্য থেকে একটি দৃশ্যকে পেশ করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো সেই সময়ের কথা যখন অপরাধীরা তাদের রব এর কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে'–

এ সময়ে তারা আখেরাত সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করতে থাকবে এবং বলবে যে, তাদের নিকট সত্যের যে দাওয়াত পৌছানো হয়েছিলো তা অবশ্যই সত্য, তখন তারা

এমন এমন আরও কিছু কথা বলতে থাকবে, যদি তারা দুনিয়ার জীবনে সে সব কথা বলতো তাহলে তাদের জন্য অবশ্যই জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হতো! কিন্তু এমন সময় তারা এ কথাগুলো বলবে যখন এগুলো তাদের কোনোই ফায়দা হবে না। তখন হয়ত তারা সে ভয়ানক দৃশ্য বাস্তবে দেখার পরেই এসব কথা বলবে। যেহেতু তখন এ দৃশ্যই তাদেরকে অলসতার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু হায়! সংশোধনের সকল সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পরই তাদের চেতনার উদয় হবে আর তাদের ওপর সে কঠিন অবস্থা ও শাস্তি নেমে আসার পরই এই নিস্ফল কথাগুলো তারা বলতে থাকবে। বলবে সেই মুহূর্তে যে মুহূর্তের খবর নবীর মাধ্যমে তাদেরকে পূর্বাহ্নে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তখন তারা নবীকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে এবং চরম হঠকারিতার সাথে তাঁর আনীত সত্যকে অস্বীকার করেছে।

এ প্রসংগে অনাগত সে কঠিন ও দুঃখ ভরা দিনের পূর্বাভাস দানের পাশাপাশি পৃথিবীর বুকে থাকাকালীন মোমেনদের জীবন কেমন ছিল তারও একটি উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরা হচ্ছে, এরশাদ হচ্ছে, 'প্রকৃতপক্ষে তারাই আমার আয়াতগুলোকে বিশ্বাস করে ....আমি তাদেরকে দিয়েছি তার থেকে তারা খরচ করে।'

এ হচ্ছে এক প্রাণ উদ্দীপক অবস্থার ছবি যা তাদের অন্তরের মধ্যে বিরাজমান মহত্ত্বের সাক্ষ্য বহন করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এসব পবিত্র দিল, আল্লাহভীরু ও আখেরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্য সে রোজ হাশরের কঠিন দিনে কি কি বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন সেই কথাটাকেই এখানে চমৎকারভাবে পেশ করছেন। পেশ করছেন তাদের কথা যারা শেষ রাতের অতি গভীর ও আরামের ঘুম ত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালারই মোহব্বতে শয্যা ত্যাগ করে এবং তাঁকে ডাকতে থাকে ভয় ও বুকভরা আশা-আকাংখা নিয়ে। অতএব, সেসব নেক বান্দার জন্য কেয়ামতের সেই ভয়ানক দিনে যে আনন্দঘন ও সুখময় পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া হবে, তা হবে আজকের এই ক্ষণস্থায়ী মানবমন্ডলীর ধারণা-কল্পনা থেকে বহু বহু উর্ধের বস্তু। এ অবস্থাটি জানাতে গিয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে জানানো হচ্ছে, 'না, না কেউ জানে না, কোন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে না, তাদের চোখ জুড়ানোর মত কতো অসংখ্য মর্যাদার জিনিস সেখানে তাদের জন্য সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এসবই হবে তাদের অতীতের নেক কাজগুলোর প্রতিদান।'

এরপর খুব দ্রুতগতিতে আর একটি দৃশ্য সামনে আসছে যার মধ্যে পর্যায়ক্রমে মোমেনদের জন্য আমোদ প্রমোদে ভরা জান্নাত এবং মোনাফেকদের জন্য আগুনে ভরা দোযখের কথা তুলে ধরা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে অপরাধী চক্রের জন্য আর একটি প্রচন্ড ধমকি প্রদান করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, তারা সে বেদনাদায়ক পরিণামের সম্মুখীন হওয়ার আগেই তাদেরকে পৃথিবীর বুকে অবশ্যই কিছু না কিছু শাস্তির মধ্যে ফেলা হবে।

এরপর মূসা (আ.)-এর দিকে কথার মোড় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, জানানো হচ্ছে যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.) ও মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে মানব মন্ডলীর মুক্তির জন্য সময়ান্তরে একই পয়গাম এসেছে। আলোচনা এসেছে মূসা (আ.)-এর কওমের ব্যাপারে, তাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রচুর প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা অবশ্যই সঠিক পথে ছিলো এবং আল্লাহর বাণী নিয়ে তারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিলো। এ কাজ করতে গিয়ে তারা খুবই দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখিয়েছিলো, যার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের সারা বিশ্বের নেতা বানিয়ে দিয়েছিলেন। মূসা (আ.) ও তার কওমের এ বিবরণ পেশ করতে গিয়ে মোমেনদেরকে ইংগীতে

জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সত্যের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও মোহাম্মাদ (স.)-কে ও তাঁর আনীত দাওয়াতকে প্রতিহত করার হীন উদ্দেশ্যে তারা খোদ নবী (স.)-কে যেভাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে, সেই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলায় মোমেনদেরকে পাহাড়ের মতো দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে, সকল অবস্থায় তাদেরকে অনেক অনেক সবর করতে হবে, চূড়ান্ত ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে এবং বিরামহীনভাবে দিকে দিকে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে হবে।

এখানে এই সাথে আর যে কাজটি করার জন্য ইংগীত করা হয়েছে, তা হচ্ছে; সারা জাহানের ইসলাম-দুশমনরা সত্যের বাতিকে নিভিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে জেনে বুঝে ইসলামের সাথে দুশমনি করছে এবং সকল যামানাতেই, নিছক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোনো শ্রেণীর সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার হীন চক্রান্তে তারা মেতে রয়েছে; অথচ এহেন সংগীন অবস্থায় তথাকথিত মুসলমানরা তাদের বাড়ীতে গাফেল হয়ে বসে থাকতে চায়, ইসলামী দাওয়াতকে অপরের নিকট পৌঁছে দেয়ার কোনো দায়িত্বই তারা অনুভব করে না। চিন্তা করে না যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জীব-জানোয়োর মতো শুধু খাওয়া পরা ও ফূর্তি করার জন্যই পয়দা করেননি, বরং তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার। এরপরও তাদের নিশিদিনের ব্যস্ততা চলছে শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী এ জীবনকে কেন্দ্র করেই। এ জন্যে তাদেরকে একবার পৃথিবীর যে কোনো এক ভূমির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখতে আহ্বান জানানো হচ্ছে ও বলা হচ্ছে, 'তাকিয়ে দেখো হে মানব জাতি, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো! কে এ মৃত যমীনকে (একবার মুর্দা বানিয়ে দেয়ার পর) পুনরায় যিন্দা করলো, কে এখানে প্রতিনিয়ত তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে চলেছে এবং কে একে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করে যাচ্ছে! এইভাবে প্রাকৃতিক বিভিন্ন দৃশ্য ও অতীতের পাপিষ্ঠ জাতির ধ্বংসের দৃশ্যাবলী দেখে আশা করা যায়, মানুষ বুঝবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত দৃশ্য ও জীবন্ত দৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।

অতপর সূরাটি ওদের একটি কথার উদ্ধৃতি পেশ করার সাথে সমাপ্ত হচ্ছে,

'কখন আসবে এ বিজয়?' অর্থাৎ, ওরা সেই বিজয় দিবস সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মন নিয়ে এ প্রশ্ন করে যে দিনে তাদের প্রতি শাস্তির ধমকিকে কার্যকর করা হবে এবং মোমেনরা বিজয় লাভে ধন্য হবে! ওদের এসব সন্দেহের জবাবে এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার সাথে বলা হচ্ছে যে, অবশ্যই মোমেনদের সফলতা এবং সত্যবিরোধীদের ওপর তাদের বিজয় আসবেই। রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, তিনি যেন ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দেন তাদের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

এবার আমরা সূরাটির ওপর একটু বিস্তারিত আলোচনা পেশ করছি।

তাফসীর

আয়াত ১-৩০

'আলিফ-লাম-মীম', 'আল কেতাব' অবতীর্ণ হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই ....যাতে করে তারা হেদায়াতের দিকে এগিয়ে যায়।'

উচ্চারিত হলো তিনটি অক্ষর, আলিফ-লাম-মীম এ হরফগুলো আরবের যে সব লোককে সম্বোধন করে উচ্চারণ করা হয়েছিলো তারা বুঝেছিলো এগুলোর গূঢ় মর্ম কি। তারা একথাও জানতো যে এমন কথা তারা নিজেরা তৈরী করতে পারে না, তারা এটাও বুঝতো যে তাদের তৈরী

করা কথা এবং এসব কথার মধ্যে কতো বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যারা ভাষা সম্পর্কে কিছু না কিছু চেতনা রাখে এবং ভাষার মধ্যে কতো নিগূঢ় অর্থ ও চিন্তাধারা লুকিয়ে থাকতে পারে সে বিষয়ে যাদের সামান্যতম জ্ঞানও আছে তারাই বুঝে এ ভাষা মানুষের ভাষা থেকে কতো স্বতন্ত্র। তারা দেখতে পায় আল কোরআনের প্রতিটি আয়াতের মধ্যে এক অকল্পনীয় শক্তি এবং এমন কিছু গোপন ক্ষমতা রয়েছে, যা অন্তরকে বশীভূত করে ফেলে এবং যে কোন পাঠকের অনুভূতির ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করে, যা দুনিয়ার অন্য কোনো ভাষার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। আরববাসীরা অবশ্যই আল কোরআনের এ শক্তিকে অনুভব করেছিল এবং তারা অবাক বিস্ময়ে এ পাক কালামের সামনে ধীরে ধীরে হলেও মাথা নত করতে শুরু করেছিলো, যেহেতু তারা এ মহা গ্রন্থের বাণীর সমকক্ষ কোনো বাণী আর কখনও শোনেনি বা এমন অমিয় বচনের সন্ধানও কখনও পায়নি, তাই যখন এ পাক কালামের সুর লহরী তাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করতে থাকে তখন তারা গভীর আবেগ ভরে দুলতে থাকতো, আর ভাবতো হায় এমন অমিয় বচন তারা আর কখনও শোনেনি, এমন অভিজ্ঞতা তো তাদের জীবনে আর কখনও হয়নি। হায় কী মধু মেশানো রয়েছে এর সুর লহরীতে!

মানুষের কথা ও আল্লাহর কথার মধ্যে পার্থক্য ঠিক সেই রকম যেমন পার্থক্য আল্লাহ তায়ালার কাজ এবং মানুষের কাজে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কীর্তিসমূহ সকল মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে বিরাজ করছে, যার সমকক্ষ নিপুণ কীর্তি কোনোদিন কোন মানুষ স্থাপন করতে পারেনি, না পেরেছে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ কোনো জিনিসের মধ্যে সামান্যতম কোনো পরিবর্তন আনতে! গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, একটি গোলাপ ফুলের পাপড়ির মধ্যে যে বিভিন্ন রং এর সমাহার রয়েছে তা কি সকল যামানার শিল্পীদের জন্য এক অত্যাশ্চর্য শিল্পকার্য হিসাবে বিবেচিত। এমনিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর কীর্তিসমূহকে আল কোরআনের মধ্যে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা কোনো মানুষের পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আল কোরআনের কিছু চিরন্তন আবেদন

'আলিফ-লাম-মীম, রব্বুল আলামীন-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছে এই 'আল-কেতাব।' এটিই একমাত্র সত্য ও নির্ভুল কেতাব। এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এইটিই সেই চূড়ান্তভাবে সুরক্ষিত কেতাব। আল্লাহ তায়ালার কথা ও কাজের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে যে সামঞ্জস্য বিরাজ করছে সেই বিষয়টিকে চূড়ান্ত সত্যরূপে তুলে ধরার জন্যই এইভাবে 'না সূচক' বাক্য ব্যবহার দ্বারা এ কেতাবের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে; অর্থাৎ বলিষ্ঠভাবে আহ্বান জানানো হচ্ছে যেন মানুষ আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন ও অমোঘ এ সত্য কেতাবটিকে বুঝার জন্যে সন্দেহমুক্ত মন নিয়ে অধ্যয়ন করে এবং বাস্তবতার নিরীখে সৃষ্টি রহস্যগুলো বুঝার চেষ্টা করে। এ জন্য সাংকেতিক কয়েকটি অক্ষরের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু রহস্যের দিকে ইংগীত করেছেন, যে বিষয়ে বিতর্ক তোলার ক্ষমতা কোনো বান্দার থাকতে পারে না। সাংকেতিক এ অক্ষরগুলো দ্বারা এ কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, উল্লেখিত এ অক্ষরগুলোর অনুরূপ অক্ষরসমূহের মাধ্যমে আল কোরআন রচিত হয়েছে এবং সেই কথাগুলোকে এমন এক বাচনভংগীতে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অনুপম চমৎকারিত্ব অন্তরকে বিমুগ্ধ করে, যার প্রতিটি কথা ভারসাম্যপূর্ণ এবং এতো পরিমাপ মতো এর প্রত্যেকটি ব্যবহৃত হয়েছে যার বিকল্প অন্য কোনো পদ্ধতি কেউ চিন্তাও করতে পারে না। এ পাক কালামের প্রতিটি আয়াত ও প্রত্যেকটি সূরার মধ্যে এমন কিছু বিস্ময়কর উপাদান রয়েছে যা অন্তরকে কাঁপিয়ে তোলে এবং এ কালামের মধ্যে এমন গোপন শক্তি লুকিয়ে রয়েছে যা যে কোন

হৃদয়ানুভূতিকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করে। যতোবারই মানুষ আল কোরআন খুলে অধ্যয়ন শুরু করে ততোবারই সে তার গোটা অস্তিত্বের মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন অনুভব করে। অধ্যয়নকালে তার গোটা সত্ত্বা পরম পুলক অনুভব করে, তার ধমনীতে এক অভিনব সুর বাজতে থাকে, সে আত্মহারা হয়ে ছত্রের পরে ছত্র পড়তে থাকে আর তার হৃদয়তন্ত্রীতে পাক পরওয়ারদেগারের মধুর বাণী ঝংকৃত হতে থাকে, আর এ বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে এক মুখ থেকে অন্য মুখে।

অতএব বলুন, এ অপ্রতিরোধ্য আবেগ উচ্ছ্বাস কে থামাতে পারে! তাই তো অবাক বিস্ময়ে আমরা দেখতে পাই, আল কোরআন যেথায় পঠিত হয় শত্রু-মিত্র সবার মধ্যে এ মহান কালাম যেন এক যাদুর পরশ বুলিয়ে দেয়। বিরোধিতায় যারা সংকল্পবদ্ধ, এ কালামের আহ্বান যারা স্তব্ধ করে দিতে চায়, তাদের অজান্তেই কখন যে তারা এ মহাবাণীর প্রচারকে পরিণত হয়ে যায় তা তারা নিজেরাই টের পায় না। মহাবিশ্বের সর্বত্র অগণিত অবহেলিত মানুষের মর্মপীড়া দূর করার আহ্বান নিয়ে যে মহান কালাম এসেছিলো শিক্ষা সংস্কৃতির সম্প্রসারণের সাথে সাথে তা দিগ্বিজয়ী অশ্বের মতো ছুটে চলেছে দেশ থেকে দেশ দেশান্তরে, যার গতিরোধ করতে গিয়ে সত্য বিরোধী সম্মিলিত শক্তিবর্গ পাগলপ্রায় হয়ে তাদের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি এটা এক অন্ধ আবেগ? না, এ হচ্ছে যুক্তির শক্তি, চিরন্তন সত্যের শক্তি, এ হচ্ছে 'আল কেতাবের' মহাশক্তি, যে শক্তির সামনে পৃথিবীর সকল শক্তি মাথা নত করতে বাধ্য; বরং আরও খেয়াল করার বিষয় এ পাক কালামের অনির্বাচনীয় অভিব্যক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এমন কিছু শক্তি যার সামনে পৃথিবীর সমুদয় শক্তির সম্মিলিত অগ্রযাত্রা থমকে দাঁড়াতে বাধ্য। এ কেতাবের ধারক ও বাহকদের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ মহাগ্রন্থের অধ্যয়ন, প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে যাওয়া এবং এর আরকান ও আহকামকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো সব চেয়ে বড় প্রয়োজন।

কিন্তু এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, আল কোরআন শুধুমাত্র একটি ভয়ের জিনিস এবং এক অবোধ্য হৃদয়াবেগ আনয়নকারী গ্রন্থ মাত্র; বরং মানব প্রকৃতির নিকট যখন আল কোরআন সরাসরি দাওয়াত পেশ করে তখন যে কোনো হৃদয় মন বলে ওঠে যে, এ মধুর আবেদন কখনও বৃথা যেতে পারে না! এ মহান কেতাবের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবেই, যতোই অন্তর দিয়ে যাচাই বাছাই করা হোক না কেন, যতই যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করা হোক না কেন, মানুষের মন-মগজে জ্ঞান-গরিমার ভান্ডার যতো প্রশস্তই হোক না কেন, আল কোরআনের মধ্যে বর্ণিত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত সকল কথা অনুধাবন করতে কেউই কোনোদিন সক্ষম হবে না এবং যতোই সময় পার হতে থাকবে ততোই মানব সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপাদানের সম্ভার আরও বেশী মানুষের গোচরীভূত হতে থাকবে, অবশ্য এর জন্য শর্ত হচ্ছে আল কোরআনের ওপর অবিচল আস্থা থাকতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই মানুষের স্বাধীন খেয়াল খুশী ও ইচ্ছাকে এর ওপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আল কোরআন কোনো মানুষের তৈরী নয়, এ পাক কালাম সেই কেতাব, 'যা আরশে মোয়াল্লায়' অবিকল এই ভাবে এবং এই ভাষাতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে যেভাবে মোহাম্মদ (স.)-এর নিকট নাযিল হয়েছে। ইতিপূর্বে যত কেতাব নাযিল হয়েছে সে সবই এ 'আল কেতাবের' মধ্যে থেকে গৃহীত হুকুম আহকাম সম্বলিত অন্যান্য ভাষায় ব্যক্ত কেতাব। কিন্তু সপ্ত আকাশের ওপর লিপিবদ্ধ রব্বুল আলামীন-এর নিকট থেকে আসা 'আল কেতাব' অবিকল সে ভাব ও ভাষাসহ একমাত্র মোহাম্মদ (স.)-এর নিকটই নাযিল হয়েছে, এতপর এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

ওরা কি বলছে, সে এ কেতাবকে বানিয়ে নিয়েছে নাকি?

ওরা নিজেরা যেমন কলুষিত চরিত্রের মানুষ এবং যেভাবে নিজেরা নোংরা চিন্তা ও ধারণা পোষণ করে, সেই ভাবেই আল কোরআনের বাহক মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে মন্তব্য করে; তাই এ প্রসংগে ওদের সম্পর্কে ঘৃণার সাথেই উচ্চারিত হয়েছে, 'ওরা কি বলছে, সে নিজে তৈরী করে- এ কথা বলছে?' আসলে কোনোভাবেই মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে এভাবে কথা বলা ওদের শোভা পায় না, যেহেতু তাদের সামনে দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস বর্তমান রয়েছে। তাঁর জীবনের দীর্ঘ একটি বয়স তাদের মধ্যেই কেটেছে। কোনো লেখাপড়া শেখার সুযোগ তাঁর হয়নি এবং কারও কাছে গিয়ে শেখার মতো অবসরও তাঁর ছিল না, এসব কারণগুলো সামনে রাখলে কোনো সন্দেহ থাকার সুযোগ থাকে না যে, এটা আল্লাহ তায়ালারই কালাম। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বরং এটাই সেই মহাসত্য যা তোমার রব-এর পক্ষ থেকে এসেছে।'

একমত্র সত্য যা চিরন্তন সত্য আল্লাহ পাকের নিকট থেকে নাযিল হয়েছে এবং যা মানুষের প্রকৃতি সংগত এবং যা বিশ্ব প্রকৃতির সাথেও পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যশীল। এ হচ্ছে সেই মহাসত্য যা চিরদিন প্রকৃতির বুকে বিরাজ করছে, যার বহিপ্রকাশ সবখানে ও সবার নযরে প্রতিভাত। এ সত্য ব্যাপারটি সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃংখলার সাথে চিরদিন চলে এসেছে এবং চিরদিন থাকবে। প্রকৃতির বুকে বিরাজমান এ সত্যের বহিপ্রকাশের কোন কিছুর মধ্যে পারস্পরিক কোন দ্বন্দ্ব নেই।

এ মহা সত্য আল কেতাব। এই সত্য কেতাবই গোটা সৃষ্টির বুকে বিরাজমান আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী কেতাব। সর্বত্র বিরাজমান চরম ও পরম সত্যের প্রতিচ্ছবি এ কেতাব। আল কেতাবের চৌহদ্দীতে তা শব্দ-ই ও ভাষা আকারে বিধৃত হয়েছে।

এ হচ্ছে সেই মহাসত্য কেতাব, যা মহান আল্লাহ তায়ালা চূড়ান্ত কেতাব হিসাবে এবং শেষবারের মতো করে পাঠিয়েছেন এবং এই কেতাবের মাধ্যমেই তিনি সেই সব মানুষকে সংঘবদ্ধ মানব গোষ্ঠীতে পরিণত করবেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি পেতে চায়, যারা চায় এ কেতাব থেকে তাদের জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান পেতে, যারা এ পাক কালামের মধ্যে বর্ণিত সকল আইন কানুনকে বাস্তবায়িত করার জন্য বদ্ধপরিকর, যারা তাদের ও অপর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান সংকটসমূহকে এই কেতাবের মাধ্যমেই নিরসন করতে চায় এবং চায় এ কেতাবের মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণভাবে তাদের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা বাড়াতে ও নিজেদের মধ্যে সমঝোতা এবং মেলামেশার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে। প্রকৃতপক্ষে এই কেতাবের মাধ্যমেই পূর্ণ সততা ও সত্যবাদিতা নিয়ে মহাবিশ্বের এ রাজ্যে তারা নিজেদের জন্য এবং অপরের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

এ মহাসত্য কেতাবের বিধানকে যখন বাস্তব জীবনে চালু করা হবে একমাত্র তখনই এর প্রতিটি কথার যথার্থতা মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে এবং অন্তর-প্রাণ দিয়ে এবং পরিপূর্ণ মোহব্বতের সাথে তারা এ কেতাবকে গ্রহণ করতে পারবে। তখন তারা দেখতে পাবে এর প্রতিটি কথাকে বাস্তবায়িত করা কতো সহজ ও কতো সুন্দর। তখন এ কালামের কোনো কথাকেই গ্রহণ করা কারও জন্য কোনো কষ্টকর বলে মনে হবে না; কারণ তখন তারা এর মধ্যে বর্ণিত প্রত্যেকটি কথাকে দেখতে পাবে চিরসত্য, চির বাস্তব এবং চিরসুন্দর।

এ পাক কেতাব এমন সত্য বহন করে এনেছে যা সকল বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে, তাদের মধ্যে বৈষম্য বা মতভেদ দূর করে দেয়, তাদের হৃদয়গুলোকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ

করে এবং যারা এর সংস্পর্শে আসে তাদেরকে এর বিধানসমূহকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর কোনো দেশে যখনই এর বিধানগুলোকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে তখনই দেখা গেছে এর শক্তি কতো মযবুত, কতো অমোঘ এবং কতো অপ্রতিরোধ্য, তখনই মানুষ দেখতে পেয়েছে মানব জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান দানে এ কেতাব কতো বেশী কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। যে কোনো এলাকায় আল কোরআনের বিধানকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছে সেখানকার ঝগড়া-বিবাদ এবং সকল সমস্যাকে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে; সমাধান দিয়েছে এ মহান কেতাব সকল প্রকার দুর্বলতা, বিপদ-আপদ এবং সে সব বিশৃংখলার– যা মানুষের মন মস্তিষ্ককে সাধারণভাবে বিপর্যস্ত করে।

এ কেতাব এমনসব সত্য বহন করে এনেছে যা দুনিয়া ও আখেরাতে কারও ওপর যুলুম করে না, কোন মানুষের মানসিক বা দৈহিক শক্তি ক্ষমতার ওপর অযৌক্তিক কোনো চাপ প্রয়োগ করে না, চিন্তাধারার স্বাধীনতা বিনষ্ট করে না, অথবা দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে তার কার্যকলাপ ও চলাফেরার ওপরও এমন কোনো বাধা সৃষ্টি করে না যার কারণে তার অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশংকা দেখা দিতে পারে অথবা তার উন্নতি বিঘ্নিত হতে পারে। এটা সত্য কথা, যতোদিন আল কোরআনে উপস্থাপিত মহাশক্তির সাথে মানুষ ঐক্যমত পোষণ করতে থাকবে এবং এ পবিত্র কেতাবের নির্দেশমতো জীবনের সকল বিষয়াদিকে পরিচালনা করতে থাকবে ততোদিন তাদের ওপর সকল দিক থেকে শান্তি ও সমৃদ্ধির বারিধারা বর্ষিত হতে থাকবে। এর কারণ জানাতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলছেন,

‘বরং এটাই হচ্ছে সেই একমাত্র সত্য, যা তোমার রব-এর পক্ষ থেকে এসেছে’ ....

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নিজেই জানাচ্ছেন; অবশ্যই এ কেতাব এটা তোমার নিজের পক্ষ থেকে আনা হয়নি, এ কেতাব এসেছে তোমার রব-এর পক্ষ থেকে, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী কথার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়েই এখানে পেছনের কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হলো; এ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি, সেই রসূলের প্রতি যাঁকে ওরা দোষারোপ করছিল যে, তিনি নিজেই এ কেতাব রচনা করেছেন এবং তারা এ তোহমতও তাঁকে দিচ্ছিল যে তিনি রব্বুল আলামীনের সাথে নিকটাত্মীয়তার সম্পর্কের দাবীদার। এ জন্য অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তোহমতের জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর সাথে তাঁর সঠিক ও সম্মানজনক সম্পর্কের কথা জানানো হয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালার কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দান করা হয়েছে এবং তাঁকে দ্বীন ইসলাম দুনিয়ার মানুষের মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার আমানত দিয়ে পাঠানো হয়েছে– ওপরের আয়াতাংশে সেই কথাটাকেই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে,

‘যেন তুমি ভীতি প্রদর্শন কর এমন এক জাতিকে যাদের কাছে তোমার নিকট অতীতে কোনো সতর্ককারী আসেনি, (আশা করা যায় এর ফলে) তারা সঠিক পথ গ্রহণ করবে।’

যে আরববাসীদের নিকট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের নিকট ইতিপূর্বে আর কোনো রসূল প্রেরিত হননি, এমন ইতিহাসও পাওয়া যায় না যে, প্রথম আরববাসীদের দাদা ইসমাঈল (আ.) ও মোহাম্মদ (স.)-এর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে আর কোনো রসূল এসেছেন। তাই, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এই সত্য সঠিক আল কেতাব পাঠালেন, যার মধ্যে এমন সত্য নিহিত রয়েছে যা, মানব-প্রকৃতি ও তাদের অন্তরকে আকর্ষণ করে।

এই হচ্ছে সেই জাতি যাদের নিকট আল্লাহ তায়ালা এই 'আল কেতাব' প্রেরণ করেছেন যাতে করে তাঁর রসূল এই কেতাবের সাহায্যে তাদেরকে সতর্ক করেন। ওরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অনেক অংশীদার খাড়া করে নিয়েছিলো। এ জন্য এই পর্যায়ে এসে আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর গুণাবলীর বর্ণনা প্রদান শুরু হচ্ছে, যেন সেসব গুণাবলীর কথা শুনে তারা পাক-পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌম ক্ষমতার কথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং পার্থক্য করতে পারে সেই মহান সত্ত্বার মধ্যে যাঁর মাঝে 'আল্লাহ' শব্দটির গুণাবলী রয়েছে এবং তাদের মধ্যে যাদের মাঝে সে শব্দটির কোনো গুণই বর্তমান নেই এবং তারা কাউকে কোনভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর সমকক্ষ মনে করে না, আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর মর্যাদার স্তরেও কাউকে তোলে না। তাই এরশাদ হচ্ছে, তিনিই হচ্ছেন সেই আল্লাহ তায়ালা যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন।...........আয়াত ৪-৯

হ্যাঁ, (যাঁর কথা ওপরের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে) তিনিই আল্লাহ এবং পৃথিবীতে চতুর্দিকে আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি তা সবই আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের অনুপম নিদর্শন এবং তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে চলেছে। সৃষ্টিজগতের পাতায় পাতায় বিরাজমান এসব নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে সদা সর্বদা ভাসছে এবং আরও কিছু বিষয় আছে যা আমরা চোখেও দেখি না; যেহেতু আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে সব কিছু দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে সে সব বিষয়ের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি। আমরা জানি না কিভাবে প্রথম মানুষটির সৃষ্টি হয়েছিল, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাঁর সুস্পষ্ট কেতাবের মাধ্যমে সেসব বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সব কিছুকেই সৃষ্টি করেছেন।'

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে বিদ্যমান এ বিশাল সৃষ্টি জগত সবই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর ইচ্ছাতে বাস্তবে এসেছে। এগুলো সম্পর্কে আমরা অতি সামান্যই জানি– বেশীরভাগ কথাই আমরা জানি না। ....,...... কতো আর আমরা গুণতে পারি আল্লাহ পাকের এ সব নিদর্শন, যা মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, সত্যিই আমরা গভীরভাবে যখন এসব কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন আমাদের বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলে, চিন্তা শক্তি জবাব দিয়ে দেয় এবং এসব সৃষ্টি নৈপুণ্য দেখে হয়রান পেরেশান হয়ে আমাদের দৃষ্টি ফিরে আসে, এসব কিছুর মধ্যে বিরাজমান ভারসাম্য এবং অকল্পনীয় শৃংখলা অবলোকনে চমৎকৃত হয়ে যেতে হয়, হ্যাঁ, চিন্তাশীল যে কোন ব্যক্তিই দেখতে পায় যে সামগ্রিকভাবে সকল সৃষ্টির চমৎকারিত্বের মধ্যে, সব কিছুর সম্মিলিত সৌন্দর্যের মধ্যে এবং দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান অভংগুর নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হাযির রয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর সৌন্দর্যের এই পূর্ণাংগতা কোন চর্ম চোখ দেখতে পায় না, কেউ তাঁকে তার চিন্তা ও অনুভূতির গভীর মধ্যে আনতে পারে না, হৃদয় দিয়েও তাঁর চিত্র আঁকা যায় না, যেহেতু অসীমকে সসীমে ধরা সম্ভব নয়, আর যতো দীর্ঘকাল ধরেই তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করা হোক না কেন কোনো চিন্তাবিদ তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করে শেষ করতে পারে না এবং তাঁর জন্য মোহব্বত ও আকর্ষণ অনুভব করে অথবা তাঁর কথা বারবার আলোচনা করে এবং জ্ঞান গবেষণা করেও তাঁর সম্পর্কে সঠিক কোন উপলব্ধি কেউ পেতে পারে না। এ জন্যই তাঁকে জানতে হলে তার বৈচিত্রময় সৃষ্টির দিকে তাকাতে হবে; মানুষ, পশু পাখী কীটপতংগ, রং-বেরং-এর বৃক্ষ-লতা, ফল ও ফুলে ভরা এ

বিশ্বময় বাগিচার দিকে আর তখনই বুঝা যাবে এ সব কিছু হচ্ছে এক রব্বুল আলামীন-এরই অস্তিত্বের নমুনা।

দেখা যাবে যে, সব কিছুই একমাত্র একটি শক্তি-থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং সব কিছুরই উৎসই সেই একই শক্তি-মূলের দিকে নিবদ্ধ– সব কিছু একই ইচ্ছা-কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে এবং সবই একই বিধি-বিধান ও নিয়ম কানুন মেনে চলছে।

বিশ্বজগতের সর্বত্র আল্লাহর সৃষ্টি ও সৌন্দর্য বিরাজমান

আল্লাহ কে? ....তিনি সেই মহান সত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে, আর এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সে সবও তাঁরই সৃষ্টি, তিনিই সত্য ও চিরস্থায়ী, তিনি সকল কমতি থেকে পবিত্র তিনি সকল গুণের আধার।

'তিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তুকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।'

এই ছয় দিন বলতে আমাদের গণনার ছয় দিন নয়। পৃথিবীতে আমাদের সময় পরিমাপ করার জন্য সূর্যের আনাগোনার ওপর ভিত্তি করে এই দিন গণনার রীতি চালু করা হয়েছে, আবর্তিত হয় রাত ও দিন এই ছোট্ট পৃথিবীর বুকে; কিন্তু এই পৃথিবীটাও একদিন ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে এবং ধূলায় পরিণত হয়ে উড়তে থাকবে বিশাল বিশ্বের বুকে; আর সময়ের পরিমাপ করার এই যে ধারা এটা পৃথিবী ও চাঁদ সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই তো শুরু হয়েছে। সময় পরিমাপ করার এই মাপকাঠি দ্বারা, ছোট্ট এই পৃথিবীর বুকে বাস করাকালীন সময়ে আমরা উপকৃত হই!

আল কোরআনে বর্ণিত এই ছয়দিনের প্রকৃত তাৎপর্য কি তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এর অর্থকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া এবং এর পরিমাণ ঠিক করে দেয়ার কোনো সাধ্য আমাদের নেই। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বানানো দিনগুলোর মধ্যে কয়েকটি দিন, যার সম্পর্কে তিনি বলছেন,

'আর তোমার রব-এর কাছে যে সব দিন রয়েছে তার প্রত্যেকটি তোমাদের গণনার দিনের এক হাজার বছরের সমান।'

আল কোরআনে উল্লেখিত ছয়টি দিন হচ্ছে সেই সব দিন, যে অনুসারে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছু চলছে এবং এই ভাবেই এসব কিছু একদিন সব শেষ হয়ে যাবে।............. অথবা সে দিনগুলো দ্বারা সৃষ্টির ছয়টি পর্যায়কে এবং ছয়টি গঠন প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে; অথবা বুঝানো হয়েছে ছয়টি যামানাকে যার একটি এবং অন্যটির মাঝে ব্যবধান যে কতো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না ....তবে সন্দেহ নেই যে সে সময়কালটা দুনিয়ায় বসবাসকারী ধ্বংসশীল মানুষের গোনা সময়কাল থেকে ভিন্ন। সুতরাং এ কথাটাকে আমাদের আল্লাহ তায়ালার নিকট রক্ষিত অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়ের মতোই বুঝতে হবে। অবশ্য উপরোক্ত কথা দ্বারা এ উদ্দেশ্যটি পূরণ করতে চাওয়া হয়েছে যে, মানুষ চূড়ান্তভাবে এ কথাটা মেনে নিক যে দুনিয়া জাহানে যা কিছু ঘটছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার হেকমত ও জ্ঞান অনুযায়ী ঘটছে। আরও জানানো হচ্ছে যে, এ মহাসৃষ্টির বুকে বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অবস্থায় তিনি সৃষ্টি করেছেন, সব কিছুর মধ্যে তিনি অনবদ্য এক সৌন্দর্য দান করেছেন এবং সব কিছুর প্রতিই তাঁর এহসান সুস্পষ্টভাবে বিরাজ করছে।

'এরপর তিনি সমাসীন হয়েছেন তাঁর ক্ষমতায়'-

আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন কথাটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে গোটা সৃষ্টির বুকে সর্বত্র তিনি তাঁর ক্ষমতাকে বিরাজমান করেছেন। 'আরশ' বলতে সত্যিকারে কী বুঝায় তা খুব

নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি না এবং এ শব্দটিকে ঠিক কোন বস্তুর ওপর প্রয়োগ করা হবে তাও আমরা বলতে পারবো না। এরপর 'ইসতাওয়া'-শব্দটিও অনুরূপ একটি জটিল শব্দ। সুতরাং এটাই বুঝতে হবে যে শব্দ দুটি ইংগীতে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার কথাকেই বুঝিয়েছে। এরপর ব্যবহৃত হয়েছে, 'সুম্মা' -এর দ্বারা 'কোন নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর' কিছু বুঝানো হয়েছে বলে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না, কারণ আল্লাহ সোবহানাহুর জন্য সময়ের পরিবর্তন কোনো ব্যাপারই নয়, তিনি সদা-সর্বদা বর্তমান অথবা যখন খেয়াল করা হয় তখনই তাঁর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়, আসলে আমরা সীমিত জ্ঞান বুদ্ধির ও সীমিত বয়সের মানুষ। আমাদেরকে বুঝানোর জন্যই এই পর্যায়ক্রমিক চিন্তার কথা বলা হয়। অতপর বুঝতে হবে যে, ক্ষমতাধর হওয়ার অবস্থা, সৃষ্টি ক্রিয়ার ওপর তার এই গুণ কতো বেশী প্রভাবশালী! এইভাবেই আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার কথা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে যে সত্যটি অনুভূত হয় তা হচ্ছে,

'তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক, বন্ধু এবং শাফায়াতকারী নেই।'

এ শাফায়াতকারী কোথায় হবে এবং কে হবে? তিনি পবিত্র, তিনিই তাঁর সিংহাসনে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর ক্ষমতায় চিরদিন সমাসীন আছেন এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র তিনিই। তিনিই আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, সে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা! সুতরাং তিনি ছাড়া আর কে কোথায় বন্ধু বা অভিভাবক আছে? তাঁর রাজ্যের বাইরে কোথাও কেউ শাফায়াতকারী আছে কি? তাই জিজ্ঞাসা করা কচ্ছে।

'(এসব অবস্থা সামনে রেখে) তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না?'

এই চরম ও পরম সত্যটিই অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করার কথা মনে করিয়ে দেয়, একমাত্র তাঁর দিকেই মনকে ঝুঁকিয়ে তোলে, অন্য কারও প্রতি নয়।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক হওয়ার সাথে সাথে তিনি সবার জীবনের সার্বিক পরিচালক এবং সবার ভাগ্য নির্ধারণকারীও বটে! দুনিয়া ও আখেরাতে কার কি কি হবে সব কিছুই তিনি পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন, যার মধ্যে কেউ কোনো পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং এটা ভালো করেই বুঝতে হবে, আল্লাহ তায়ালার এই বিশাল সাম্রাজ্যের কোনো বিষয়কে তার নিয়মের বাইরে অন্য কেউ যদি পরিচালনা করতে চায়, আসমান যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোনো জিনিসকে যদি কেউ স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় কিংবা তাকে ব্যবহার করতে চায়, সে খবর সর্ব শক্তিমান মালিকের কাছে অবশ্যই পৌঁছে যাবে এবং কেয়ামতের সেই দিনে তার পরিণতি অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে। এই কথাটিই নীচের আয়াতে বলা হয়েছে,

'আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সব কিছুকে তিনিই পরিচালনা করেন, তারপর এখানকার সবার সব কর্মকান্ড তার কাছেই উঠে যায় এমন একটি দিনে যার সময়কাল তোমাদের গণনা মতে হাজার বছরের সমান।'

এ কথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চাইছেন যে তাঁর ব্যবস্থাপনা সর্বত্র এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যা একটু খেয়াল করলেই নযরে পড়ে; 'আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত' তাঁর কুদরতী হাত সক্রিয় রয়েছে যেন মানুষ তার অনুভূতি ও চিন্তা শক্তি দ্বারা তা হৃদয়ংগম করে এবং আবেগাপ্লুত মনে তাঁর সামনে অবনত হয়; প্রকৃত অর্থে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার ক্ষেত্র

শুধু আসমান থেকে যমীন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আরও বহু প্রশস্ত পরিমন্ডল নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে, যার কল্পনা করাও মানব শক্তির বাইরে। আজ জ্যোতির্বিদরা ধ্যান ধারণা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো সত্তেও উর্ধাকাশের কোনো এক সীমা পর্যন্ত গিয়ে তারা দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে। তাদের বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলছে এবং নিজেদের অজান্তেই বলে উঠছে, না মানুষ নিজেদের বুদ্ধি ও গবেষণা বলে সৃষ্টি রহস্যের সব কিছু বুঝতে সক্ষম নয়।

তারপর আসবে এমন একদিন, যখন বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা রব্বুল আলামীন-এর সাজানো গোছানো এই বাগান এবং যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সবকিছুই লন্ডভন্ড হয়ে যাবে, সকল কার্যকারণ ও তার প্রতিক্রিয়া প্রাপ্তির প্রচলিত এসব নিয়ম পদ্ধতি শেষ হয়ে যাবে এবং সকল কিছুই শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে, সব কিছুকেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর কাছে তুলে নেয়া হবে, সেই দিনে যা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে, যাতে করে সেখানে সকলের কাজ কথা ও ব্যবহার পেশ হতে পারে, সকল বিষয় ও প্রাণীকে (হিসাবযোগ্য-মানুষ জ্বিন জাতিকে)

'হাযির করা যেতে পারে এমন এক দীর্ঘ দিনে যার সময়কাল তোমাদের হিসাবের হাজার বছর।'

এ কঠিন দিনের হিসাব থেকে কোনো কথা, কাজ বা ব্যবহার কিছুই বাদ পড়বে না, কোনো কিছুই অপ্রয়োজনীয় বোধ হবে না– সেদিন কোনো সৃষ্টিই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে না। আজ যা কিছু আমাদের দৃষ্টি সমক্ষে বিরাজ করছে, সকল কাজ, প্রচেষ্টা, ব্যবস্থাপনা, নিয়মকানুন, সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাতেই সম্পাদিত হচ্ছে এবং অবশেষে সব কিছুই গুটিয়ে তাঁর কাছেই ফিরে যাবে, সব কিছুকে তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর হুকুমে যখন তিনি চাইবেন তখন তুলে নেয়া হবে।

'তিনিই সেই গায়ব ও হাযির জানেন, তিনি মহাশক্তিমান মেহেরবান।'

অর্থাৎ, তিনিই সেই পাক পরওয়ারদেগার যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। নিজ ক্ষমতায়, তিনিই এককভাবে চির প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, হ্যাঁ, পুরোপুরি এককভাবেই আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কিছুকে তিনি পরিচালনা করছেন। তিনিই উপস্থিত অনুপস্থিত, সব কিছুর জাননেওয়ালা' ... যা সামনে আছে এবং যা রয়েছে দৃষ্টির অন্তরালে– সবই তার সামনে সদা সর্বদা হাযির, তাঁর অজানা কোনো কিছুই নেই এবং তাঁর অজান্তে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক, তিনিই সব কিছুর পরিচালক .... 'আর তিনিই সর্বশক্তিমান মেহেরবান' অর্থাৎ, এতোই শক্তি-ক্ষমতার মালিক তিনি, যিনি যা চান তা-ই করতে সক্ষম, সাথে সাথে তাঁর ইচ্ছায় এবং গোটা সৃষ্টি জগতের সব কিছুকে পরিচালনায় তিনি দয়াবান, তাঁর দয়া সব কিছুর ওপর পরিদৃশ্যমান। তাঁর যে পরিচয়টি এখানে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা হচ্ছে,

'যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা বড় সুন্দর করেই সৃষ্টি করেছেন।'

সোবহানাল্লাহ! তিনি সেই মহাসত্য যাকে গোটা বিশ্ব প্রকৃতি প্রতি নিয়ত দেখছে, দেখছে প্রতিটি দিল এ মহাশক্তিকে সকল বস্তুর চেহারা ছবির মধ্যে। এসব কিছুর মাঝে তিনি এমনভাবে ফুটে রয়েছেন যা একটু খেয়াল করে তাকালেই দেখা যায়, তাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, তাদের পৃথক পৃথক স্বভাব প্রকৃতির মধ্য দিয়ে দেখা যায় আবার তাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যপূর্ণ মিল রয়েছে– তার মধ্য দিয়েও তা দেখা যায়, দেখা যায় তাদের আকৃতি-প্রকৃতি, তাদের বিভিন্ন অবস্থা, তাদের যোগ্যতা এবং তাদের প্রতিটি নড়াচড়ার মধ্য

দিয়েও। আরও দেখা যায় সব কিছুর মধ্যে যে মন মাতানো সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে রয়েছে তার মধ্যে এবং সবার মধ্যে এহসান করার যে একটি বিশেষ দিক রয়েছে তার মাধ্যমেও তা দেখা যায়।

হৃদয়ের চোখ দিয়ে সৃষ্টিকূলের এই বিশেষ গুণের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, আপনি দেখতে পাবেন হিংস্র থেকে হিংস্র প্রাণীর মধ্যেও কোনো না কোনোভাবে কারও প্রতি এহসান করার, যে কোনোভাবে কারও উপকার করার এক সুপ্ত বাসনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, মাঝে মাঝে তার বহিপ্রকাশ যখন ঘটে তখন আমরা এই সেরা সৃষ্টি হওয়ার দাবীদারেরাও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। কখনও দেখা যায়, পড়ে থাকা মানব শিশুকে হিংস্র মানব খেকো বাঘ দুধ খাওয়ায়। কখনও দেখা যায় কোন কুকুর অসহায় মা হারা বিড়াল বাচ্চাকে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ে এসে দুধ খাইয়ে যায়। এই ভাবে নিকট ও দূরের বহু ঘটনাবলী এই এহসানের স্বাক্ষর বহন করে।

হে আমার আল্লাহ, তুমি মহান, মহা পবিত্র তোমার শান! সব কিছুর মধ্যে তোমার এই শিল্পশৈলী অহরহ বিরাজমান। তোমার মহা স্নেহময় হাতের মধুর পরশ প্রসারিত হয়ে রয়েছে সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যে, সব কিছুতেই ভাস্কর হয়ে রয়েছে তোমার মহামূল্যবান এহসান! কতো দয়াময় তুমি, কিভাবে বুঝবে তোমায় এ ভোগবাদী মানব সন্তান! একটু খেয়াল করলেই কি বুঝা যায় না? সব কিছুর মধ্যেই বিস্ময়করভাবে পূর্ণতা বিরাজমান! হাঁ, হাঁ, এ সব কিছুই তো আমার আল্লাহ পাকের মহাদান! সৃষ্টিকূলের এই সৌন্দর্য এই এহসান কেউ তুলে নিতে পারে না, নিতে পারেনি কোনো দিন, কেউ এর মধ্যে কোনোদিনই কমতি আনতে পারেনি। কোনো কিছুকে এক নির্দিষ্ট সীমার ওপর ইচ্ছামত বাড়াতেও পারেনি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেখানে যা দিয়েছেন তার থেকে, আকৃতি প্রকৃতি, সৌন্দর্য-শিল্পনৈপুণ্য অথবা আয় রোজগারের যোগ্যতা-কোনটাকেই মাত্রাতিরিক্ত বাড়ানো বা মাত্রা থেকে কমানো, এর কোনোটাই কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সব কিছুই রয়েছে পূর্ব নির্ধারিত। আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা তাঁর সৌন্দর্যের মাপকাঠি দ্বারা সব কিছুকে যে অবস্থা দিয়েছেন তার মধ্যে কোনো কিছুকে বাড়িয়ে দেয়া বা কোন কিছুকে কমিয়ে দেয়া- কোনটাই কারও দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি যার জন্য যে মেয়াদ দিয়েছেন সে মেয়াদ ফুরানোর পূর্বে অথবা পরে তার কোন ক্ষয় বা লয় নেই। তার নির্দিষ্ট সীমানা পার হতেও কেউ পারবে না বা মাত্রার নীচেও থাকতে পারে না। যমীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দু থেকে আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা বড় নক্ষত্র বরং একটি সাধারণ কোষ বা মৌচাক থেকে নিয়ে সব থেকে কঠিন বিষয় বা বস্তু পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এহসান ও কল্যাণকামিতার বোধ তিনি দিয়ে দিয়েছেন। এই ভাবে সকল কাজ, ব্যবহার গতিবিধি, ঘটনাবলী সব কিছুর মধ্যেই তিনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য দিয়েছেন, এ সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি হওয়ারই বৈশিষ্ট। সব কিছুকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই পয়দা করেছেন। সে সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার জন্য সব কিছুকে অতি সূক্ষ্ম এক ব্যবস্থা দিয়েছেন, যার অধীনে তারা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের এই চলতে থাকা চিরদিন আল্লাহ পাকের তদ্বীরের অধীনে সম্পন্ন হতে থাকবে।

প্রত্যেকটি জিনিস ও প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে, বিশ্বজগতের মধ্যে সব কিছুর সাথে তাল রেখে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করার জন্য পয়দা করা হয়েছে। এই ভূমিকা পালন করার জন্য সবার সাথে সহযোগিতার যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা এতোই সূক্ষ্ম যে, তা বুঝতে হলে চোখ খুলে তাকাতে হবে এবং আল কোরআনের নির্দেশনাকে সামনে রেখে গবেষণা চালাতে হবে, তবেই দেখা যাবে গোটা বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিরাজ করছে এবং কোন কিছুর প্রাপ্তি,

অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া সম্ভব নয়। দেখুন অনেকগুলো পায়ের ওপর সন্তরণরত গুটি পোকার দিকে, কেমন করে সে এক একবিন্দু লালা মুখে নিয়ে ঘুরে ঘুরে কী চমৎকার মসৃণ ও নরম সূতা তৈরী করে, যার থেকে অতি সুন্দর মনোরম বস্ত্র তৈরী হয় যা সৌন্দর্যের বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধের সময় বর্ম হিসাবেও পরিধান করা হয়। অতি মসৃণ হওয়ার কারণে তার ওপর তরবারির আঘাত কার্যকর হয় না। তারপর পর্যায়ক্রমে তাকান বিচিত্র বৈশিষ্ট সম্বলিত পানিতে সন্তরণরত রকম-বেরকমের মাছের দিকে, তাকান উর্ধাকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীকূলের দিকে, তাকান বুকে হাঁটা কীট পতংগের দিকে, তাকান জীব-জানোয়ারের দিকে এবং পরিশেষে তাকান এই মানুষের দিকে! এর সাথে আরও তাকিয়ে দেখুন মহাকাশের বুকে সন্তরণরত গ্রহ-নক্ষত্র ও উপগ্রহসমূহের দিকে, সে ধ্রুব তারাটির দিকে, যাকে স্থির বলে মনে হয়, আবার নযর মেলে চেয়ে দেখুন, সামগ্রিকভাবে এই মহাবিশ্বের দিকে, দেখতে পাবেন, অবিরামভাবে এক নির্দিষ্ট গতিতে সব কিছুর সাথে তাল রেখে এবং নিজ নিজ কক্ষপথে আবহমানকাল ধরে প্রতিটি জিনিস কি সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি জিনিস, হ্যাঁ প্রতিটি জিনিসই পুরোপুরি শৃংখলার সাথে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে। দৃষ্টি প্রসারিত করে যে দিকেই তাকানো হোক না কেন, দেখা যাবে আল্লাহ তায়ালার এ মহা কারখানার সর্বত্র এক প্রকার নিয়ম শৃংখলা বিরাজমান। বড়ই চমৎকার এ শৃংখলা– এ সব কিছুর মধ্য থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর এহসান ও এক অনুপম পরিপূর্ণতা!

ডারউইনের বিবর্তনবাদ বনাম কোরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব

এই নিখিল জাহানের সর্বত্র যে অনুপম সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে তা হৃদয়াবেগে প্রচন্ড দোলা লাগে, তখন বিশ্ব রাজ্যের প্রতিটি অংশ ও প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ সৌন্দর্য সে দেখে, আরও দেখে যে এসব কিছুর প্রত্যেকটিই সদা-সর্বদা অপরের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ সময় আল্লাহর সৃষ্টির যে দিকেই সে তাকাক না কেন এবং যে দিকেই তার হৃদয়-মন ঝুঁকে পড়ুক না কেন, আর সব কিছু নিয়ে যতো চিন্তাই সে করুক না কেন, সকল দিকেই সে শুধু সুন্দরেরই মেলা দেখতে পায়, তখন সে অন্তর প্রাণ দিয়ে দেখতে পায় যে, মহাকুশলী আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর মধ্যে মুঠি মুঠি সৌন্দর্য ছড়িয়ে রেখেছেন, রেখেছেন পারস্পরিক অবর্ণনীয় এক সম্পর্ক, এক অভিনব ভারসাম্য ও পরিপূর্ণতা, সকল দিক থেকে আল্লাহ তায়ালার রহমত সুমিষ্ট ফলমূল আকারে প্রতিনিয়ত বর্ষিত হয়, যা মানুষের অন্তরকে আনন্দে ভরে দেয়। সে এবং তার মন আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর এই পরিপূর্ণ সুন্দর সাজানো বাগানে ভ্রমণ করে ধন্য হয়। পৃথিবী নামক এই গ্রহের ওপর চলাফেরার সময় যা কিছু মানুষ দেখে, শোনে এবং অনুভব করে, সব কিছুর মধ্য দিয়ে সে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীরই ঝলক দেখতে পায়। এসব কিছু এ বিশ্বের বাইরে বর্তমান রহস্যরাজির সাথে এই ক্ষণস্থায়ী বিশ্বের নিবিড় সম্পর্কের কথা ঘোষণা করে এবং অস্থায়ী এ বিশ্বের সৌন্দর্যকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার স্থায়ী সৌন্দর্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়।

কিন্তু বড়ই আফসোস, এই পৃথিবীতে সুস্থ সবল শরীরে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকে ততদিন আল্লাহ তায়ালার এসব নেয়ামত সে অনুভব করে না। একমাত্র তখনই বুঝতে পারে যখন সে গাফলতির ঘুম থেকে হঠাৎ করে জেগে ওঠে, তখন পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্কে ভাটা পড়তে থাকে, যখন তার চতুর্দিকে নানা অকল্পনীয় ঘটনা সংঘটিত হতে দেখে এবং যখন সে এসব কিছু নিজে থেকে বুঝতে চায়; যখন তার সামনে আল্লাহ তায়ালার আলোকবর্তিকাসমূহ জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে, যখন সে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া আলোতে সব কিছুর মধ্যে স্বয়ং মহান

আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের নিদর্শনকেই দেখতে পায়, সেই মুহূর্তেই সে তাঁকে দেখে যখন তাঁকে বাহ্যিক চোখ ও হৃদয়ের চোখ দ্বারা দেখতে পাওয়া যায় না, তখনই সে মহান সৃষ্টিকর্তাকে এবং তাঁর মহা আশ্চর্যজনক সৃষ্টিকে দেখতে পায় তখনই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে যায় এবং সে সময় যা কিছু সে দেখে তার মধ্যে তার সকল সৌন্দর্যের মধ্যে তার চেতনার মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকেই খুজে পায়, এসব কিছুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকা আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা ও ক্ষমতাকে সে গভীরভাবে অনুভব করে।

তবে প্রসংগত এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, ডারউইনের ক্রমবিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। এই মতবাদে ডারউইন বলেছেন যে, একই জীবকোষ থেকে বিভিন্ন প্রাণীর জন্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে মানুষের উদ্ভব ঘটে এবং বহুসংখ্যক জন্ম ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক স্তর অতিক্রম করার পরও মানুষের মূল রূপটা উৎকৃষ্টতর বানরের ওপরে ও মানুষের নীচে থাকে। এই মতবাদের এই অংশটা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা প্রজাতিক উত্তরণের উপাদানগুলো এক জাতের প্রাণীর ভিন্ন আর এক জাতের প্রাণীতে রূপান্তর অসম্ভব করে তোলে। অথচ এ সত্যটা ডারউইনের জানা ছিলো না। প্রত্যেক জাতের প্রাণীর জীবকোষে প্রজাতিক রূপান্তরের বা উত্তরণের যেসব উপাদান সুপ্ত থাকে, তা সেই প্রজাতির বৈশিষ্টগুলোকে সংরক্ষণ করে, যে প্রজাতিতে সে জন্ম গ্রহণ করেছে, সেই প্রজাতির আওতাভুক্ত থাকতে তাকে বাধ্য করে এবং সেই প্রজাতি থেকে বের হতে ও তাকে নতুন কোন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে দেয় না। তাই বিড়াল বিড়াল হয়েই জন্মেছে এবং আজীবন সে বিড়ালই থাকবে। কুকুরও তদ্রূপ। ষাড়, ঘোড়া বানর ও মানুষের অবস্থাও তথৈবচ। প্রজাতিক রূপান্তরের মতবাদের আলোকে বড়জোর এতটুকু হতে পারে যে, একই প্রজাতির আওতার ভেতরে থেকেই কিছুটা বৈচিত্রপূর্ণ রূপান্তর ঘটতে পারে। সেটা কোনমতেই ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়া নয়। এ আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রধান অংশটা ভ্রান্ত ও বাতিল। অথচ একশ্রেণীর প্রতারিত মানুষ বিজ্ঞানের নামে এটাকে অভ্রান্ত এবং কোনোকালেও এটাকে খন্ডন করা যাবে না বলে মনে করে। ('আল ইলমু ইয়াদ্উ ইলাল ঈমান' (বিজ্ঞান ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে) নামক গ্রন্থ পৃঃ ৫০ ও ১৯শ পারা দ্রষ্টব্য) এবার যিলালীল কোরআনের মূল আলোচনায় ফিরে আসি।(১)

'অতপর তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।' (আয়াত ৮)

অর্থাৎ বীর্যের পানি থেকে, যা মানুষের ভ্রুণ উৎপাদনের প্রথম স্তর। বীর্য থেকে জমাট রক্ত, তা থেকে গোশতের টুকরো, তা থেকে হাড়গোড় এবং অবশেষে পূর্ণাংগ মানব সন্তান। এতোসব রূপান্তর ঘটে এই নির্যাসের ভেতরেই, যার উদ্ভব ঘটে নগণ্য পানি থেকে। নগণ্য পানির সেই বিলীন হয়ে যাওয়া বিন্দুটা পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের যে ধারাবাহিকতার সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলে, তার দিকে দৃষ্টি দিলে এটা একটা বিস্ময়কর সফর বলে প্রতীয়মান হয়। বীর্য বিন্দুটা এই সফর শেষ করেই পরিণত হয় নযীরবিহীন সৃষ্টি মানুষে। এ সফরে প্রথম পর্যায় ও শেষ পর্যায়ের মাঝে দীর্ঘ পথ তাকে পাড়ি দিতে হয়। এই দীর্ঘ সফরের চিত্র কোরআনের পরবর্তী একটা আয়াতেই ফুটে উঠেছে,

---

(১) চার্লস ডারউইন বিজ্ঞানের নামে যে গাজাখুরি মতবাদটি চালু করেছেন তার বিরুদ্ধে জীব বিজ্ঞানীরা এতো বেশী যুক্তি প্রমাণ খাড়া করেছেন যে, আজ ডারউইনের এই 'বানরতন্ত্র' তার স্মৃতি বিজড়িত বাসভবন ইংল্যান্ডের কেন্টেও মনে হয় নিরাপদ নয়। আমি নিশ্চিত যে, ডারউইন বেঁচে থাকলে নিজের উদ্ভাবিত তন্ত্রে এই অসংখ্য স্ব-বিরোধীতা দেখে নিজেই আ'তকে উঠতেন এবং নিজে বানর সিম্পাঞ্জীর উত্তরাধীকার না হয়ে একজন 'মানুষে'র সন্তান হিসেবে বেঁচে থাকাকেই তিনি বেশী পছন্দ করতেন।—সম্পাদক

'অতপর তাকে তিনি সুঠাম রূপ দান করলেন, তাতে নিজের পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিলেন, আর তোমাদেরকে দান করলেন কান, চোখ ও অন্তকরণ।' ....(আয়াত-৯)

সোবহানাল্লাহ! কী বিস্ময়কর সফর। কতো দীর্ঘ পথ! কী চমকপ্রদ অলৌকিক ঘটনা যা দেখেও লোকেরা উদাসীন থাকে! এই অলৌকিক ঘটনা সংঘটনের পেছনে যদি মহান আল্লাহর হাত সক্রিয় না থাকতো, তাহলে অমন নগণ্য এক ফোঁটা পানি কি করে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারতো? তিনিই তো সেই ক্ষুদ্র ও দুর্বল বিন্দুটাকে তার সরল ও নগণ্য আকৃতি থেকে মানুষের ন্যায় জটিল, বহুমুখী ও বিস্ময়কর সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হওয়ার পথে চালিত করেন।

একটা মাত্র জীবকোষে এতো বিভিন্নতা, এত বহুমুখিতা, বিভিন্ন স্বভাব ও বিভিন্ন কাজের ক্ষমতা সম্পন্ন এতো রকমারী কোষপুঞ্জ-যার প্রত্যেকটা কোষপুঞ্জ একটা বিশেষ কাজ সম্পাদনকারী বিশেষ অংগ গড়ে তোলার দায়িত্ব সম্পন্ন এবং বিশেষ ধরনের নির্দিষ্টসংখ্যক জীবকোষ দ্বারা নির্মিত এই অংগ-যা বিশেষ বিশেষ গুণাবলী ও ভূমিকার অধিকারী। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং যেগুলো একই অংগের অভ্যন্তরে অধিকতর বৈশিষ্টমন্ডিত বহুসংখ্যক কোষ সমন্বয়ে গঠিত, এতসব বিভিন্নতা, বহুমুখিতা ও বৈচিত্র-সেই প্রথম কোষটি একাকী কিভাবে ধারণ করলো? সেই একটিমাত্র কোষ থেকে উদ্ভুত বিশেষ ধরনের কোষগুলোতে পরবর্তীকালে যে সমস্ত বৈশিষ্ট প্রকাশ পায়, তা আগে কোথায় ছিলো? যাবতীয় মানবীয় ভ্রুণের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ মানবীয় ভ্রুণের বৈশিষ্টগুলো কোথায় লুকিয়ে ছিল? আর এই ভ্রণে পরবর্তীকালে যেসব বিশেষ ধরনের যোগ্যতা, প্রতিভা নির্দিষ্ট ভূমিকা ও বৈশিষ্টসমূহ পরিলক্ষিত হয় তাই বা কোথায় লুকিয়ে ছিলো?

আর এই বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা বাস্তবে সংঘটিত ও বারবার সংঘটিত না হলে কেই বা কল্পনা করতে পারতো যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে?

আসলে এর পেছনে রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সুনিপুণ হাত। তিনিই মানুষকে এভাবে সুগঠিত করেছেন। তিনি এই প্রাণীর দেহে নিজের পক্ষ থেকে যে রূহ বা আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন, সেটাই এর মূল রহস্য। এই যে বিস্ময়কর ঘটনা প্রতিমুহূর্তে বারবার ঘটে চলেছে অথচ লোকেরা তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করছে না, এর একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এটাই। তাছাড়া মহান আল্লাহর রূহ ফুঁকে দেয়ার কারণেই মানুষ চোখ কান ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন এমন এক প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়, যা তাকে অন্য সকল প্রাণী থেকে বিশিষ্ট করে তোলে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ হৃদয় সৃষ্টি করেছেন।' বস্তুত এই ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে এই বিস্ময়কর ঘটনার রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের এই সর্বাত্মক সয়লাব সত্তেও মানুষ খুব কমই শোকর আদায় করে থাকে। তুচ্ছ পানি থেকে এমন মর্যাদাবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, একটা অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল কোষের ভেতরে বিকাশ ও বৃদ্ধির উন্নয়ন ও উৎকর্ষের এবং প্রাচুর্য ও বিশিষ্টতার এতো বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনার ভান্ডার পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন এবং তার ভেতরে সেই সব উচ্চাংগের গুণ বৈশিষ্ট, যোগ্যতা-প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা সমবেত করে রেখেছেন-যা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত করেছে। অথচ এসবের জন্য মানুষকে খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখা যায়। এ জন্যই আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে,

'তোমরা খুব কমই শোকর করে থাকো।'

পৃথিবীতে মানুষের এই প্রথম বিস্ময়কর ও অলৌকিক জন্ম যদিও প্রতিনিয়তই ও সবার জ্ঞাতসারেই ঘটে চলেছে, তথাপি মোশরেকরা পরকালের পুনর্জন্মে সংশয় প্রকাশ করে ও আপত্তি

তোলে। তাদের এই সংশয় ও আপত্তি বিস্ময়কর বৈকি? আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা বলে, আমরা যখন পৃথিবীর মাটিতে হারিয়ে যাবো, তখন আবার কি আমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? আসলে তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের কথা অবিশ্বাস করে।'

অর্থাৎ তাদের মরে যাওয়া, দাফন হয়ে যাওয়া তাদের দেহ পচে গলে মাটিতে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং মাটির কণাগুলোর সাথে মিশে উধাও হয়ে যাওয়ার পরও যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারেন-এটা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়। অথচ প্রথমবার যে পৃথিবীতে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, সেই সৃষ্টির তুলনায় আখেরাতের এই দ্বিতীয়বার সৃষ্টিতে অবাক হবার মতো কী আছে? আল্লাহ তায়ালা তো তাদেরকে এই পৃথিবীর মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছেন, যার সম্পর্কে তারা বলে থাকে যে, ওর ভেতরে তাদের দেহ পঁচে গলে মিশে যাবে ও বিলীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি তো প্রথমবারের সৃষ্টির মতোই বরং তার চেয়েও সহজ।

এতে অবাক হবার মত কিছু নেই, নতুনত্বও কিছু নেই।

'আসলে তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টাই অবিশ্বাস করে।'

এ জন্যই তারা এসব কথাবার্তা বলে থাকে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টা অবিশ্বাস করার কারণেই তাদের এমন একটা স্পষ্ট ব্যাপারে সন্দেহ জন্মে গেছে, যা একবার ঘটে গেছে এবং তার কাছাকাছি জিনিস প্রতি মুহূর্তেই ঘটে চলেছে।

এ কারণেই পরবর্তী আয়াতে তাদের মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ করে তাদের আপত্তির নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। তাদের প্রথম জন্মের ভেতর দিয়ে এর যে জ্যান্ত ও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং আর কোনো কিছু বাড়িয়ে বলার দরকার মনে করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বলো, সেই মৃত্যুর ফেরেশতাই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে, যাকে তোমাদের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর তোমরা আবারো তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে।'

এভাবে একটা সুনিশ্চিত খবরের আকারে কথাটা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর ফেরেশতা কে এবং কিভাবে তিনি মৃত্যু ঘটান? এটা আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য ও গুপ্ত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যার সংবাদ আমরা কোরআনের এই নিশ্চিত ও অকাট্য সূত্র থেকে পাই। এই একমাত্র সূত্র থেকে আমরা যে তথ্য পাই, তার সাথে আর কোন তথ্য সংযোজন করার অধিকার আমাদের নেই।

কেয়ামতের ময়দানে পাপিষ্ঠদের চিত্র

আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্জন্ম লাভের ব্যাপারে তারা যে সন্দেহ পোষণ করে, সেই সন্দেহ অপনোদনের লক্ষ্যে কেয়ামতের এমন একটা দৃশ্য তাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, যা এক একটা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দৃশ্য, যা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, প্রেরণা ও সংলাপে ভরপুর।

'যদি তুমি দেখতে অপরাধীরা যখন মাথা নীচু করে থাকবে এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা এখন সব কিছু দেখলাম ও শুনলাম, অতএব আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফেরত পাঠাও, সৎকাজ করবো ....' (আয়াত ১২, ১৩ ও ১৪)

১২ নং আয়াতে যে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, তা লাঞ্ছনা, অপমান, গুনাহের স্বীকারোক্তি, প্রত্যাখ্যাত সত্যকে মেনে নেয়া, যে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যয় ঘোষণা করা এবং অপমান ও লাঞ্ছনার ভারে মাথা নোয়ানো অবস্থায় দুনিয়ার জীবনে যে ভুল করে আসা হয়েছে তা শোধরানোর জন্য পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রার্থনার

দৃশ্য। কিন্তু এসব কিছুই হবে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পরে, যখন কোনো স্বীকারোক্তি ও ঘোষণায় কোনো লাভ হবে না।

অবিশ্বাসীদের এই অবমাননাকর প্রার্থনার জবাব দেয়ার আগে ১৩ নং আয়াতে সেই প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরা হয়েছে, যা এ সম্পর্কে নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে এবং যা মানব জাতির জীবনে ও ভাগ্য নির্ধারণেও চূড়ান্ত অবদান রাখে। মহান আল্লাহ বলেন,

'আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করতাম ....'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে সকল মানুষের জন্য একই পথ-সততা ও ন্যায়ের পথ তৈরী করে দিতেন। যেমন করে দিয়েছেন মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব জন্তুর জন্য, যারা জন্মগতভাবেই প্রচ্ছন্ন ঐশী নির্দেশ মোতাবেক চলে, অথবা ফেরেশতাদের জন্য, যারা হুকুম পালন করা ছাড়া আর কিছু জানে না। আসলে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তই ছিলো যে, তার স্বভাব প্রকৃতি হবে স্বতন্ত্র ধরনের। সে সুপথেও চলতে পারবে, কুপথেও চলতে পারবে। সে স্বাধীনভাবে সুপথ বা কুপথ বেছে নেবে এবং এ বিশ্বের সে এই বিশেষ ধরনের স্বভাব প্রকৃতির ভিত্তিতেই নিজস্ব ভূমিকা পালন করবে। কেননা এ বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহ তায়ালার যে মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা সক্রিয় ছিলো, তারই ভিত্তিতে তিনি মানুষকে এই বিশেষ ধরনের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। এ জন্যই তিনি তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এভাবে যে, যে সব জ্বিন ও মানুষ গোমরাহী ও অসৎ পথ বেছে নেবে এবং জাহান্নামের পথে চলবে, তাদেরকে দিয়ে জাহান্নামকে পূর্ণ করবেন।

এরাই সেই সব অপরাধী, যারা কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়াবে এবং যাদের ওপর জাহান্নামের ফায়সালা প্রযোজ্য হবে। এ জন্য তাদেরকে বলা হবে,

'অতএব, যেহেতু তোমরা আজকের এই দিনের সম্মুখীন হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। তাই স্বাদ গ্রহণ কর।'

অর্থাৎ সময় থাকতে এই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করার কারণে ভোগ কর। 'আমি তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি।'

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কাউকে ভুলে যান না। তবে অবহেলিত ও বিস্মৃত মানুষের ন্যায় আচরণ করেন। সে আচরণে রয়েছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অবজ্ঞা-অবহেলা ও গ্লানী।

'এবং তোমাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ চিরস্থায়ী আযাব ভোগ কর।'

এখানে এসেই কেয়ামতের দৃশ্যটার ওপর যবনিকাপাত হচ্ছে। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অপরাধীদেরকে গ্লানীকর পরিণতি ভোগ করার জন্য রেখে দেয়া হয়েছে। কোরআনের পাঠক এ আয়াত কটা পড়ার পর অনুভব করে যেন সে কাফেরদের এই অবস্থায় রেখে যাচ্ছে। আর তারা যেন সেই অবস্থায় ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী এ ধরনের জ্বলজ্যান্ত দৃশ্য তুলে ধরা কোরআনের অন্যতম শিল্পগত বৈশিষ্ট।

মোমেনদের সফলতা ও পাপিষ্ঠদের পরিণতি

উপরোক্ত দৃশ্যটার ওপর এখন যবনিকাপাত ঘটছে অপর এক পরিবেশে অপর এক দৃশ্য তুলে ধরার জন্য। সে দৃশ্যটা অন্তরাত্মাকে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করে এবং হৃদয়ে প্রেরণার সৃষ্টি করে। এটা মোমেনদের দৃশ্য। তারা একাগ্রচিত্তে যে এবাদাত ও দোয়া করে তার দৃশ্য। আল্লাহ তায়ালার ভয় ও তাঁর অনুগ্রহের আশা পোষণের দৃশ্য। তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে পুরস্কার সঞ্চিত করে রেখেছেন তা অকল্পনীয়। মহান আল্লাহ বলেন,

'আমার আয়াতগুলোতে কেবল তারাই বিশ্বাস রাখে, যাদেরকে আয়াতগুলো স্মরণ করিয়ে দিলেই সেজদায় পতিত হয় ....(আয়াত ১৫ ১৬ ও ১৭)

এ আয়াত কটাতে মোমেন বান্দাদের যে ছবি চিত্রিত করা হয়েছে তা খুবই আলোকোজ্জ্বল ছবি। এ ছবি স্বচ্ছ, তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন, আল্লাহর ভয়ে কম্পিত, আল্লাহর করুণা লাভের আশায় আশান্বিত, তাঁর অনুগত ও বিনয়ী বান্দাদের ছবি। এ সব বান্দাই আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস রাখে। জাগ্রত হৃদয়, প্রদীপ্ত বিবেক ও উদ্দীপিত অনুভূতি নিয়ে তারা আল্লাহ তায়ালার বাণীকে গ্রহণ করে।

'তাদেরকে যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াত বা নিদর্শনাবলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন তারা সেজদায় পড়ে যায়।'

স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপই তারা সেজদায় পড়ে। মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তাগিদেও তারা সেজদা করে। কেননা তার নিদর্শনাবলীর স্মৃতি জাগরুক হওয়ার কারণেই এই সেজদার প্রেরণা আসে।

তারা অনুভব করে যে আল্লাহ তায়ালার মহত্ব ও মহিমার যথার্থ কদর একমাত্র সেজদা দিয়েই করা সম্ভব। মাটির সাথে কপাল ঘষা ছাড়া এ অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না।

'আর তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করে।'

অর্থাৎ শরীর দ্বারা সেজদা ও জিহ্বা দ্বারা প্রশংসা ও তাসবীহ এক সাথেই বলে। 'এবং তারা অহংকার করে না।' কেনন এ সেজদা হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আল্লাহর মহিমার সামনে একান্ত অনুগত বান্দার আকুতি।

এরপর আবার তুলে ধরা হচ্ছে একই সাথে তাদের শারীরিক তৎপরতা ও মানসিক আবেগ অনুভূতির চিত্র,

'ভয়ে ও আশায় আল্লাহ তায়ালাকে ডাকার সাথে সাথে তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায়।'

মোমেন বান্দারা রাতের বেলায় এশা ও বেতেরের নামায তো পড়েই। তদুপরি শেষ রাতেও তাহাজ্জুদের নামায পড়ে ও দোয়া করে। কিন্তু কোরআনের বর্ণনাভংগীটা এই নামায ও দোয়াকে ভিন্নভাবে চিত্রিত করে। এতে দেখানো হয়েছে যে, রাতের বিছানাগুলো যেন তাদের পিঠগুলোকে শোয়া, আরাম করা ও মজা করে ঘুমানোর জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকে, কিন্তু তাদের পিঠ সে ডাকে সাড়া দেয় না, বরং সেই লোভনীয় বিছানাগুলোর আহ্বানকে প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা সাধনা করে। কেননা তারা নরম বিছানা ও মজাদার ঘুমের প্রতি আগ্রহী নয়। তারা আগ্রহী তাদের প্রতিপালকের সামনে হাযিরা দিতে এবং আযাব, গযব ও নাফরমানীর ভয় ও তার দয়া, সন্তুষ্টি ও সৎকাজের প্রেরণা লাভের আশায় তাঁর কাছে ধর্ণা দিতে। 'তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় ও আশার সাথে ডাকে', এই ক্ষুদ্র বাক্যটার ভেতর দিয়ে অন্তরে একই সাথে এই শিহরিত অনুভূতিগুলোর অনুরণন চিত্রিত করা হয়। আয়াতের শেষাংশে বলা হচ্ছে যে, তাদের এই অন্তরংগ অনুভূতি, একাগ্রচিত্ত নামায এবং আবেগোদ্বেলিত দোয়ার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও নিজেদের পরিশুদ্ধির প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলিম সমাজের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালনেও ব্রতী হয়। কথাটা বলা হয়েছে এভাবে,

'আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয়ও করে।'

আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্য ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের এই উজ্জ্বল চিত্রের সাথে সাথেই রয়েছে তুলনাহীন গৌরবময় প্রতিদানের চিত্রও। সে প্রতিদানের ভেতর দিয়ে এই বান্দাদের

প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ তদারকী ও অভিভাবকত্ব, বিশেষ আদর, সম্মান ও আন্তরিকতারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই প্রতিদানের কথা ঘোষিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

'কেউ জানে না তাদের কাজগুলোর বিনিময়ে তাদের জন্য কেমন চোখ জুড়ানো প্রতিদান লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' (আয়াত ১৭)

এ আয়াতে মোমেনদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার আতিথেয়তা এবং তাঁর নিজ তদারকীতে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা চোখ জুড়ানো সম্মান ও আদর আপ্যায়নের চমকপ্রদ অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাদের জন্য সঞ্চিত এই পুরস্কারের বিষয়ে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এ পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কাছে গুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। যারা এর প্রাপক, একমাত্র তারাই আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের সময় তা দেখতে পাবে। মহান আল্লাহর সাথে এই গৌরবোজ্জ্বল ও প্রাণপ্রিয় সাক্ষাতকারের এ এক উজ্জ্বল ছবিই বটে!

ভেবে স্তম্ভিত হতে হয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর কতো অনুগ্রহ ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেন। তাঁর বান্দারা যতই সৎকর্মশীল, যতই এবাদতকারী, আনুগত্যকারী ও একনিষ্ঠ হোক না কেন, তিনি যদি তাদের প্রতি অনুকম্পাশীল ও দয়ালু না হতেন, তাহলে তাদের প্রতিদানকে এতো যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে রাখতেন না।

একদিকে অপরাধীদের শোচনীয় ও লাঞ্ছনাকর পরিণতি এবং অপর দিকে ঈমানদারদের সুখকর পরিণতির দৃশ্য তুলে ধরার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর কর্মফল প্রদানের সুবিচারমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতির সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরে এ আলোচনার উপসংহার টানছেন। তাঁর এই ন্যায়সংগত নীতিই দুনিয়া ও আখেরাতে সৎকর্মশীল ও দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং সূক্ষ্ম ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে কর্ম অনুসারেই তার কর্মফল নির্ণয় করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যে ব্যক্তি মোমেন, সে কি সেই ব্যক্তির মতো যে ফাসেক? এরা সমান নয়। .... (আয়াত ১৮-২২)

বস্তুত মোমেনরা ও ফাসেকরা স্বভাবে, চরিত্রে, কর্মে ও আবেগ অনুভূতিতে কখনো একরকম হয় না যে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কর্মফল বা প্রতিদান একরকম হবে। যারা ঈমানদার তাদের স্বভাব-চরিত্র ও মেজায ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকে, তারা আল্লাহমুখী হয়ে থাকে এবং তাঁর নিখুঁত ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান অনুসারে কাজ করে। আর যারা ফাসেক অসৎ ও পাপাচারী, তারা পথভ্রষ্ট ও সমাজে অশান্তি নৈরাজ্য ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে। তারা আল্লাহ তায়ালার দেয়া জীবন বিধান ও তার মৌল আইনের সাথে সংগতিশীল পথে চলে না। তাই পরকালেও মেমেন ও ফাসেকদের পরিণতি যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হবে এবং উভয়ে নিজ নিজ কৃতকর্ম অনুসারেই ফল পাবে সেটা মোটেই বিচিত্র নয়।

'যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, তাদের জন্য রয়েছে 'জান্নাতুল মাওয়া' যা তাদেরকে আশ্রয় দেবে এবং তারা সেখানে অবস্থান করবে। আর এটা হবে তাদেরই কর্মফল।'

'আর যারা পাপাচারী ও ফাসেক, তাদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন,'

সেখানে তারা আশ্রয় নেবে। আর এটা এমন খারাপ আশ্রয়স্থল যে তার অধিবাসী হওয়ার চেয়ে আশ্রয়হীন হওয়াও ভালো।

'যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই আবার তাদেরকে সেখানে ফেরত পাঠানো হবে।'

এ বাক্যটাতে দোযখ থেকে পালানো ও আত্মরক্ষা করার চেষ্টার দৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

'আর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যে দোযখের আযাবকে মিথ্যা বলতে, সেই আযাব এখন ভোগ কর।'

এটা তাদের আযাবের ওপর বাড়তি আযাবের শামিল।

ওটা ছিলো ফাসেকদের পরকালের শাস্তির বিবরণ। তাই বলে তাদেরকে সেই সময় পর্যন্ত অব্যাহতি দেয়া হয়নি। আখেরাতের আগে তাদেরকে দুনিয়াতেও শাস্তি দেয়া হবে বলে আল্লাহ তায়ালা হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

'আমি তাদেরকে বৃহত্তর আযাবের আগে ক্ষুদ্রতর আযাব ভোগ করাবোই।'

তবে এই ক্ষুদ্রতর আযাবের পথে আল্লাহর তায়ালার রহমতের ছায়া বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে ততোক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেয়া পছন্দ করেন না যতক্ষণ তারা নিজেদের কর্মদোষে শাস্তির উপযুক্ত না হয় এবং যে সব গুনাহর কারণে আযাব অনিবার্য হয়ে ওঠে, সেসব গুনাহ অব্যাহত না রাখে। তিনি কেবল ইহকালে শাস্তি দেয়ার ভয় দেখান, 'যাতে তারা ফিরে আসে।' অর্থাৎ যাতে তাদের বিবেক সচেতন হয় এবং আযাবের কষ্ট তাদেরকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনে। এতে যদি তারা ফিরে আসতো তাহলে ফাসেকদের সেই পরিণতির সম্মুখীন হতো না, যা তাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের বর্ণনায় আমরা দেখে এসেছি। কিন্তু তাদেরকে যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্তেও তারা উপেক্ষা করেছে, তাদের ওপর পার্থিব আয়াত এসে গেছে এবং এরপরও আত্মশুদ্ধি করেনি এবং শিক্ষা গ্রহণ করে অন্যায় পথ থেকে ফিরে আসেনি, তখন তারা অবশ্যই যালেম তথা অপরাধী সাব্যস্ত হবে। 'আর সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপরও সে তাকে উপেক্ষা করেছে?'

এ ধরনের লোকেরা অবশ্যই দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার শিকার হবার যোগ্য।

'আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।'

এ কথা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে যে, এটা কতো বড় ভয়ংকর হুমকি, কী সাংঘাতিক শাসানি কেননা স্বয়ং মহাপরাক্রমশালী ও মহা ক্ষমতাদর্পী আল্লাহ তায়ালাই এসব দুর্বল ও অসহায় লোককে এই ভয়াল হুমকি দিয়েছেন।

ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদের শুভ প্রতিদান এবং ফাসেক ও অসৎ লোকদের অশুভ পরিণামের বিবরণের মধ্য দিয়ে এ অধ্যায়টা শেষ হচ্ছে। যে কর্মফল দিবস সম্পর্কে কাফেররা সন্দেহ পোষণ করতো, সেই দিন এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কাদের কী দশা হবে, তা এখনে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর সূরার পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা করা হয়েছে হযরত মূসা, তার জাতি ও তার রেসালাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণের মধ্য দিয়ে। এটা এতো সংক্ষিপ্ত যে কোরআনকে যেমন সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্য পথনির্দেশিকা বানানো হয়েছে, তেমনি হযরত মূসার কেতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশিকা বানানোর কথা, কোরআন ও তাওরাতের একই মূলনীতি ও একই চিরন্তন আকীদার ব্যাপারে একমত হওয়ার কথা এবং মূসার জাতির মধ্য থেকে দৃঢ়প্রত্যয় ও ধৈর্যশীলদেরকে স্বজাতির নেতৃত্বে অভিষিক্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তৎকালীন মুসলমানদেরও ধৈর্য ও ঈমানী দৃঢ়তার প্রেরণায় উজ্জীবিত করা যায় এবং পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছি ....' (আয়াত ২৩, ২৪ ও ২৫)

'অতএব তার মিলিত হওয়া সম্পর্কে তুমি সন্দেহ পোষণ করো না এই আনুষংগিক বাক্যটার অর্থ হলো, মোহাম্মদ (স.)-এর সেই শাশ্বত সত্যের ওপর অবিচল থাকা উচিত, যার ওপর তিনি ও মূসা (আ.) এবং তাদের উভয়ের কেতাব দুটোও একমত হয়েছে। আমার মতে, এই ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য। অন্য একদল তাফসীরকার বলেছেন যে, এটা পবিত্র মেরাজের রাতে হযরত মূসার সাথে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাতের দিকে ইংগিত। কেননা চিরস্থায়ী সত্য ও সম্মিলিত আকীদা বিশ্বাসই উল্লেখের দাবী রাখে। কারণ এটাই সেই মূল বিষয়, যার জন্য রসূল (স.) ক্রমাগত উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, যার জন্য তাকে দৃঢ়তা অবলম্বনের উপদেশ দেয়াটা প্রাসংগিক ছিলো কেননা জন্য মুসলমানরাও কঠিন উৎপীড়ন ভোগ করছিলো। পরবর্তী আয়াতের সাথেও এই ব্যাখ্যা সংগতিপূর্ণ, তাদের মধ্য থেকে আমার বিধানের দিকে পথ প্রদর্শনকারী কিছু লোককে আমি তখনই নেতা বানিয়েছি, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছে ও আমার আয়াতগুলোতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে এভাবে তৎকালীন মক্কার মুষ্টিমেয়সংখ্যক মুসলমানদেরকে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় ধৈর্য ধারণে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং তাদেরই মতো দৃঢ়চেতা হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যাতে করে তাদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তি মুসলিম জাতির নেতা ও পথ প্রদর্শকরূপে তৈরী হতে পারে, যেমন তারা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের নেতা। এ আয়াতের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের দুটো অপরিহার্য গুণ জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এবং তা হচ্ছে ধৈর্য ও দৃঢ় প্রত্যয়।

ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈল যে বিভেদের শিকার হয়েছিলো, সে ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার হাতেই ন্যস্ত রয়েছে,

'তোমার প্রতিপালকই কেয়ামতের দিন তাদের মতভেদের মীমাংসা করে দেবেন।'

হযরত মূসা ও বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়ার পর অতীতের ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতিগুলোর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে,

'তাদের পূর্বে কত জাতিকে যে আমি ধ্বংস করেছি, এটা কি তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করে না? .... (আয়াত ২৬)

পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের ইতিহাস থেকে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালার বিধান প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি কী। আল্লাহর এই নীতি অমোঘ, অলংঘনীয় এবং কাউকে তা খাতির করে না। মানবজাতি তার উত্থান ও পতনে, উন্নতিতে ও অবনতিতে এবং সবলতায় ও দুর্বলতায় কিছু শাশ্বত নিয়ম কানুনের অধীন। পবিত্র কোরআন এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছে যে, এসব নিয়ম-কানুন ও আল্লাহ তায়ালার উল্লেখিত নীতিমালা চিরস্থায়ী। সে অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস থেকে পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে শিক্ষা দেয়, আল্লাহ তায়ালার পাকড়াও থেকে তাদের আত্মরক্ষার তাগিদ দেয়। বিবেক ও মনকে জাগ্রত ও সচকিত করে এবং চেতনাকে শানিত ও সংবেদনশীল করে। এসব কোরআন আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত নীতিমালা ও প্রাকৃতিক নিয়মের বাস্তব উদাহরণ হিসাবেও তুলে ধরে এবং এ দ্বারা মানুষের অনুধাবন ক্ষমতা ও মূল্যায়নের মানদন্ডকেও উন্নত ও শানিত করে। ফলে স্থান ও কাল যাই হোক না কেন, কোন জাতি বা প্রজন্ম এ শিক্ষা ও প্রেরণাকে অবহেলা করতে পারে না এবং মানব জীবনে আবহমানকাল ধরে সক্রিয় এই বিধিকে ভুলে যেতে পারে না। অবশ্য এ কথা সত্য যে, অনেকেই এ শিক্ষা ভুলে গিয়ে একই অবধারিত পরিণাম ভোগ করে থাকে।

সচেতন মন ও সজাগ অনুভূতিসম্পন্ন লোকদের জন্য প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে যথেষ্ট ভীতিপ্রদ ও চিন্তার খোরাক জোগানোর সংকেত রয়েছে। রয়েছে মেরুমজ্জায় শিহরণ, বিবেকে ঝাঁকুনি ও অন্তরাত্মায় কম্পন সৃষ্টি করার মতো শিক্ষার উপকরণ। যে আরব জাতিকে সর্ব প্রথম এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছিল, তারা আ'দ, সামুদের আবাসভূমির পাশ দিয়ে যাতায়াত করতো এবং হযরত লূতের জাতির বিধ্বস্ত আবাসভূমির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেতো। কোরআন তাদেরকে ধিক্কার দিয়েছে যে, এই সব জাতির ধ্বংসাবশেষ এদের তাদের জনপদ এদের চোখের সামনে উপস্থিত থাকা এবং সেগুলোর পাশ দিয়ে তারা প্রতিনিয়ত চলাচল করা সত্তেও তাদের অন্তরে কোনো চেতনা সঞ্চারিত হয় না, তাদের অনুভূতিতে কোনো ধাক্কা লাগে না, তাদের স্নায়ুতে কোন শিহরণ অনুভূত হয় না, তাদের বিবেকে আল্লাহর ভীতি জাগে না, একই ধরনের পরিণতি থেকে আত্মরক্ষা করার প্রেরণা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদেরকে শাস্তিযোগ্য ও সংহারযোগ্য প্রতিপন্নকারী কোনো ঘোষণা আসার আগে তারা সাবধান হয় না এবং সৎ পথ অবলম্বন করে না। এই ধিক্কারবাণীই প্রতিফলিত হয়েছে আয়তের শেষাংশে।

'এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন। তারা কি শুনতে পায় না?' অর্থাৎ সেই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির কাহিনী কি তারা শুনে না, অথবা সেই ধ্বংসযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি হওয়ার আগে তারা কি এই সতর্কবাণী শুনবে না?

হৃদয়ে নাড়া দেয়ার মতো দুটি বিষয়

অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংসযজ্ঞের ইতিবৃত্ত ও তার ফলে বিবেক ও মনে সঞ্চারিত ভীতি ও কাঁপুনির বর্ণনা দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে নির্জীব ভূমিতে জীবনী শক্তির উত্থানের প্রসংগ আলোচিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে জীবন্ত জনপদগুলোর মৃত্যু ও ধ্বংসের উল্লেখ করার পর এখন তোলা হচ্ছে ঠিক তর বিপরীত মৃত যমীনে প্রাণ সঞ্চারের প্রসংগ।

'তারা কি দেখে না যে আমি নির্জলা ভূমিতে পানি নিয়ে আসি এবং তা দিয়ে শস্য উৎপন্ন করি? .... ' (আয়াত ২৭)

তারা প্রতিনিয়তই দেখতে পায় যে, মহান আল্লাহ এসব অনুর্বর যমীনে উর্বরা শক্তি সঞ্চারকারী পানি বর্ষণ করে সহসাই তাকে সুজলা সুফলা প্রাণোচ্ছল শস্যক্ষেত্রে পরিণত করেন। সেই শস্য থেকে তাদের ও তাদের পালিত পশুদের খাদ্য উৎপন্ন হয়। অনুর্বর জমিতে পানি বর্ষিত হওয়ায় তার শস্য শামল ক্ষেতে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্য মানব হৃদয়ের বদ্ধ জানালাগুলো খুলে দেয় এবং তার ফলে তার কাছে জীবনের পদধ্বনি অনুভূত হয়। সেই সাথে অনুভূত হয় বিশ্ব প্রকৃতিতে এই জীবনী শক্তির সঞ্চারকারী মহান স্রষ্টার সীমাহীন ক্ষমতা ও তার প্রতি ভালোবাসা, অন্তরংগতা ও মমত্ববোধও জাগ্রত হয়।

এভাবে কোরআন মানুষের মানসপটে ধ্বংস ও পতনের দৃশ্য অংকন করে, যাতে উভয় ক্ষেত্রে তার চেতনা উজ্জীবিত করতে পারে, তাকে তার সরলতা ও স্থবিরতা থেকে জাগিয়ে তুলতে ও সচল করতে পারে। প্রকৃতির দৃশ্যাবলী ও জীবনের দুর্ভেদ্য রহস্যসমূহের মাঝে ও তার মাঝে বিদ্যমান আড়ালগুলো অপসারণ করতে পারে এবং তাকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য বানাতে পারে।

সবার শেষে সূরার শেষ অংশে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত আযাবকে তাড়াতাড়ি সংঘটিত করার আবদার ও তাদেরকে প্রদত্ত হুঁশিয়ারী ও হুমকির সত্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর জবাবে তাদেরকে পাল্টা হুমকি দিয়ে সাবধান করা হয়েছে যে, তারা যে

আযাবের বায়না ধরেছে, তা যে কোন দিন এসে যেতে পারে, আর যেদিন তা আসবে, সেদিন কিন্তু তারা ঈমান আনলেও কোন লাভ হবে না এবং আত্মশুদ্ধির কোন অবকাশ তারা পাবে না। অতপর রসূল (সঃ)-কে তাদের নিয়ে মাথা না ঘামানোর এবং তাদেরকে তাদের অবধারিত পরিণতির হাতে সঁপে দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে,

'তারা বলে যে, এই ফায়সালা কখন আসবে ....?' (আয়াত ২৮, ২৯ ও ৩০)

আয়াতে উল্লেখিত 'আল-ফাত' শব্দটার অর্থ হলো, দুই পক্ষের বিরোধের মীমাংসা করা এবং সেই হুমকির বাস্তবায়ন, যার সম্পর্কে তারা ভাবতো যে, ওটা তাড়াতাড়ি আসছে না। এ ধরনের ধারণা জন্মানোর কারণ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁর হুমকিকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করার প্রকৃত রহস্য তারা জানে না। তাদের তাড়াহুড়োতে এই সময়ের আগপাছ যেমন হবে না, তেমনি তা যখন এসে পড়বে তখন তা ঠেকানোর ও তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো ক্ষমতাও তাদের থাকবে না।

'বলো, মীমাংসার দিন কাফেররা ঈমান আনলেও তাদের কোন লাভ হবে না এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেয়া হবে না।'

এই মীমাংসার দিনটা দুনিয়াতেও সংঘটিত হতে পারে। তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। তখন তাদেরকে আর অবকাশও দেয়া হবে না এবং এবং ঈমান আনলেও তারা তা থেকে উদ্ধার পাবে না। আর এই দিনটা আখেরাতেও আসতে পারে। তখন তারা দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোর আবদার জানাবে, কিন্তু পাঠানো হবে না।

হৃদয়ে চূড়ান্ত হতাশা ও মেরুমজ্জায় প্রচন্ড কাঁপুনি সৃষ্টিকারী এই জবাবের পর সূরার শেষ উক্তি হলো,

'অতএব তাদেরকে এড়িয়ে যাও এবং অপেক্ষা করো, তারাও অপেক্ষমান।'

এ উক্তির ভেতরে অপেক্ষার ফল সম্পর্কে সূক্ষ্ম হুমকি দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) কর্তৃক তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়া ও তাদের অনিবার্য পরিণতির হাতে সোপর্দ করার পরও তারা এই ফল থেকে রেহাই পাবে না। একাধিক অধ্যায় বা পর্বে প্রোথিত, বহু প্রেরণাদায়ক বক্তব্যসম্বলিত, বহু দৃশ্যপট সংযোজিত এবং সর্বদিক দিয়ে মানব মনের ওপর চাপ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী বহু মূল্যবান বাণী বিধৃত এ সূরা এখানে এই গভীর আবেদনময় বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হচ্ছে।

সূরা আল আহযাব

আয়াত ৭৩ রুকু ৯

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ﴿۴﴾ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হে নবী, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ কুশলী, ২. তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু ওহী নাযিল হয় তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন, ৩. তুমি (শুধু) আল্লাহ তায়ালার ওপরই নির্ভর করো; চূড়ান্ত কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই (তোমার জন্যে) যথেষ্ট। ৪. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের জন্যে তার বুকে দুটো অন্তর পয়দা করেননি, না তিনি তোমাদের স্ত্রীদের, যাদের সাথে তোমরা (তোমাদের মায়েদের তুলনা করে) 'যেহার' করো, তাদের সত্যি সত্যি তোমাদের মা বানিয়েছেন, (একইভাবে) তিনি তোমাদের পালক পুত্রকেও তোমাদের পুত্র বানাননি; (আসলে) এগুলো হচ্ছে (নিছক) তোমাদের মুখেরই কথা; সত্য কথা তো আল্লাহ তায়ালাই বলেন এবং তিনিই তোমাদের পথ প্রদর্শন করেন। ৫. (হে ঈমানদাররা,) তোমরা (যাদের পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছো) তাদের পিতার পরিচয়েই ডাকো, এটাই আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সংগত, যদি তোমরা তাদের পিতা কারা সে পরিচয় না জানো, তাহলে (মনে

وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۙ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ

قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٥ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي

كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ

مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝٦ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ

مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ

وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝٧ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ

وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٨

করবে) তারা তোমাদেরই দ্বীনী ভাই ও তোমাদেরই দ্বীনী বন্ধু; এ ব্যাপারে (আগে) যদি তোমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাতে তোমাদের জন্যে কোনো গুনাহ নেই, তবে যদি তোমাদের মন ইচ্ছা করে এমন কিছু করে (তাহলে তোমরা গুনাহগার হবে); নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৬. আল্লাহর নবী মোমেনদের কাছে তাদের নিজেদের চাইতেও বেশী প্রিয় এবং নবীর স্ত্রীরা হচ্ছে তাদের মা (সমান, কিন্তু); আল্লাহর কেতাব অনুযায়ী (যারা) আত্মীয় স্বজন (তারা) সব মোমেন মোহাজের ব্যক্তির চাইতে একজন আরেকজনের বেশী নিকটতর, অবশ্য তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে কিছু সদাচরণ করতে চাও; এ সব কথা আল্লাহ তায়ালার কেতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ৭. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন আমি নবী রসূলদের কাছ থেকে (আমার বিধান পৌঁছে দেয়ার) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, (প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম) তোমার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং মারইয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও, এদের কাছ থেকে আমি (দ্বীন পৌঁছানোর) পাকাপোক্ত ওয়াদা নিয়েছিলাম, ৮. যাতে করে (তাদের মালিক কেয়ামতের দিন) এসব সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটা বদর যুদ্ধের পর থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত সময়কার মদীনার মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করে এবং তাদের জীবনধারার একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। এ সময়ে তারা যেসব ঘটনা-দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন এবং এই নবীন ইসলামী রাষ্ট্রে যে সামাজিক আচরণ বিধি গড়ে তোলে, সূরায় তার উল্লেখ রয়েছে।

অবশ্য এইসব ঘটনা ও আচরণ বিধি সংক্রান্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ক্ষুদ্র কলেবরের এবং সূরার একটা সীমিত অংশ জুড়ে এর অবস্থান। এতে ঘটনাবলী ও আচরণ বিধিগুলোকে ইসলামের প্রধান মূলনীতির সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সেই প্রধান মূলনীতি হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর নির্ধারিত ভাগ্য অম্লান বদনে মেনে নেয়া। সূরার প্রথম চার আয়াতে এ মূলনীতি দুটো প্রতিফলিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরার প্রথমভাগে সামাজিক আচরণ বিধি সংক্রান্ত মন্তব্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। এ মন্তব্য রয়েছে ৬, ৭ ও ৮ নং আয়াতে। 'আহযাব' তথা খন্দক যুদ্ধের দিন যেসব মুসলমান পালিয়ে গিয়েছিলো তাদের আচরণ সংক্রান্ত মন্তব্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এখান থেকেই সূরার নামকরণ হয়েছে 'আহযাব'। এ মন্তব্য রয়েছে ১৬ ও ১৭ নং আয়াতে। অনুরূপভাবে জাহেলী যুগের প্রচলিত রীতিপ্রথা ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী নতুন সামাজিক আচরণ বিধি সম্পর্কে এ মন্তব্যটাতেও মূলনীতিদ্বয়েরই অভিব্যক্তি ঘটেছে,

'কোনো ঈমানদার নারী ও পুরুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করার পর সেই ব্যাপারে সে নিজের খেয়াল খুশী মতো কাজ করবে।' সর্বশেষে এর প্রতিফলন ঘটেছে সূরার শেষভাগের ৭২ নং আয়াতের গুরুগম্ভীর ঘোষণায়।

মদিনার মুসলমানদের জীবনের এই অংশটার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ইসলামী স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণগুলো এই সময়েই ফুটে উঠেছিলো। তবে সেটা একদিকে যেমন স্থিতিশীল হয়নি, তেমনি তা সর্বময় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয়নি, যেমনটি হয়েছিলো মক্কা বিজয়ের পর এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামী সরকারের হাতে প্রশাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পর।

সূরাটাতে মুসলিম সমাজের পুনর্গঠন, ইসলামী চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে স্থিতিশীল ও প্রসারিত করা এবং ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস ও আইন কানুন যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার, সংশোধন, উচ্ছেদ সাধন ও সঠিক পরিবেশকে নতুন ইসলামী বিধিব্যবস্থার আওতাধীন করার কথাও ঘোষিত হয়েছে।

এইসব বিষয় আলোচনার প্রেক্ষাপটে আহযাব যুদ্ধ, বনু কোরায়যার যুদ্ধ এবং এই উভয় যুদ্ধে কাফের, মোনাফেক ও ইহুদী গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকাও আলোচিত হয়েছে। দেখানো হয়েছে, কিভাবে তারা মুসলমানদের ভেতরে থেকে ষড়যন্ত্র করে এবং এই ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানদের কতো ক্ষতি হয়– এরপর আলোচিত হয়েছে মুসলমানদের ঈমান, চরিত্র, আদব আখলাক, পরিবার ও নারী সমাজের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত।

সূরায় এইসব সামাজিক বিধিব্যবস্থা, এই দুই যুদ্ধ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনার মধ্যকার যোগসূত্র হলো কাফের মোনাফেক ও ইহুদীদের নীতির সাথে এগুলোর সংশ্লিষ্টতা এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও ভেদাভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যে কাফের, মোনাফেক ও ইহুদীদের অপচেষ্টা, চাই সে অপচেষ্টা সামরিক আক্রমণ চালানো, অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং পরাজয় মেনে নেয়ার কূ-মন্ত্রণা দেয়ার মাধ্যমে হোক অথবা সামাজিক ও নৈতিক অধপতন ঘটানোর মাধ্যমে হোক। এ ছাড়া মুসলমানদের জীবনে যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের যে প্রভাব পড়ে, তার কারণে কিছু কিছু সামাজিক বিধিব্যবস্থায় ও ধ্যান ধারণায় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং সেগুলোকে যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ গনিমতের প্রভাবে মুসলিম সমাজে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতির আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই পটভূমিতেও সূরায় নতুন বিধিব্যবস্থার সংযোজন ঘটেছে।

এসব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে সূরার আলোচিত বিষয়গুলোতে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকলেও ঐক্য, সংহতি ও সমন্বয় বহাল রয়েছে। সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলী ও বিধিব্যবস্থার কালগত ঐক্য এগুলোকেই সুসমন্বিত করে।

সূরাটা শুরু হয়েছে আল্লাহর প্রতি রসুল (স.)-এর ভয় সৃষ্টি, কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ না করা, একমাত্র ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর পাঠানো নির্দেশাবলীর অনুসরণ করা এবং শুধু তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করার আদেশদানের মাধ্যমে। এভাবে শুরু হওয়ার কারণে সূরায় আলোচিত সমুদয় ঘটনাবলী ও বিধি ব্যবস্থার সংযোগ সেই প্রধান মূলনীতির সাথে প্রতিষ্ঠিত হলো, যার ওপর ইসলামের যাবতীয় আইন কানুন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং নৈতিক বিধানের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে। সেই প্রধান মূলনীতিটা হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের আন্তরিক উপলব্ধি, তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণ, তাঁর মনোনীত বিধানের অনুসরণ, একমাত্র তাঁর ওপর নির্ভর করা এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্যকে যথেষ্ট মনে করা ও নিশ্চিন্ত হওয়া। শুরুর কিছু পরই সমাজে প্রচলিত কিছু রীতি ও প্রথা সম্পর্কে সঠিক ও চূড়ান্ত ফায়সালা ঘোষিত হয়। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম তথ্য সম্বলিত একটা বাস্তব উক্তি উচ্চারিত হয়,

'আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের জন্যে দুটো হৃদয় তৈরী করেননি।' এ দ্বারা এই মর্মে ইংগিত দেয়া হচ্ছে যে, মানুষ একই সময়ে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে, কিংবা একাধিক বিধান অনুসরণ করতে পারে না। তা করতে গেলে তাকে মোনাফেকী করতে হবে এবং তাকে বিপথগামী হবার ঝুঁকি নিতে হবে। তার যখন একটার বেশী হৃদয় নেই, তখন তাকে অবশ্যই একমাত্র মা'বুদ আল্লাহর অনুগত হতে হবে, একমাত্র বিধান ইসলামের অনুসারী হতে হবে এবং এ ছাড়া আর যতো পথ, পন্থা, নিয়ম, বিধি, রীতি, নীতি, প্রথা ও পদ্ধতি আছে, তা যতোই প্রিয় হোক বর্জন করতে হবে।

এ কারণেই 'যেহারের' প্রথাটা বিলোপের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেহার হলো জাহেলী যুগের একটা ন্যক্কারজনক প্রথা। স্বামী রেগে গেলে স্ত্রীকে বলতো, 'তুই আমার মায়ের মতো' যাতে সে মায়ের মতোই তার জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে সমস্ত স্ত্রীর সাথে তোমরা যেহার করো, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মা বানাননি। অর্থাৎ এ কথাটা নিছক মুখ দিয়েই বলা হয়, আসলে এর পেছনে কোনো সত্য নেই। স্ত্রী স্ত্রীই থেকে যায়। শুধু এই কথাটার কারণেই সে মা হয়ে যায় না।(১)

এরপর এই বলে পালক পুত্র গ্রহণের প্রথা ও সেই প্রথা থেকে উদ্ভূত অন্যান্য সামাজিক, রীতি-নীতি উচ্ছেদ করা হয়ছে, 'তোমাদের পালক পুত্রদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পুত্র বানাননি।' সুতরাং এখন থেকে তারা আর উত্তরাধিকারী হবে না এবং এই পালকপুত্র গ্রহণের অন্যান্য ফলাফলও কার্যকর হবে না। (এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে আসছে।) এরপর সকল মুসলমানদের জন্যে রসূল (স.)-এর সার্বিক অভিভাবকত্ব বহাল থেকে যাবে বা বহাল করা হবে। আর এই অভিভাকত্ব তাদের নিজেদের অভিভাবকত্বের ওপর অগ্রগণ্য হবে। রসূল (স.)-এর এই অভিভাকত্ব সর্বসাধারণ মুসলমানদের সাথে রসূলসহধর্মিনীদের আদর্শগত মাতৃত্বের সম্পর্কের মতোই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মুসলমানদের জন্যে রসূল (স.) তাদের নিজেদের চেয়ে উত্তম অভিভাবক, আর তাঁর স্ত্রীরা তাদের মাতা।' অতপর হিজরতের প্রথম দিকে আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গঠন করা হয়েছিলো সেই ভ্রাতৃত্বের ফলাফলও বাতিল করা হয়েছে এবং উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়কে স্বাভাবিক আত্মীয়তার সাথেই সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহর কেতাবে মুসলমান ও মোহাজেরদের চেয়ে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রাই পরস্পরের অভিভাকত্বের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।' এর মধ্য দিয়েই কোরআন স্বাভাবিক আত্মীয়তার ভিত্তির ওপর মুসলমানদের সমাজব্যবস্থা পুনর্গঠিত এবং অন্যসব সাময়িক বিধিব্যবস্থাকে বাতিল করেছে।

ইসলামের বিধান ও আল্লাহর ফায়সালা থেকে উৎসারিত এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই বলে মন্তব্য করা হয়েছে যে, এটাই আল্লাহর প্রাচীন কেতাবে লেখা রয়েছে এবং নবীদের কাছ

(১) এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটা পরবর্তীতে এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করবো।

থেকে বিশেষত তাঁদের মধ্য থেকে অধিকতর মর্যাদাবান নবীদের কাছ থেকে এটাই বাস্তবায়িত করার অংগীকার নেয়া হয়েছে। মূলত আইন কানুন ও নীতি নির্দেশনাবলীর ক্ষেত্রে এরূপ মন্তব্য করা কোরআনের স্থায়ী রীতি। এ রীতির উদ্দেশ্য হলো, এসব আইন কানুন ও নীতিমালাকে মানুষের মনমগজে বদ্ধমূল করা।

এই হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের ওপর ইসলামের শত্রুদের সর্বাত্মক ও ঐক্যবদ্ধ আক্রমণজনিত খন্দক যুদ্ধকে নস্যাত করে দিয়ে যে অনুগ্রহ করেন, তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এরপর খন্দক যুদ্ধের দুটো ঘটনা ও বনু কোরায়যার ঘটনার প্রাণবন্তদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে পর্যায়ক্রমিকভাবে এবং এমনভাবে যে, অন্তরের সুপ্ত অনুভূতি, প্রকাশ্য তৎপরতা এবং দল ও ব্যক্তির মধ্যকার সংলাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর দৃশ্য অংকনের সময় বিভিন্ন নির্দেশাবলীকে যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বিভিন্ন ঘটনাবলীর ওপর যে মন্তব্যগুলো করা হয়েছে, সেগুলো করা হয়েছে কোরআনের স্থায়ী নিয়ম অনুসারে। বাস্তবে যা ঘটেছে এবং মনমগজকে যা প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করেছে, তার মধ্য দিয়ে জীবনের জন্যে স্থায়ী মূল্যবোধ নির্ধারণে কোরআনের এই স্থায়ী নিয়ম অনুসৃত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ ও মানদন্ড নিরুপণ এবং যে চিন্তাধারাকে সে সমাজে বিজয়ী ও আধিপত্যশীল দেখতে চায়, সেই চিন্তাধারার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ঘটনাকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে, সেইসব ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে কোরআনের একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে। কোরআনের এই পদ্ধতিটা হলো, সে সংঘটিত ঘটনাটাকে হুবহু বর্ণনা করবে, সেই সাথে প্রকাশ্য ও সুপ্ত অনুভূতিও তুলে ধরবে, অতপর তার তথ্যাবলী এমনভাবে উদঘাটন করবে যে তার যাবতীয় গুপ্ত দিক প্রকাশিত হবে। তারপর মুসলমানদেরকে যা ঘটেছে সে সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্ত জানাবে। তাতে যদি কিছু ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে থাকে, তবে তার সমালোচনা করবে। আর সুষ্ঠু ও নির্ভুল কিছু থাকলে তার প্রশংসা করবে, ভুল ভ্রান্তি থাকলে তার সংশোধনের জন্যে এবং সুষ্ঠু ও উত্তম কিছু থাকলে তার বিকাশ বৃদ্ধির জন্যে জোর নির্দেশ দেয়া হবে। আর এই সবকিছুকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যলিপি, তাঁর ইচ্ছা, কাজ, নির্ভুল বিধান, স্বভাব প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও শক্তিগুলোর সাথে যুক্ত ও সমন্বিত করেছেন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই, খন্দকের যুদ্ধের বিবরণ শুরু হয়েছে, 'হে ঈমানদাররা, তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের কাছে শত্রু সেনারা এলো। আমি তখনই তাদের কাছে বাতাস ও তোমরা কখনো দেখোনি এমন বাহিনী পাঠালাম।.........' (আয়াত ৯) এর মাঝখানে রয়েছে, বলো, তোমাদের পালানোতে কোনো লাভ হবে না ....।' (আয়াত ১৬-১৭) 'তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে ....। (আয়াত ২১) এবং সবার শেষে 'সত্যনিষ্ঠদেরকে যেনো আল্লাহ তাদের সত্যনিষ্ঠার জন্যে পুরস্কার দিতে পারেন ....।' (আয়াত ২৪)

এরই পাশাপাশি যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠ মোমেনদের মনোভাব এবং মনোব্যাধিতে আক্রান্ত মোনাফেকদের মনোভাব এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সেই মনোভাবের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ মূল্যবোধগুলো আলাদা আলাদা হয়ে বাছাই হয়ে যায়। যেমন 'মোনাফেক ও মনোব্যাধিতে আক্রান্তরা বলে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়।' ...... মোমেনরা যখন আক্রমণকারী সেনাদলগুলোকে দেখলো, তখন বললো, আমাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাতো এটাই। এতে তাদের প্রত্যয় ও আত্মসমর্পণ কেবল বেড়েই যায়। অতপর অকাট্য ফায়সালা ও দৃঢ়

বিশ্বাস সহকারে ঘোষণা করা হয়েছে। 'আর আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে তাদের আক্রোশ সহকারেই ফেরত পাঠালেন। তারা এক বিন্দুও লাভবান হতে পারলো না। মোমেনদের যুদ্ধের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। তিনি মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী।'

এরপর রসূল (স.)-এর কতিপয় স্ত্রীর প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। বিতাড়িত ইহুদী গোষ্ঠী বনু কোরায়যার পরিত্যক্ত সম্পদ ও ইতিপূর্বেকার যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সুবাদে রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালা যখন বিপুল সম্পদের অধিকারী করলেন, তখন রসূল (স.)-এর এই ক'জন স্ত্রী তাঁদের খোরপোষের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়ার দাবী জানালেন। এই দাবীর জবাবে তাদেরকে দুনিয়ার সহায় সম্পদ, আরাম আয়েশ ও বিলাস ব্যসন অথবা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সুখ শান্তি-এই দুটোর যে কোনো একটা বেছে নেয়ার আহ্বান জানানো হলো। তাঁরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সুখ শন্তিকেই বেছে নিলেন। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের চোখে সম্মানজনক এই স্থানকে পার্থিব সহায় সম্পদের ওপরে অগ্রাধিকার দিলেন। এ জন্যেই তাদেরকে জানানো হলো যে, তাদের পরহেযগারী ও তাকওয়ার জন্যে যেমন তারা দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে, তেমনি কোনো খারাপ কাজ করলেও প্রমাণ সাপেক্ষে দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করবে। এই দ্বিগুণ শাস্তি ও দ্বিগুণ পুরস্কারের কারণ দেখানো হলো এই যে, তারা অত্যন্ত মহীয়সী ও শ্রদ্ধাভাজন, রসূল (স.)-এর সাথে তাদের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাদের ঘরে প্রতিনিয়ত কোরআন নাযিল ও পঠিত হয় এবং রসূল (স.)-এর কাছ থেকে তারা হরহামেশা জ্ঞানের কথা শোনার সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন। এরপর সকল মুসলিম নারী ও পুরুষের উত্তম প্রতিদানের আরো বর্ণনা দিয়ে তৃতীয় অধ্যায় শেষ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে রসূল (স.)-এর মুক্ত গোলাম যায়েদ বিন হারেসার সাথে রসূল (স.)-এর ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহাশের বিয়ে সম্পর্কে অস্পষ্ট আভাস। এ অধ্যায়ে এ বিষয়টাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম নারী ও পুরুষদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। মুসলিম নারী পুরুষদের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই এবং কোনো অধিকার নেই। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু পরিচালনা করেন এবং মোমেন মাত্রেরই তার কাছে দ্ব্যর্থহীন ও পূর্ণাংগভাবে আত্মসমর্পণ করা কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যখন কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন, তখন কোনো মুসলিম নারী ও পুরুষের নিজেদের ব্যাপারে কোনো নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে না।' .... (আয়াত ৩৬)

এরপর বিয়ের ঘটনা, তালাকের ঘটনা ও পালকপুত্র গ্রহণের ফলাফল বাতিল করা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শেষোক্ত বিষয়টা নিয়ে সূরার শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে। পালকপুত্র গ্রহণের ফলাফল বাতিল করার জন্যে স্বয়ং রসূল (স.) কে দিয়েই এমন একটা কাজ করানো হয়, যা সেই পরিবেশে অন্য কারো দ্বারা সম্ভব হতো না। কেননা সেকালের আরবীয় সমাজে এই প্রথাটা ছিলো খুবই গভীর এবং এর বিরোধিতা করা খুবই দুরূহ ছিলো। তাই পরীক্ষাটা এসে পড়লো রসূল (স.) -এর ওপরেই, যাতে তিনি দাওয়াতী কাজ পরিচালনা ও তার মূলনীতিগুলো মন মগজে বদ্ধমূল করার পর সমাজ জীবনেও প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি এ দায়িত্বটাও যেন পালন করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতপর যায়েদ যখন তাকে (যয়নবকে) পরিত্যাগ করলো, তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম ....' (আয়াত ৩৭)

এ প্রসংগে রসূলের (স.)-এর সাথে সকল মুসলমানের সম্পর্কটা কী ধরনের তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, 'মোহাম্মদ (স.) তোমাদের কারো পিতা নয়, তিনি কেবল আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।' .... (আয়াত ৪০)

সবার শেষে রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মুসলমানদেরকে কিছু নির্দেশ দেয়ার মধ্য দিয়ে এ অধ্যায় শেষ করা হয়েছে,

'কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ করো না' .... (আয়াত ৪৮)

পঞ্চম অধ্যায় শুরু হয়েছে যেসব স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয় তাদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তারপর রসূল (স.)-এর দাম্পত্য জীবনকে সুশৃংখল করা হয়েছে। মুসলিম নারীদের মধ্যে কাকে কাকে তার বিয়ে করা বৈধ এবং কাকে কাকে বিয়ে করা অবৈধ, তাও বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর রসূল (স.) ও তাঁর স্ত্রীদের বাড়ীর সাথে মুসলমানরা রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় ও ইন্তেকালের পরে কিভাবে সম্পর্ক রাখবে। পিতা, পুত্র, ভাই, ভাতিজা, দাসদের ছাড়া আর সবার সাথে পর্দা করা এবং রসূল (স.)-কে যারা নানাভাবে কষ্ট দেয় তাদের শাস্তি ও দুনিয়া আখেরাতে অভিশাপ লাভের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। এসব থেকে বুঝা যায় যে, মোনাফেকরা এ জাতীয় অনেক অপকর্মই করতো।

এ প্রসংগে উপসংহারে রসূল (স.)-এর স্ত্রীরা, কন্যা ও দাসীদেরকে সারা দেহ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে তাদেরকে চেনা যাবে এবং উত্ত্যক্ত করা হবে না। উপসংহারে আরো হুমকি দেয়া হয়েছে যে, মোনাফেক, মনোব্যাধিগ্রস্ত ও গুজব রটনাকারীদের ওপর রসূল (স.)-কে ক্ষমতাশালী করা হবে এবং বনু কাইনুকা ও বনু নযীরের মতো তাদেরকেও মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হবে অথবা বনু কোরায়যার মতো খতম করে দেয়া হবে। এসব কথা থেকে বুঝা যায় যে, এই গোষ্ঠীগুলো মদিনার মুসলমানদেরকে নানা ন্যক্কারজনক পন্থায় কষ্ট দিতো।

৬ষ্ঠ ও সর্বশেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, লোকেরা কেয়ামত কবে হবে-এই মর্মে প্রশ্ন করে। তার জবাবে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের ব্যাপারে সমস্ত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রাখেন। আভাস দেয়া হয়েছে যে, কেয়ামত ঘনিয়েও এসে থাকতে পারে। এরপর কেয়ামতের একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখানো হয়েছে ৬৬ নং আয়াতে এবং ৬৭ ও ৬৮ নং আয়াতে তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে তাদের কঠোর প্রতিশোধ স্পৃহা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা তারাই তাদেরকে আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে বিপথগামী করেছে।

অতপর সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে এমন একটা বক্তব্য দেয়ার মাধ্যমে যা গভীর তাৎপর্যবহ।

'আমি এই আমানতকে আকাশ ও পৃথিবীর সামনে রেখেছিলোম কিন্তু তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করলো .... ' (আয়াত ৭২-৭৩)

এ থেকে জানা যায় যে, মানব জাতির ঘাড়ে যে দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়েছে বিশেষত মুসলমানদের ঘাড়ে তা কতো বড়ো মুসলিম উম্মাহ একাই এই গুরুদায়িত্ব বহন করছে। এ দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ এবং তার ওপর টিকে থাকার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব উপলব্ধি করার দাওয়াত দিতে হবে এবং এর ওপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। নিজেদের ওপর ও সারা পৃথিবীতে এ আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হবে। এ আহ্বান সমগ্র সূরার বিষয়বস্তুর সাথে তার পটভূমির সাথে ও আল্লাহর বিধানের মেযাজের সাথে সংগতিপূর্ণ। এ বিধান সমগ্র মুসলিম জাতিকে তার মূল আদর্শের ওপর পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর এবার সূরার বিশদ ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করতে চাই।

তাফসীর

আয়াত ১-৮

'হে নবী, আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করো না।' .... (আয়াত ১, ২ ও ৩)

এ হচ্ছে সূরার সূচনা। সদ্য প্রসূত ইসলামী সমাজের অনেকগুলো নৈতিক ও সামাজিক দিক এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। সূরার সূচনা দেখেই ইসলামী বিধানের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং তার বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কি, তা অবগত হওয়া যায়।

বস্তুত ইসলাম কতোকগুলো উপদেশ ও ওয়ায নসিহতের সমষ্টি মাত্র নয়, নিছক কতকগুলো নৈতিক ও সামাজিক আচরণের দিকনির্দেশক নীতিবাক্যের সমষ্টিও নয়। কতকগুলো প্রচলিত রীতিপ্রথা ও ঐতিহ্যের সমষ্টিও নয়, কিংবা কতকগুলো দেওয়ানী, ফৌজদারী, সাংবিধানিক ও অন্যান্য ধরনের আইন কানুনও নয়। যদিও এগুলো সবই ইসলামের আওতাভুক্ত কিন্তু এগুলোর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম অর্থ পূর্ণাংগ আত্মসমর্পণ। আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্যের সার্বিক প্রস্তুতি ও সম্মতি, তাঁর রচিত বিধান ও নীতিমালার অনুসরণের সর্বাত্মক অংগীকার ও প্রতিজ্ঞা। অন্যসব রকমের নীতি, নির্দেশ, বিধান ও দৃষ্টিভংগীকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য সবার ওপর অনাস্থা ও অনির্ভরতা। ইসলাম হচ্ছে প্রাথমিকভাবে এই অনুভূতি ও উপলব্ধির নাম যে, একক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর যে বিধান মানবজাতিকে ও গোটা বিশ্বজগতকে নিরংকুশভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে, স্বয়ং মানুষও এই পৃথিবীতে সেই আল্লাহর বিধানই মেনে চলতে বাধ্য। তিনি একাধারে সমগ্র পৃথিবীকে, সমুদয় গ্রহ-নক্ষত্রকে ও সমগ্র নভোমন্ডলকে পরিচালনা ও শাসন করছেন। সমগ্র বিশ্ব জগতের যেখানে যা কিছু গোপন বা প্রকাশ্যে বিরাজ করছে। যা কিছু দৃশ্যমান বা অদৃশ্য, যা কিছু মানুষের বিবেক বুদ্ধির নাগালের মধ্যে রয়েছে এবং যা কিছু বিবেক বুদ্ধির নাগালের বাইরে-সব কিছুরই তিনি পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন। ইসলাম হচ্ছে এই প্রত্যয় ও বিশ্বাসের নাম যে, আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা মেনে চলা এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা, যে উপায় উপকরণ তিনি মানুষের করায়ত্ত করেছেন, তা ধারণ ও প্রয়োগ করা এবং তার যে ফলাফল আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ ও বিধিবদ্ধ করেছেন সেই ফলাফলই প্রত্যাশা করা। এ হচ্ছে ইসলামের ভিত্তিমূল। এই ভিত্তিমূলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আইন কানুন ও সংবিধান সামাজিক রীতিপ্রথা ও ঐতিহ্য এবং নৈতিক ও চারিত্রিক বিধি বিধান। এইসব আইন, রীতিপ্রথা ও নৈতিকতা সবই হতে হবে মনমগজে ধারণ করা আকীদা বিশ্বাসের দাবীর বাস্তব রূপ এবং মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তাঁর জীবন বিধানের আনুগত্যেরই বাস্তব প্রতিকৃতি। অন্যকথায়, ইসলাম হচ্ছে একটা সুনির্দিষ্ট আকীদা বিশ্বাস। সেই আকীদা বিশ্বাস থেকে উৎসারিত আইন ও বিধান। সেই আইন ও বিধান অনুসারে গঠিত সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা এবং এই তিনটির সম্মিলিত ও সুসমন্বিত রূপ।

এ কারণে যদিও মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনকে বিভিন্ন আইন কানুন ও নৈতিক বিধি বিধানের ভিত্তিতে সংগঠিত করা ও শৃংখলাবদ্ধ করাই বর্তমান সূরার আলোচ্য বিষয়, তথাপি সূরাটার প্রথম নির্দেশ হিসেবে স্থান পেয়েছে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতিমূলক আত্মসংযমের নির্দেশ। আর এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে প্রাথমিকভাবে রসূল (স.)-কে, যিনি এইসব আইন কানুন ও বিধি বিধানের পূর্ণ অনুগত ও বাস্তবায়নকারী। বলা হয়েছে,

'হে নবী আল্লাহ তায়ালাকে ভয় সহকারে আত্মসংযম করুন........... ।'

বস্তুত আল্লাহর ভয় সহকারে আত্মসংযম, আল্লাহর সার্বক্ষণিক প্রহরা ও তত্ত্বাবধানের অনুভূতি এবং তাঁর প্রতাপ ও পরাক্রমের উপলব্ধিই হচ্ছে ইসলামের ভিত্তিমূল ও প্রথম স্তম্ভ। আল্লাহর আইন ও বিধানের বাস্তবায়নের ব্যাপারে এই আল্লাহভীতিই বিবেকের ওপর সার্বক্ষণিক প্রহরীরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইসলামের প্রতিটি দায়িত্ব ও প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রেরণা এই আল্লাহ ভীতি থেকেই আসে।

আদর্শের প্রশ্নে ইসলামের আপোষহীন ভূমিকা

এরপর দেয়া হয়েছে কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য থেকে বিরত থাকার নির্দেশ এবং তাদের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, মতামত ও প্ররোচনা শ্রবণ ও বাস্তবায়নে কড়া নিষেধাজ্ঞা।

'এবং কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করো না।'

এই নিষেধাজ্ঞাটাকে আগে ও আল্লাহর পাঠানো ওহীর বিধান অনুসরণের আদেশটাকে পরে উল্লেখ করা থেকে বুঝা যায় যে, সেই সময় মদীনায় ও তার আশেপাশে কাফের ও মোনাফেকদের চাপ খুবই জোরদার ও তীব্র ছিলো। এ জন্যে তাদের মতামত ও প্ররোচণা অনুসরণে এবং তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকারে এই নিষেধাজ্ঞা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো। পরে এই নিষেধাজ্ঞা সকল পরিবেশে ও সকল যুগে বহাল থেকেছে। মোমেনদেরকে কাফের ও মোনাফেকদের মতামত অনুসরণ করতে সর্বতোভাবে নিষেধ করা হয়েছে, বিশেষত আকীদা বিশ্বাসে। আইন প্রণয়নে, সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থাপনার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এটা আরো কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ তায়ালা চান মুসলমানদের জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহমুখী থাকুক এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নির্দেশের সাথে কোনোভাবেই তার মিশ্রণ না ঘটুক। তিনি চান, কাফের ও মোনাফেকদের হাতে বস্তুবাদী জ্ঞানবিজ্ঞান, পরীক্ষা নিরীক্ষা, অভিজ্ঞতা, গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও আবিষ্কার উদ্ভাবনের যে ভান্ডার সঞ্চিত রয়েছে, তা দ্বারা কোনো মুসলমান যেন প্রতারিত না হয়-যেমনটি দুর্বলতা ও বিকৃতির মুহূর্তগুলোতে কিছু সংখ্যক মুসলমান প্রতারিত হয়ে থাকে। তাদের মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে বড়ো বিজ্ঞানী এবং সবচেয়ে বড়ো তথ্যাভিজ্ঞ। তিনি নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে তাদের জন্যে জীবন যাপন পদ্ধতি রচনা করে দিয়েছেন।

'নিশ্চয় মহান আল্লাহ মহাবিজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।'

তাই তাঁর রচিত জীবনবিধানও সর্বাধিক যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত। মানুষের রচিত সবকিছুই অযৌক্তিক ও বিজ্ঞান বিরোধী। কারণ তাদের কাছে জ্ঞান বিজ্ঞানের খোলস ছাড়া কিছু নেই এবং যেটুকু আছে তা নিতান্তই সামান্য ও অপর্যাপ্ত।

তৃতীয় প্রত্যক্ষ নির্দেশ হলো,

'তুমি তোমার কাছে ওহীযোগে যা কিছু আসে, তার অনুসরণ করো।'

কেননা এই উৎস থেকেই নির্দেশসমূহ এসে থাকে এবং একমাত্র এই উৎসই অনুসরণের যোগ্য।

'তুমি তোমার কাছে ওহীযোগে পাঠানো বিধানের অনুসরণ করো'

এ উক্তির বর্ণনাভংগীর আলোকে এতে বহু সংখ্যক তাৎপর্যবহ ইংগিত রয়েছে। যেমন 'তোমার কাছে' এবং 'তোমার প্রভুর কাছ থেকে' এই কথা দুটো প্রণিধানযোগ্য। এইসব তাৎপর্যবহ ও স্পর্শকাতর ইংগিতের আলোকেই অনুসরণের দায়িত্বটা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। উপরন্তু

আদেশদাতার পক্ষ থেকে জারিকৃত আদেশ বলেও এ কাজ দায়িত্বের আওতাভুক্ত। আর 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত। এই মন্তব্যও বিশেষভাবে দায়িত্ব সচেতনতা জাগিয়ে তোলে। কেননা এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার কাজ, কাজের প্রকৃত পরিচয় এবং কাজের প্রেরণার উৎস বা বিবেকের তাড়না-সবই জানেন।

সর্বশেষ নির্দেশ হলো,

'আর তুমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো, আল্লাহ তায়ালা কর্মব্যবস্থাপক হিসাবে যথেষ্ট।'

সুতরাং জনগণ তোমার পক্ষে থাকলো, না বিপক্ষে চলে গেলো, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণায় বিব্রত হয়ো না। তোমার সমস্ত কাজের ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করো। তিনি নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কুশলতা দ্বারা সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করবেন। চূড়ান্তভাবে সবকিছু আল্লাহর ওপর সোপর্দ করা ও একমাত্র তাঁর ওপর নির্ভর করাটাই হলো মোমেনের জন্যে একমাত্র আশ্বস্তকারী চিরন্তন মূলনীতি। এই মূলনীতি অনুসারে মোমেন বান্দা তার সীমাবদ্ধতা বুঝতে ও ক্ষমতার প্রান্তসীমা জানতে পারে। সেই সীমার বাইরের সবকিছুই নিশ্চিন্ত মনে আদেশদাতা মহান আল্লাহর জন্যে রেখে দেয়।

কাফের ও মোনাফেকদের মতামত ও প্ররোচণার চাপের কাছে নতি স্বীকার না করা ও তার বিরুদ্ধে চলতে থাকার পাশাপাশি আল্লাহর ভয়, তাঁর ওহীর অনুসরণ এবং তাঁর ওপর ভরসা ও নির্ভরশীলতা এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনের পতাকাবাহীকে পর্যাপ্ত শক্তি, সাহস ও হিম্মতের রসদ যোগায় এবং আন্দোলনকে তার স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। আল্লাহর কাছ থেকে আগত এ আদর্শ তাকে আল্লাহর দিকেই নিয়ে যায় এবং আল্লাহর ওপরই নির্ভরশীল রাখে।

অতপর এই সবক'টা নির্দেশের সমাপ্তি টানা হচ্ছে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণজনিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাধ্যমে,

'আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যক্তিকে তার অভ্যন্তরে দুটো মন দেননি......।'

যেহেতু তার মন একটা, সুতরাং তার চলার পথও একটাই হবে। জীবন ও জগত সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগীও একই রকম হবে। যাবতীয় জিনিস, ঘটনাবলী ও ধ্যান ধারণার মূল্যায়নের জন্যে তার কাছে মানদন্ডও একটাও থাকবে। অন্যথায় সে হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত, বিশৃংখল, মোনাফেক, ভন্ড, বাঁকা পথগামী এবং কোনো দিকেই সে দৃঢ় পদক্ষেপে এগুতে পারবে না।

কোনো মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব নয় যে, সে তার স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারের শিক্ষা গ্রহণ করবে এক উৎস থেকে, আইন কানুন গ্রহণ করবে আর এক উৎস থেকে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তৃতীয় কোনো উৎস থেকে এবং সংস্কৃতি ও কৃষ্টির শিক্ষা গ্রহণ করবে চতুর্থ কোনো উৎস থেকে। এমন জগাখিচুড়ি ও বহুমুখী জীবন ব্যবস্থা এমন কোনো সুসংহত মানুষ সৃষ্টি করে না, যার একটামাত্র হৃদয় রয়েছে। এ ধরনের জীবন ব্যবস্থা কেবল বহুধা বিচ্ছিন্ন মানব সত্ত্বারই উদ্ভব ঘটায়। সেই মানব সত্ত্বার কোনো একীভূত চরিত্র ও স্থীতিশীল ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

কোনো আকীদা বিশ্বাস বা আদর্শ ধারণ করে-এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা আদৌ সম্ভব নয় যে, তার একটা আদর্শ বা আকীদায় সত্যিই আস্থা থাকবে, অথচ সেই আকীদা বা আদর্শের দাবী, চাহিদা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের প্রভাবমুক্ত হয়ে সে জীবনের কোনো দিক ও বিভাগে কোনো ছোটো বা বড়ো কাজ করবে। সে যে কোনো কথাই বলুক, যে কোনো কাজই

করুক, যে কোনো সংকল্পই গ্রহণ করুক এবং যে কোনো চিন্তাধারাই অবলম্বন করুক-তার অন্তঃকরণে যে আকীদা ও আদর্শ যথার্থই বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, সে আদর্শের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব থেকে একেবারেই মুক্ত হয়ে সে সেই কথা বলতে, সেই কাজ করতে, সেই চিন্তা বা সংকল্প গ্রহণ করতে পারে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে একটামাত্র অন্তকরণই সৃষ্টি করেছেন, যা একটামাত্র বিধানের কাছেই নতি স্বীকার করতে সক্ষম। একটামাত্র চিন্তাধারাই গ্রহণ করতে সক্ষম এবং একটামাত্র মানদন্ডেই সবকিছু পরিমাপ ও মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

কোনো আদর্শবাদী মুসলিম ব্যক্তি এ কথা বলতে পারে না যে, এই কাজটা আমি ব্যক্তিগতভাবে করলাম। আর এই কাজটা করলাম মুসলিম হিসাবে-যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবসায়ী, সমাজ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ এ ধরনের কথাবার্তা আজকাল প্রায়ই বলে থাকেন। প্রত্যেক মানুষের একটা মাত্রই সত্ত্বা ও ব্যক্তিত্ব থাকে, একটা মাত্রই মন ও বিবেক থাকে, একটাই আকীদা ও আদর্শ থাকে, জীবন সম্পর্কে একটামাত্রই ধারণা ও বিশ্বাস থাকে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড ও মূল্যবোধের জন্যে একটাই মানদন্ড থাকে। আর তার আকীদা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত চিন্তাধারাই সকল অবস্থায় তার সমস্ত কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়।

এই একটা মাত্র অন্তঃকরণ নিয়েই সে তার ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন অতিবাহিত করে। ওটা নিয়েই সে প্রকাশ্য ও গোপন জীবনযাপন করে, চাকুরী অথবা মনীবগিরি করে, শাসক অথবা শাসিতের জীবন উপভোগ করে। সুখে অথবা দুঃখে জীবন কাটায়। এ সবের কোনো অবস্থাই তার মানদন্ড বদলায় না। মূল্যবোধ বদলায় না, চিন্তাধারায় হেরফের হয় না। কেননা

'আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দুটো অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেননি।'

সুতরাং মানুষের সামনে একটা মাত্রই পথই খোলা। তা হলো এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। একটামাত্র হৃদয়ের অধিকারী মানুষ দু'জন মাবুদের আনুগত্য করতে পারে না, দু'জন মনীবের সেবা করতে পারে না। দুটো পথে চলতে পারে না। দুটো জীবন বিধান মেনে চলতে পারে না। তা করতে গেলে তার স্বকীয়তা হয়ে যাবে লন্ডভন্ড এবং তার ব্যক্তিত্ব হয়ে যাবে খন্ডবিখন্ড।

যেহারের কাফফারা ও নারী নির্যাতন

নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে এই দ্ব্যর্থহীন ও আপোসহীন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর কোরআন যেহার ও পালকপুত্র গ্রহণের প্রথা বাতিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে করে সমাজ ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ সাবলীল, সুস্থ, স্বাভাবিক ও নির্মল পারিবারিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

তোমাদের যেসব স্ত্রীকে তোমাদের নিজেদের মায়ের সাথে তুলনা করো(দৈহিক সাদৃশ্য দেখাও) সেসব স্ত্রীকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মা বানাননি এবং তোমাদের পালিত পুত্রকে তোমাদের পুত্র বানাননি। .... (আয়াত ৪-৫)

জাহেলী যুগে এরূপ কুপ্রথা প্রচলিত ছিলো যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলতো, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের মতো। অর্থাৎ আমার মা যেমন আমার জন্যে নিষিদ্ধ, তুমিও তেমনি নিষিদ্ধ ও হারাম। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই সেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করা তার জন্যে অবৈধ গণ্য হতো। তারপর সেই মহিলা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকতো। সে তালাকপ্রাপ্তা বলেও বিবেচিত হতো না যে, অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করবে। বর্তমান স্বামীর স্ত্রী বলেও গণ্য হতো না যে, সে তার জন্যে বৈধ হয়ে যাবে। এটা ছিলো এক ধরনের নিষ্ঠুর নিপীড়ণ। জাহেলী যুগে নারীর প্রতি যে রকমারী যুলুম নির্যাতন ও অসদাচরণ করা হতো, এটা ছিলো তারই অংশ বিশেষ।

ইসলাম যখন পারিবারিক অংগনে সংস্কারের কাজে হাত দিলো, তখন পরিবারকে সে সমাজের প্রাথমিক একক বলে গণ্য করলো।

তাকে নতুন প্রজন্মের সূতিকাগার হিসাবে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিলো। নারীর ওপর থেকে এই যুলুমের খড়গ দূরে নিক্ষেপ করলো এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনগুলোকে একে একে ন্যায়বিচার ও মহানুভবতার বন্ধনে পরিণত করতে লাগলো। এই সংস্কারকে সে আইনে পরিণত করলো এই বলে যে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সেইসব স্ত্রীকে মা বানাননি, যাদেরকে তোমরা মায়ের মতো বলেছো।'

কেননা মুখের একটা কথা প্রকৃত সত্যকে ও বাস্তবতাকে বদলে দিতে পারে না। মা মাই থাকবে এবং স্ত্রী স্ত্রীই থাকবে। একটা কথার কারণেই সম্পর্কের প্রকৃতি পাল্টে যেতে পারে না। এ জন্যেই ইসলামী আইনে যেহার (স্ত্রীকে মায়ের মতো বলা) দ্বারা স্ত্রী হুবহু মায়ের মতো চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে যায় না- যেমনটি জাহেলী যুগে হতো।

এ কথাও বর্ণিত আছে যে, যেহার প্রথাকে আইনগতভাবে বিলুপ্ত করা হয় সূরা আল মোজাদালা নাযিল করার মাধ্যমে। হযরত আওস বিন সামেত তার স্ত্রী খাওলা বিনতে ছা'লাবার সাথে যেহার করলে খাওলা রসূল (স.)-এর কাছে এসে এভাবে অভিযোগ করেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করেছে, আমার যৌবনকে ধ্বংস করেছে এবং আমি আমার উদরকে তার জন্যে উৎসর্গ করেছি। অবশেষে যখন আমি বুড়ি হয়েছি এবং আমার সন্তান আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তখন সে আমার সাথে যেহার করেছে। রসূল (স.) বললেন, 'আমার তো মনে হচ্ছে তুমি ওর জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে গেছো।' খাওলা এরপরও তার অভিযোগ বারবার তুলে ধরতে লাগলো। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন,

'আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার বক্তব্য শুনেছেন যে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত ছিলো নিজের স্বামী সম্পর্কে .... ' (সূরা আল মোজাদালা, আয়াত ১-৪)

এভাবে যেহার দ্বারা সাময়িকভাবে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ হয়ে যায়, স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয় না কিংবা তালাকও হয় না। এর প্রতিকার বা কাফফারা হিসাবে একটা দাস বা দাসী মুক্ত করে দিতে হয়। অথবা দু'মাস একনাগাড়ে রোযা রাখতে হয় অথবা ৬০ জন দরিদ্রকে খাওয়াতে হয়। এতেই স্ত্রী তার জন্যে পুনরায় হালাল হয়ে যায়। সাবেক দাম্পত্য জীবন পুনর্বহাল হয়। বাস্তবতা ও আসল সত্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় শরীয়তের বিধান। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের যে স্ত্রীদেরকে তোমরা নিজেদের মায়ের সদৃশ্য বলেছো, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মা বানাননি।'

এভাবে সেই জাহেলী প্রথার কারণে পরিবার ভেংগে খানখান হওয়া থেকে রক্ষা পায়। সেই প্রথাটা ছিলো জাহেলী সমাজে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার অধীন সর্বব্যাপী নারী নির্যাতন, পারিবারিক জটিলতা অরাজকতা ও বিপর্যয় সৃষ্টির হাতিয়ার।(১)

---

(১) ইসলাম মানুষকে দায়িত্ব জ্ঞান উক্তি ও মন্তব্য করা থেকে দূরে রাখতে চায় বলেই 'যেহারের' জন্যে কিছু শাস্তির বিধান জারী করেছে। নিজ স্ত্রীকে নিজ মায়ের সাথে তুলনা করলে যদিও সে তার জন্মদায়িনী মা হয়ে যায় না, কিন্তু মায়ের জন্য রক্ষিত বিশেষ মর্যাদা দারুণভাবে লংঘিত হয়। এ জন্যে যদি কোনোরকম শাস্তির বিধান না রাখা হয় তাহলে সে কখনো দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে না।—সম্পাদক

পালক প্রথা রহীতকরণ

এতো গেলো যেহারের প্রথা। এরপর রয়েছে পালকপুত্র গ্রহণের প্রথা। এ প্রথার মাধ্যমে ছেলেদের আসল পিতার পরিবর্তে অন্যান্য ব্যক্তি পিতা হিসাবে পরিচিত হতো। পরিবার ও সমাজের স্বাভাবিক বন্ধন শিথিল হওয়ার কারণে এই উপসর্গটা জন্ম নিতে পেরেছিলো।

যদিও আরবীয় সমাজের সুপ্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট ছিলো এই যে, নারীর সতীত্ব ও অটুট বংশীয় ধারাবাহিকতার জন্যে তারা গৌরব করতো। কিন্তু এই গৌরবের পাশাপাশি সেই সমাজের সুপ্রসিদ্ধ বংশীয় ধারার বাইরের কিছু পরিবারে এর ঠিক বিপরীত কিছু গ্লানিময় বৈশিষ্টও দেখা যেতো।

সমাজের কিছু ছেলেমেয়ে এরূপ দেখা যেতো, যাদের পিতা কে তা কেউ জানতো না। এ ধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে কোনো একজন কারো চোখে ভালো লেগে গেলে সে তাকে নিজের সন্তান বানিয়ে নিতো এবং তাকে নিজের বংশধরের মধ্যেই গণ্য করতো। তারপর তার সাথে তার উত্তরাধিকারের সম্পর্কও গড়ে উঠতো অবিকল বংশোদ্ভূত সন্তানদের মতোই।

সেই সমাজে কিছু অনাথ ছেলেমেয়ে এমনও ছিলো, যাদের পিতৃ পরিচয় সবার জানা ছিলো। কিন্তু সেইসব ছেলেমেয়ের মধ্য থেকে কোনোটা কারো চোখে ভালো লাগলে সে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতো, নিজের সন্তানে পরিণত করতো এবং নিজের বংশধরের অন্তর্ভুক্ত করে নিতো। এরপর থেকে যে ব্যক্তি তাকে নিজের সন্তান বানিয়েছে, তারই নামে সে সমাজে পরিচিত হতো এবং তার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতো। এ ধরনের ঘটনা সাধারণত যুদ্ধবন্দী হিসাবে গৃহীত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ঘটতো। এ ধরনের শিশু কিশোরদের মধ্য থেকে যাকে কেউ নিজের বংশধরে পরিণত করতে চাইতো, সে তাকে নিজের সন্তান বানিয়ে নিতো, তার নামের সাথে নিজের নাম যুক্ত করতো এবং সন্তানসুলভ সমুদয় অধিকার ও দায়দায়িত্ব তার সাথে যুক্ত হতো।

যায়েদ বিন হারেসা কালবীও ছিলেন এ ধরনের একজন। একটা আরব গোত্র বনী কালবের বংশধর এই যায়দ জাহেলী যুগের একটা দুঃখজনক ঘটনায় বন্দী হয়ে শিশুকালেই মক্কায় আসেন। হাকীম বিন হিযাম তাঁর ফুফু হযরত খাদীজা (রা.)-এর জন্যে তাকে কিনে আনেন। পরে রসূল (স.)-এর সাথে বিয়ে হওয়ার পর খাদীজা (রা.) এই ক্রীতদাসটা রসূল (স.)-কে উপহারস্বরূপ দেন। এরপর যখন যায়েদের পিতা মাতা তাকে ফেরত চায়, তখন রসূল (স.)- যায়েদকে তার পিতামাতার সাথে চলে যাওয়া অথবা তাঁর কাছে থেকে যাওয়া-এই দুটোর যে কোনো একটা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেন। যায়েদ রসূল (স.)-এর কাছে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। রসূল (স.) তাকে প্রথমে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন, অতপর নিজের ছেলে হিসাবে গ্রহণ করেন। সেই থেকে তাকে 'যায়েদ বিন মোহাম্মাদ' বলে পরিচয় দেয়া হতো। মুক্তি পাওয়া দাসদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে ইসলাম যখন পারিবারিক বন্ধনগুলোকে তার স্বাভাবিক ভিত্তির ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, পারিবারিক সম্পর্ককে দৃঢ়তর করা এবং তাকে স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ও নির্ভেজাল করতে আরম্ভ করলো, তখন এই দত্তক গ্রহণের প্রথাকে বাতিল করলো এবং বংশীয় সম্পর্ককে তার প্রকৃত ভিত্তির ওপর দাঁড় করালো। পিতা ও সন্তানের জন্যে রক্ত সম্পর্ক ও আসল পিতা বা সন্তান হিসাবে পরিচিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা পুনর্বহাল করলো। ইসলাম ঘোষণা করলো,

'তোমাদের পালিত সন্তানদেরকে আল্লাহ প্রকৃত সন্তান বানাননি। ওটা তোমাদের মুখের কথা মাত্র।'

বস্তুত মুখের কথা বাস্তবতাকে বদলে দেয় না, রক্ত সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ককে প্রকৃত সম্পর্কে পরিণত করে না, বীর্য থেকে সৃষ্ট বংশীয় সম্পর্ক বন্ধন ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক বন্ধন

উত্তরাধিকারের যোগ্যতা সৃষ্টি করে না এবং সন্তান পিতার দেহের অংশ হলে যে স্বাভাবিক আবেগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা কোনো কৃত্রিম পিতা ও কৃত্রিম সন্তানের মধ্যে গড়ে ওঠে না।

'আল্লাহ প্রকৃত সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সঠিক পথের সন্ধান দেন।'

অর্থাৎ তিনিই সেই আসল সত্য কথা বলেন, যার সাথে বাতিলের কোনো সংমিশ্রণ নেই। আর শুধু মুখের কথা নয়, বরং রক্ত ও মাংস থেকে সৃষ্ট আসল ও অকৃত্রিম বন্ধনের ওপর যাবতীয় সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করাও সত্যের অন্তর্ভুক্ত।

'এবং তিনিই সঠিক পথের সন্ধান দেন।'

অর্থাৎ সরল, সোজা, নির্ভুল ও প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সংগতিপূর্ণ পথের সন্ধান দেন, মানুষের মুখের কথা ও অবাস্তব বক্তব্য দ্বারা যে পথ তৈরী হয়, তার ওপর আল্লাহ তায়ালা যে সত্য ও স্বাভাবিক কথা বলেন এবং যা দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান দেন, তা বিজয়ী হয়ে থাকে।

'তাদেরকে তাদের পিতৃ সহকারে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে অধিকতর ইনসাফপূর্ণ।'

বস্তুত সন্তানকে তার পিতৃ পরিচয় ধরে ডাকাই অধিকতর ন্যায়সংগত ও সুবিচার সম্মত। এটা সেই পিতার জন্যেও সুবিচার সম্মত, যার দেহের একটা জীবন্ত অংশ হিসেবেই এই সন্তানের জন্ম হয়েছে। আর সেই সন্তানের জন্যেও সুবিচারপূর্ণ যাকে তার পিতার পরিচয়ে পরিচিত করা হয় এবং উত্তরাধিকারের বিধি ব্যবস্থা প্রনয়ণ করা হয়। সে তার পিতার সাথে সহযোগিতা করে, তার সুপ্ত উত্তরাধিকারগুলো তার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় এবং তার পিতা-পিতামহদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে প্রতিফলিত হয় এটা সত্যের প্রতিও ইনসাফপূর্ণ। যা সবকিছুকে তার স্বাভাবিক অবস্থানে বহাল রাখে, প্রত্যেকটা সম্পর্ককে তার স্বাভাবিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং পিতা বা সন্তানের কোনো বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে না। এটা প্রকৃত পিতা ছাড়া আর কাউকে সন্তানের সুফল ভোগ করতে দেয় না এবং তাকে তার বৈশিষ্ট্যগুলোও দেয় না। প্রকৃত পিতাকে ছাড়া আর কাউকে সন্তানের সুফল ও কল্যাণ অর্জনের যোগ্য গণ্য করে না।

এই ব্যবস্থা পরিবারকে ভারসাম্যপূর্ণ বানায় এবং বাস্তবভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। সেই সাথে সমাজকেও একটা শক্তিশালী ও বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। কেননা এই ব্যবস্থায় সত্যের আনুকূল্য ও স্বাভাবিক সত্যের সাথে সংগতি রয়েছে। পরিবারের প্রকৃত ও স্বাভাবিক ভিত্তি যে ব্যবস্থায় অস্বীকার করা হয়, তা ব্যর্থ ও নিস্ফল ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা দুর্বল, তার ভিত্তি কৃত্রিম এবং তা টিকে থাকার অযোগ্য।(১)

যেহেতু জাহেলী যুগে পারিবারিক বন্ধনগুলো নৈরাজ্যের কবলে পড়েছে এবং যৌন অরাজকতাও ব্যাপক হয়ে পড়েছে, আর সে কারণে বংশীয় ধারায় ভেজালের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং অনেক সময় শিশু-কিশোরের পিতৃ পরিচয় জানা যায় না, একারণেই ইসলাম ব্যাপারটাকে সহজ করে দিয়েছে এবং যাদের প্রকৃত পিতৃ পরিচয় পাওয়া যায় তাদেরকে ইসলামী সমাজে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামী বন্ধুত্বের ভিত্তিতে ঠাঁই করে দিয়েছে। কেননা পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনই তার মূল লক্ষ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যদি তাদের পিতার পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই ও বন্ধু।'

---

(১) কম্যুনিজম সমাজ গঠনে পারিবারিক ভিত্তিকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছিলো। ফলে নিজেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। সকল বজ্র আটুনীকে ব্যর্থ করে দিয়ে রাশিয়ায় স্বাভাবিক পারিবারিক ভিত্তি বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে এবং ক্রমান্বয়ে তা সমাজকে নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে ফিরে আসছে।

এটা হচ্ছে নিছক নৈতিক ও আন্তরিক সম্পর্ক। এ দ্বারা কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় না। যেমন উত্তরাধিকারের বাধ্যবাধকতা রক্তপণ পরিশোধের ব্যাপারে সামষ্টিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ, রক্ত সম্পর্কের ন্যায় বংশীয় বন্ধনের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় না, যা দত্তক গ্রহণে আরোপিত হতো। এ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো যে, দত্তক প্রথা বিলুপ্তির পর এসব বেওয়ারিশ ও ভাসমান জনগোষ্ঠী যেন সমাজে ছিন্নমূল হয়ে না থাকে।

'যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো' এই উক্তিটা থেকে চিত্তপটে জাহেলী সমাজের একটা উচ্ছৃংখল ছবি এবং নারী পুরুষের সম্পর্কের অরাজকতার চিত্র ভেসে ওঠে। ইসলাম এই অরাজকতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতার প্রতিকার করেছে পিতা শাসিত পরিবার প্রতিষ্ঠা এবং পবিত্র ও নির্মল পরিবারভিত্তিক সমাজ গড়ার মাধ্যমে।(১)

সঠিক বংশ পরিচয় ও বংশীয় ধারাবাহিকতা পুন প্রতিষ্ঠার যথাসাধ্য চেষ্টা করার পর যেসব ক্ষেত্রে সঠিক বংশ পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয় না, সে সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের ওপর কোনো দায়িত্ব বর্তে না।

'তোমরা যে ক্ষেত্রে ভুল করো। সে ক্ষেত্রে তোমাদেরকে কোনো দোষারোপ করা হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার দায় থেকে রেহাই নেই।'

এই মহানুভবতার কারণ হলো আল্লাহর দয়াশীলতা ও ক্ষমাশীলতা বর্ণনা করা। তিনি মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ করতে বাধ্য করেন না,

'আল্লাহ তায়ালা দয়াশীল ও ক্ষমাশীল।'

জাহেলী সমাজের অনিয়মতান্ত্রিকতার প্রভাব ঝেড়ে মুঝে ফেলে সমাজ পুনর্গঠনের ওপর রসূল (স.) সর্বাত্মক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং যারা প্রকৃত বংশীয় পরিচয় গোপন করে, তাদেরকে কুফরির পথ অবলম্বনকারী বলে তিরস্কার করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার পরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে অধিকতর ইনসাফপূর্ণ। আর যদি তাদের পিতার পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের ইসলামী ভাই ও বন্ধু' .... আমিও এমন এক ব্যক্তি, যার পিতা অজ্ঞাত। কাজেই আমি তোমাদের দ্বীনী ভাই।'

উয়াইনা বিন আবদুর রহমান বলেছেন, 'আল্লাহর কসম, আমি মনে করি, আবু বকর যদি জানতো যে তার পিতা একটা গাধা ছিলো, তবে সে তাকেই পিতা বলে মেনে নিতো। কারণ হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি জেনে-শুনে নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে, সে কুফরি করে।' পরিবারকে ও পারিবারিক সম্পর্ককে যাবতীয় সন্দেহ সংশয় থেকে রক্ষা করা এবং

---

(১) এ অবৈধ সন্তানের বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার কোলে লালিত মানুষগুলো যে কি বিপদ-মুসীবতে আছে তা আজকের ইউরোপ আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালে সহজেই অনুভব করা যায়। এই বিষয়টি এতো ব্যাপক যে, একটি ক্ষুদ্র টীকা দিয়ে এখান তা শেষ করা যাবে না। ইউরোপের সর্বশেষ জরীপ অনুযায়ী একমাত্র ইংল্যান্ডেই শতকরা ৩৪ ভাগ শিশু এমন আছে, যাদের হাসপাতালের নথিপত্রে ও স্কুলের খাতায় পিতার কোনো পরিচয় নেই। ইদানীং সে সমাজের চিন্তা নায়করা অবৈধ প্রজন্মের এ বিশাল বাহিনী নিয়ে দারুণ চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। সোস্যাল সিকিউরিটী, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও হাসপাতালের বিভাগগুলো এ সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গিয়ে দারুণভাবে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মনে হয় গোটা সভ্যতার প্রাসাদ আজ ভেংগে খান-খান হয়ে যাবে। প্রতিদিন এব্যাপারে আমাদের সামনে এতো তথ্য আসছে যে, আমি কোনো এক দুটো বইয়ের নাম লিখে বিষয়টিকে সংকুচিত করতে চাই না। উৎসাহী পাঠকরা এই বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে চাইলে সহজেই তা পেয়ে যাবেন।–সম্পাদক

নিরাপত্তা, ও দৃঢ়তার যাবতীয় উপকরণ দ্বারা তার প্রাচীরকে শক্তিশালী ও মযবুত করার ওযর ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে বলেই এ ব্যাপারে এতো কঠোর বক্তব্য দিয়েছে। কেননা এই নিখুঁত ও নির্মল পরিবার দিয়েই সে পবিত্র ও সৎ সমাজ গড়তে সংকল্পবদ্ধ।

মোহাজের ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

এরপর ইসলাম দত্তক গ্রহণের প্রথার ন্যায় আনসার ও মোহাজেরদের ভাই ভাই বানানোর প্রথাও বাতিল করে। এই ভাই ভাই প্রথাটা জাহেলী প্রথা ছিলো না, বরং হিজরতের পর ইসলামই এটা প্রবর্তন করেছিলো। যে সমস্ত মোহাজের তাদের সহায়-সম্পদ ও আপনজনদেরকে মক্কায় রেখে এসেছিলো এবং যে সকল মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণের কারণে নিজ নিজ পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো, তাদেরকে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাহায্য করাই ছিলো এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। অবশ্য এর পাশাপাশি রসূল (স.)-কে সকল মুসলমানের সাধারণ অভিভাবক হিসাবে বহাল রাখা, তাঁর অভিভাবকত্বকে যাবতীয় বংশীয় সম্পর্কের চেয়ে অগ্রগণ্য নির্ধারণ করা এবং তাঁর স্ত্রীদেরকে সমগ্র মুসলিম জাতির মা বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নবী (স.) মোমেনদের জন্যে তাদের নিজেদের চেয়ে অধিকতর অভিভাকত্বের অধিকারী। আর তার স্ত্রীরা তাদের মা।........ (আয়াত ৬)

মোহাজেররা যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন, তখন তারা তাঁদের যাবতীয় সহায়-সম্পদ সেখানে পরিত্যাগ করে চলে যান। একমাত্র প্রাণপ্রিয় দ্বীন ইসলামকে সম্বল করে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা তাদের যাবতীয় আত্মীয়তার বন্ধন, ধন সম্পদ, জীবন-যাপনের উপকরণ, জন্মভূমিতে শৈশব ও বাল্যকালের অসংখ্য স্মৃতি এবং বন্ধু ও প্রিয়জনদের প্রীতি ও ভালবাসাকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আকীদা ও আদর্শকে সাথে নিয়ে এবং আকীদা ও আদর্শ ছাড়া অন্য সবকিছু ত্যাগ করে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। এ ধরনের হিজরতের মাধ্যমে এবং স্বামী-স্ত্রী সন্তানসহ সকল প্রিয়জনকে ত্যাগ করে এভাবে দেশান্তরী হওয়ার মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে নিজেদের আকীদা ও আদর্শের পূর্ণাংগ বাস্তবায়ন, তাদের অন্তরে এই আদর্শের সর্বাত্মক আধিপত্য ও সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মানব সত্ত্বা ও মানব জীবনের অখন্ড একত্ব প্রতিষ্ঠার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তারা প্রমাণ করলেন যে, তাদের অন্তকরণে ইসলাম ছাড়া আর কোনো কিছুর বিন্দুমাত্রও স্থান নেই এবং আল্লাহর এই কথা অকাট্যভাবে সত্য প্রমাণিত হলো যে, 'আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দুটো অন্তকরণ সৃষ্টি করেননি।'

মদীনাতেও একটু ভিন্ন আকারে একই ধরনের ঘটনা ঘটলো, বিভিন্ন পরিবারের কিছু সদস্য এককভাবে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং অন্যান্য সদস্যরা শেরেকের ওপর বহাল রইলো। ফলে মুসলিম সদস্যদের সাথে অমুসলিম সদস্যদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। সামগ্রিকভাবে পারিবারিক বন্ধনে একটা চিড় ধরলো। আর সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা দিলো আরো বড়ো রকমের ফাটল।

এ সময় ইসলামী সমাজ ছিলো একটা সদ্যজাত সমাজ। আর নবীন ইসলামী রাষ্ট্র যতোটা ছিলো পরিস্থিতি নির্ভর একটা শাসন ব্যবস্থা, মদীনাবাসীর মনে তার চেয়ে তার আদর্শিক ভাবমূর্তি অনেক বেশী জোরালো প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছিলো।

এ কারণে এই নতুন মতাদর্শের পক্ষে একটা তীব্র ভাবাবেগের জোয়ার বইতে শুরু করলো। সে জোয়ার অন্য সমস্ত আবেগ অনুভূতি, ঐতিহ্য ও সমাজরীতি এবং সম্পর্ক ও বন্ধনকে ভাসিয়ে

নিয়ে গেলো। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, এই নতুন মতাদর্শই হয়ে দাঁড়ালো সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয়তা ও অন্তরংগতা সৃষ্টির একমাত্র উৎস। একই সাথে যাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে নিজ নিজ গোত্র ও পরিবারের সাথে তাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো, তাদের পরস্পরের মধ্যে ইসলামই রচনা করলো একমাত্র আত্মীয়তার বন্ধন। ইসলামী বন্ধন তাদের মধ্যে রক্ত, বংশ, স্বার্থ, বন্ধুত্ব, স্বজাত্য ও ভাষাগত বন্ধনের স্থলাভিষিক্ত হলো। ইসলাম গ্রহণকারী এসব বিচ্ছিন্ন সদস্যকে ইসলাম ঐক্যবদ্ধ করলো এবং এমন একটা দলে পরিণত করলো, যার সদস্যরা সত্যিকার অর্থে পরস্পরের সহযোগী, পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ, পরস্পরের প্রতি একাত্ম ও পরস্পরের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানকারী। এ কাজটা সে সম্পন্ন করলো কোনো আইন জারী করে নয়, কিংবা কোনো রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক আদেশ বলেও নয়, একটা আভ্যন্তরীণ প্রেরণা ও আবেগ উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করার মাধ্যমে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে যে ধরনের আবেগ উদ্দীপনার সাথে পরিচিত, এ উদ্দীপনা ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র, প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য। এই ভিত্তির ওপরই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো। অথচ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এ কাজ করা ও বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থার ওপর শক্তি প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার মতো ক্ষমতা তখনো তাদের আয়ত্তে আসেনি।

মক্কার মোহাজেররা মদীনার আনসারদের অতীথি হলেন। আনসাররা তার আগে থেকেই মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তারা ঈমানও এনেছিলেন তাদের আগমনের আগেই। তারা মোহাজেরদেরকে শুধু তাদের বাড়ী ঘরেই ঠাই দিলেন তা নয়, বরং অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিলেন এবং তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকেও তাদেরকে অংশ দিলেন। কে কাকে নিজের ঘরে তুলবে তা নিয়ে এতো প্রতিযোগিতা হলো যে, লটারী ছাড়া কোনো মোহাজের কোনো আনসারের বাড়ীতে উঠতেই পারেননি। কারণ আশ্রয় দিতে আগ্রহী আনসারদের তুলনায় মোহাজেরদের সংখ্যা ছিলো কম। তারা স্বেচ্ছায়, সানন্দে ও স্বতস্ফূর্তভাবে এবং স্বভাবগত ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার ও লোক দেখানোর প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকেই এই মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করেন। রসূল (স.) কিছুসংখ্যক মোহাজের ও আনসারের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম বা মতাদর্শের অনুসারীদের মধ্যে কখনো এ ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন নযীর ইতিহাসে নেই। এ ভ্রাতৃত্ব অবিকল রক্ত সম্পর্কীয় ভ্রাতৃত্বের সমপর্যায়ের ছিলো। কেননা বংশীয় সম্পর্কের কারণে উত্তরাধিকার ও রক্তপণসহ যেসব দায়-দায়িত্ব ও অধিকার জন্ম নিয়ে থাকে, তার সবই এর আওতাভুক্ত ছিলো।

এ ক্ষেত্রে আবেগের প্রাবল্য সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়। মুসলমানরা এই নতুন সম্পর্ককে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। ইসলাম এ ব্যাপারে যা কিছু নীতি ও নির্দেশনা দিয়েছে, তার সবই তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। ইসলামী সমাজ ও তার নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণে এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রীয়, আইনগত ও সামাজিক বন্ধনে পর্যবসিত হয় বরং এর শক্তি ছিলো আরো বেশী। যে ব্যতিক্রমধর্মী জটিল পরিস্থিতিতে এই ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। সে পরিস্থিতিতে এই নবগঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংহতি নিশ্চিত করার জন্যে এটা ছিলো অপরিহার্য।

যখনই কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠী এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হবে, তখনই এ ধরনের চেতনা ও ভাবাবেগের জোয়ার সৃষ্টি করা জরুরী হয়ে পড়বে এবং তাদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর স্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী সমাজ ও ইসলামী আইন-কানুন চালু না হওয়া পর্যন্ত এই জোয়ার অব্যাহত রাখতে হবে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত উক্ত জনগোষ্ঠীর রক্ষণাবেক্ষণ ও অগ্রগতির জন্যে রাষ্ট্রীয় ও আইনগতভাবে বিশেষ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

ইসলাম যদিও এ ধরনের আবেগ-উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি এবং মুসলমানদের অন্তরে এর উৎসগুলোর স্থায়িত্ব ও সার্বক্ষণিক সক্রিয়তা বহাল রাখতে উদগ্রীব, কিন্তু সে এর ভিত্তিকে জনগণের স্বাভাবিক শক্তি ও মনোবলের ওপর দাঁড় করাতেও ইচ্ছুক। সাময়িক আবেগ উত্তেজনার কার্যকারিতাও ক্ষণস্থায়ী ও নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই বিশেষ জরুরী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে স্বাভাবিক পর্যায়ে স্থির হয়ে যায় এবং শান্ত অবস্থা ফিরে আসে।

এ জন্যেই বদর যুদ্ধের পর যখনই মদীনার পরিস্থিতি শান্ত, স্বাভাবিক ও স্থীতিশীল হলো, সার্বিক পরিস্থিতি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুকূলে এসে গেলো এবং আংশিকভাবে হলেও সামাজিক স্থীতাবস্থা বহাল হলো, যুক্তিসংগত ছোট খাট সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এতোটা সম্পদ অর্জিত হলো যে, মুসলমানরা সকলেই মোটামুটি স্বনির্ভর হয়ে উঠলেন, বিশেষত ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকার নির্বাসনের পর মুসলমানরা যখন বেশ সচ্ছল হয়ে উঠলেন, তখন এতটুকু নিরাপদ পরিস্থিতি পুনর্বহাল হওয়া মাত্রই কোরআন ভ্রাতৃত্ব ব্যবস্থার রক্ত সম্পর্কীয় ও বংশীয় পর্যায়ের দায় দায়িত্বের আইনগত বাধ্যবাধকতা বাতিল করে দিলো। তবে নৈতিক ও চেতনাগত পর্যায়ে তা বহাল রাখলো, যাতে প্রয়োজন দেখা দিলে পুনরায় তা কার্যকর হতে পারে। মুসলিম সমাজের উত্তরাধিকার ও রক্তপণের দায়-দায়িত্বকে রক্তীয় ও বংশীয় সম্পর্কের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করাসহ যাবতীয় বিষয়কে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলো, ঠিক যেমনটি তা আল্লাহর আদি গ্রন্থে ও তার প্রাকৃতিক বিধানে মৌলিকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে অভিভাবকত্বে মোমেন ও মোহাজেরদের চেয়ে অধিকতর যোগ্য। কেতাবে এটাই লিখিত ছিলো।'

নবীর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা ঈমানের শর্ত

তবে এই সাথে সাধারণ অভিভাবকত্ব রসূল (স.)-এর জন্যে বহাল রাখা হয়। এ অভিভাবকত্ব রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার চেয়েও অগ্রগণ্য। এমনকি প্রত্যেক মুসলমানের নিজের চেয়েও অগ্রগণ্য। 'নবী মোমেনদের জন্যে তাদের নিজেদের চেয়েও উত্তম অভিভাবক' এই কথাটার মধ্য দিয়ে এই বক্তব্যই ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া রসূল (স.)-এর স্ত্রীদেরকেও সকল মুসলমানের মায়ের আসনে বসানো হয়েছে সচেতনভাবে। বলা হয়েছে,

'তাঁর স্ত্রীরা হচ্ছেন তাদের মা।'

রসূল (স.)-এর অভিভাবক হচ্ছে সর্বাত্মক ও সার্বজনীন অভিভাকত্ব। মানুষের সমগ্র জীবন, তার সকল দিক ও বিভাগসহ এর আওতাভুক্ত। ফলে মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র রসূল (স.)-এর কাছে ন্যস্ত। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীর আলোকে যে সিদ্ধান্ত দেবেন। সেটাই তাদেরকে শর্তহীনভাবে মাথা পেতে নিতে হবে, নিজেরা স্বাধীনভাবে কোনো স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। রসূল (স.) বলেছেন,

'তোমাদের কেউ ততোক্ষণ মোমেন হতে পারবে না, যতোক্ষণ তার আবেগ-অনুভূতি আমার আনীত বিধানের অনুসারী না হবে।'

রসূল (স.)-এর অভিভাবকত্বের আওতাধীন মুসলমানদের আবেগ অনুভূতিও। তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব তাদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও প্রিয়। তাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব, অন্য কারো ব্যক্তিত্ব বা অন্য কোনো জিনিস কোনো অবস্থাতেই তাদের কাছে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বের চেয়ে অগ্রাধিকার পেতে পারে না। সহীহ বোখারীতে বর্ণীত হয়েছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহর

কসম, তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না, যতোক্ষণ আমি তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের চেয়ে, সহায় সম্পদের চেয়ে, সন্তান সন্ততির চেয়ে এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হবো।' সহীহ বোখারীর আরো একটা হাদীসে আছে যে, হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, আপনি আমার কাছে সব কিছুর চেয়ে প্রিয়, তবে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় নন।' রসূল (স.) বললেন, না, হে ওমর, আমি যতোক্ষণ তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় না হবো, ততোক্ষণ তুমি মোমেন হতে পারবে না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'আল্লাহর কসম, আপনি আমার কাছে সব কিছুর চেয়ে প্রিয়, এমনকি আমার প্রাণের চেয়েও।' রসূল (স.) বললেন, এবার ঠিক আছে, হে ওমর।'

এটা শুধু কথার কথা নয়। এটা হচ্ছে সেই সুউচ্চ স্তর, যেখানে মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া পৌছা সম্ভব নয়। এই প্রত্যক্ষ সাহায্যই তাকে এতো উচ্চ ও উজ্জ্বল শীর্ষবিন্দুতে পৌছাতে পারে। এখানে সে যাবতীয় ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। বস্তুত মানুষ নিজ সত্ত্বা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় জিনিসকে এতো ভালোবাসে, যা কল্পনা ও উপলব্ধিরও উর্ধ্বে, অনেক সময় তার মনে হয়, সে তার আবেগকে সংযত করেছে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নিজেকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে, তা সে কমিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যখনই তার আত্মসম্মানে সামান্যতম আঘাতও আসে, অমনি সে এমনভাবে ঘাবড়ে যায় যেন তাকে সাপে কামড় দিয়েছে। এই আঘাতে সে এতো যন্ত্রণা ও অপমান অনুভব করে, যে তার কোনো প্রতিক্রিয়া সে ব্যক্তই করতে পারে না। প্রতিক্রিয়া যেটুকু হয়, তা তার অনুভূতিতেই সুপ্ত থাকে এবং হৃদয়ের গভীরতম প্রকোষ্ঠে নিমজ্জিত থাকে। কখনো কখনো সে তার গোটা জীবনকেই বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়, অথচ তার ব্যক্তিত্বে এমন সামান্যতম স্পর্শও সে সহ্য করতে পারে না, যা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে বলে তার কাছে মনে হয়, কিংবা তার কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি নিন্দা-ধিক্কার দেয় বলে মনে হয়, অথবা তার কোনো আচার-আচরণের সমালোচনা করে বলে মনে হয়। এ ধরনের কোনো নিন্দা সমালোচনায় তার কিছুই এসে যায় না বলে দাবী করা সত্তেও এই অসুহিষ্ণুতার ভার তার মধ্যে যথারীতি অক্ষুণ্ন থাকে। এমন গভীর আত্মপ্রেমকে নিয়ন্ত্রণ করা শুধু কথার কথা নয়, বরং একটা অতি উচ্চ ও উন্নত স্তর, যেখানে আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া কেউ পৌঁছতে পারে না। আর আল্লাহর এই সাহায্য দীর্ঘ ও নিরন্তর চেষ্টা সাধনা, অব্যাহত সচেতনতা ও আন্তরিক আগ্রহের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

এই চেষ্টা সাধনাকে রসূল (স.) সবচেয়ে বড়ো জেহাদ নামে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত ওমরের (রা.) ন্যায় ব্যক্তিরও এই জেহাদে রসূল (স.)-এর পথ নির্দেশনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো এবং এই পথনির্দেশনাই তার নির্মল অন্তকরণকে অর্গলমুক্ত করেছিলো। মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও এই সার্বজনীন অভিভাবকত্বের আওতায় পড়ে। সহীহ বোখারীর এক হাদীসে রসূল (স.) বলেন, 'দুনিয়া ও আখেরাতে প্রত্যেক মোমেনের জন্যে আমিই সর্বোত্তম অভিভাবক। ইচ্ছা হলে তোমরা সূরা সেজদার এই আয়াতটা পড়ে দেখতে পারো, 'নবী হচ্ছেন মোমেনদের জন্যে তাদের নিজেদের চেয়েও উত্তম অভিভাবক।' সুতরাং কোনো মোমেন যদি কিছু ধন সম্পত্তি রেখে মারা যায়, তবে তার জীবিত রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি ঋণ অথবা ক্ষয়ক্ষতি রেখে যায়, তবে তার উত্তরাধিকারী যেন আমার কাছে আসে। কেননা আমিই তার অভিভাবক।' অর্থাৎ সে যদি ঋণ পরিশোধ করার উপযুক্ত কোনো ধন সম্পদ রেখে না যায়। তবে তিনিই তা পরিশোধ করবেন এবং তার রেখে যাওয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ভরণ-পোষণও করবেন।

এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সামষ্টিক জীবন স্বাভাবিকভাবেই চলবে, কোনো আবেগ উদ্দীপ্ত আন্দোলনের বা অস্বাভাবিক কোনো গণবিস্ফোরণের প্রয়োজন দেখা দেবে না। ভ্রাতৃত্ব চুক্তি বাতিলের পর মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মমত্ব বহাল থাকবে। তাই যে কোনো অভিভাবক তার পালিতকে নিজের মৃত্যুর পরে দান করার জন্যে ওসিয়ত করতে পারে কিংবা জীবদ্দশায় কোনো সম্মতি প্রদান করতে পারে। এতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। এ কথাই আয়াতের একাংশে এভাবে বলা হয়েছে,

'তবে তোমাদের পালিতকে যদি কিছু সৌজন্য প্রদর্শন করতে চাও, তবে সেটা ভিন্ন কথা।'

আর এই সমুদয় ব্যবস্থাকে প্রথমোক্ত মূলনীতির সাথে যুক্ত করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে, এটা আল্লাহর আদি পুস্তকে লিখিতভাবে বিদ্যমান সিদ্ধান্ত। 'এটা কেতাবে লিখিত ছিলো।' এভাবে মুসলমানদের মনকে শান্ত ও তৃপ্ত করা হচ্ছে এবং সেই মহান ঐশী মূলনীতিকে ধারণ করা হচ্ছে, যার আওতায় সব আইন প্রণয়ন ও সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বস্তুত এভাবেই মানব জীবনকে তার স্বাভাবিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তা সহজ সরল ও প্রশান্ত গতিতে চলতে থাকে। সীমিত ও ব্যতিক্রমী কোনো কোনো অবস্থায় ছাড়া ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক জীবনের কোথাও কোনো অচলাবস্থা বা অরাজকতার সৃষ্টি হয় না।

নবীদের কাছ থেকে আনুগত্যের অংগীকার গ্রহণ

অতপর যদি কখনো মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনে কোনো গণচেতনা বা গণঅভ্যুত্থানের জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে ইসলাম তার সেই শক্তিশালী উৎসটাকেও সে জন্যে খোলা রেখে দেয়।

আল্লাহর কেতাবে তাঁর যে আদি ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত লিখিত রয়েছে এবং যা পরবর্তীতে বিশ্ব প্রকৃতিতে কার্যকর চিরস্থায়ী নিয়ম ও বিধানে পরিণত হয়েছে, সেই ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে পরবর্তী আয়াতে সাধারণ ও বিশিষ্ট নবীদের কাছ থেকে আল্লাহর গৃহীত অংগীকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে এই মর্মে অংগীকার নেয়া হয়েছিলো যে, তারা আল্লাহর জারীকৃত এই বিধানকে নিজ নিজ জাতির কাছে প্রচার ও বাস্তবায়ন করবেন ও তাতে দৃঢ়চেতা ও আপোষহীন থাকবেন, যাতে মানুষকে তাদের হেদায়াত লাভ অথবা ভ্রষ্টতা এবং ঈমান আনয়ন কিংবা কুফরি অবলম্বনের ব্যাপারে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। কেননা নবীরা ইতিপূর্বেই তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি নবীদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলোম ....' (আয়াত ৭-৮)

আসলে এটা হযরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চালু থাকা একই অংগীকার, একই বিধান এবং একই আমানত-যা প্রত্যেক নবী নিজে গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী নবীর কাছে হস্তান্তর করে গেছেন।

আয়াতের প্রথমাংশে প্রথমে সাধারণভাবে সকল নবীর কথা বলা হয়েছে যে, 'আমি নবীদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম .... ' অতপর পবিত্র কোরআনের ও সারা পৃথিবীতে দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহানবীর কথা বলা হয়েছে, 'এবং তোমার কাছ থেকে,' অতপর শেষ নবীর পূর্ববর্তী প্রধান প্রধান নবীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, 'এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসার কাছ থেকে।'

যাঁদের কাছ থেকে অংগীকার গ্রহণ করা হয়েছে তাদের বিবরণ দেয়ার পর কেমন অংগীকার নেয়া হয়েছে, তার বিবরণ দিয়ে বলা হচ্ছে, 'আমি তাদের কাছ থেকে জোরদার অংগীকার নিয়েছি।' 'মীসাক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'পাকানো দড়ি বা রশী'। শব্দটার রূপক প্রয়োগ হয়েছে অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি অর্থে। অন্যদিক দিয়ে এতে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, শ্রোতার উদ্দীপনা ও আবেগকে শাণিত করে তোলে। অর্থাৎ এটা সেই মজবুত চুক্তি, যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর মনোনীত প্রিয় বান্দাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে, যেন তারা তাঁর ওহী পাওয়ার পর অন্যদের কাছে পৌছানো এবং বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার সাথে তা বাস্তবায়িতও করেন।

'যেন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন ....'

এই সত্যবাদী অর্থ ঈমানদাররা। তারা সত্য কথা বলেছে এবং সত্য আকীদাকে গ্রহণ করেছে। তারা ছাড়া আর সবাই মিথ্যাবাদী। কেননা তারা বাতিল কথা বলে ও বাতিল মতবাদে বিশ্বাস করে। তাই এরই 'সত্যবাদী' বিশেষণটা তাৎপর্যপূর্ণ। কেয়ামতের দিন এই সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা শিক্ষক কর্তৃক কৃতকার্য ও উত্তীর্ণ ছাত্রকে তার সেই উত্তর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার সাথে তুলনীয়, যে উত্তর দিয়ে সে গৌরবময় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে। এ প্রশ্ন করা হবে কেয়ামতের মাঠে সমবেত সকলের সামনে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্যে।

পক্ষান্তরে যারা মিথ্যুক ও বাতিলপন্থী, যারা আকীদার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছে। তাদের কর্মফল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সে কর্মফল তাদের অপেক্ষায় রয়েছে,

'তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

بَصِيْرًا ﴿٩﴾ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ

وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ

الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾ وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ

وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢﴾ وَاِذْ

قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ

فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚۛ اِنْ

يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ

রুকু ২

৯. হে (মানুষ), তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদের ওপর আল্লাহ তায়ালার (সে) অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রু সৈন্য তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো, অতপর আমি তাদের ওপর এক প্রচন্ড বায়ু প্রেরণ করেছি এবং (তাদের কাছে) পাঠিয়েছি এমন সব সৈন্য, যাদের তোমরা কখনো দেখতে পাওনি; তোমরা তখন যা কিছু করছিলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা দেখছিলেন, ১০. যখন তারা তোমাদের ওপর থেকে, তোমাদের নীচ থেকে তোমাদের ওপর (হামলা করার জন্যে) আসছিলো, যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে পড়েছিলো, প্রাণ হয়ে পড়েছিলো কণ্ঠাগত এবং (আল্লাহর সাহায্যে বিলম্ব দেখে) তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানা রকমের ধারণা করতে লাগলে! ১১. সে (বিশেষ) সময়ে ঈমানদাররা চরমভাবে পরীক্ষিত এবং তারা মারাত্মকভাবে কম্পিত হয়ে পড়েছিলো। ১২. সে সময় মোনাফেক এবং যাদের মনে (সন্দেহের) ব্যাধি ছিলো তারা বলতে লাগলো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা (মূলত) প্রতারণা বৈ কিছুই ছিলো না। ১৩. (বিশেষ করে,) যখন তাদের একটি দল (এসে) বললো, হে ইয়াসরেবের অধিবাসীরা, (আজ শত্রু বাহিনীর সামনে) তোমাদের দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা নেই, অতএব তোমরা ফিরে যাও, (এমনকি) তাদের একাংশ (তোমার কাছে এই বলে) অনুমতিও চাইছিলো যে, আমাদের বাড়ীঘরগুলো সবই অরক্ষিত রয়েছে (তাই আমরা ফিরে যেতে চাই), অথচ (আল্লাহ তায়ালা জানেন) তা অরক্ষিত ছিলো না; (আসলে ময়দান থেকে) এরা শুধু পালাতে চেয়েছিলো। ১৪. যদি শত্রু দল নগরীর চারপাশ থেকে ওদের ভেতর প্রবেশ করতো এবং

لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ

قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ، وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ

الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ

رَحْمَةً ، وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ

اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ، وَلَا يَاْتُوْنَ

الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ، فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ

اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ، فَاِذَا ذَهَبَ

الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ، اُولٰٓئِكَ

(যারা মোনাফেক) তাদের যদি (বিদ্রোহের) ফেতনা খাড়া করার জন্যে বলতো, তবে তারা নির্দ্ধিধায় তাও মেনে নিতো, এ ব্যাপারে তারা মোটেই বিলম্ব করতো না। ১৫. অথচ এ লোকেরাই ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালার সাথে ওয়াদা করেছিলো, তারা (কখনো ময়দান থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না (তাদের জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালার (সাথে সম্পাদন করা) ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ১৬. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, যদি তোমরা মৃত্যু থেকে পালাতে চাও অথবা (কেউ তোমাদের) হত্যা (করবে এ কারণে পালাতে চাও), তাহলে এই পালানো তোমাদের কোনোই উপকার দেবে না, (আর যদি কোনোরকম পালিয়ে যেতে সক্ষমও হও) তাহলেও তো সামান্য কয়দিনের উপকারই ভোগ করতে দেয়া হবে মাত্র। ১৭. (হে নবী,) যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কোনো অমংগল করতে চান অথবা চান তোমাদের কোনো মংগল করতে, তাহলে (এ উভয় অবস্থায়) তুমি বলো, এমন কে আছে যে তোমাদের আল্লাহ তায়ালা (-র সিদ্ধান্ত) থেকে বাঁচাতে পারবে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতিরেকে এরা (সেদিন) না পাবে কোনো অভিভাবক, না পাবে কোনো সাহায্যকারী; ১৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব (মোনাফেক) লোকদের চেনেন, যারা (অন্যদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে) বাধা দেয় এবং তাদের ভাই বন্ধুদের বলে, তোমরা আমাদের কাছে এসে যাও, (আসলে) ওদের অল্প সংখ্যক লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে! ১৯. (যে কয়জন এসেছে তারাও) তোমাদের (বিজয়ের) ওপর কুণ্ঠিত থাকে, অতপর যখন (তোমাদের ওপর) কোনো বিপদ আসে, তখন তুমি তাদের দেখবে তারা চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোনো ব্যক্তির ওপর মৃত্যু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু (যখন তোমরা বিজয় লাভ করো) তখন এরাই (গনীমতের) সম্পদের ওপর লোভী হয়ে তোমাদের সাথে বাকচাতুরী শুরু করে;

لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢٠﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ز وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز صلے وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ لِّيَجْزِىَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ

(আসলে) এ লোকগুলো কিন্তু কখনো ঈমান আনেনি, আল্লাহ তায়ালা (তাই) ওদের সব কাজই বিনষ্ট করে দিয়েছেন; আর এ কাজটা তো আল্লাহ তায়ালার জন্যে অত্যন্ত সহজ। ২০. (অবরোধ প্রত্যাহার সত্ত্বেও) এরা মনে করে (এখনো) শত্রু বাহিনী চলে যায়নি এবং শত্রুপক্ষ যদি (আবার) এসে চড়াও হয়, তখন এরা মনে করবে, কতো ভালো হতো যদি তারা (মরুভূমির) বেদুঈনদের সাথে (ওখানেই) থেকে যেতে পারতো এবং (সেখানে বসেই ফিরে আসা নিরাপদ কিনা) তোমাদের এ খবর নিতে পারতো, যদিও এরা (এখনও) তোমাদের মাঝে আছে, (কিন্তু) এরা খুব কম লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।

রুকু ৩

২১. (হে মুসলমানরা,) তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রসূলের (জীবনের) মাঝে (অনুকরণযোগ্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের (মুক্তির) আশা করে, (সর্বোপরি) সে বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে; ২২. (খাঁটি) ঈমানদাররা যখন (শত্রু) বাহিনীকে দেখলো, তখন তারা বলে উঠলো, এ তো হচ্ছে তাই, যার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের কাছে আগেই করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল অবশ্যই সত্য কথা বলেছেন, (এ ঘটনার ফলে) তাদের ঈমান ও আনুগত্যের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেলো; ২৩. ঈমানদারদের মাঝে কিছু লোক তো এমন রয়েছে যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে (জীবনবাজির) যে ওয়াদা করেছিলো তা সত্য প্রমাণ করলো, তাদের কিছু সংখ্যক (মানুষ) তো নিজের কোরবানী পূর্ণ (করে শাহাদাত লাভ) করলো, আর কেউ এখনো (শাহাদাতের) অপেক্ষা করছে, তারা তাদের (আসল) লক্ষ্য কখনো পরিবর্তন করেনি, ২৪. (যুদ্ধ তো এ জন্যেই যে,) এতে করে সত্যবাদীদের আল্লাহ তায়ালা

إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

তাদের সত্যবাদিতার পুরস্কার দেবেন, আর মোনাফেকদের তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন কিংবা তিনি তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, ২৫. আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের তাদের (যাবতীয়) ক্রোধসহ (এমনিই মদীনা থেকে) ফিরিয়ে দিলেন, (এ অভিযানে) তারা কোনো কল্যাণই লাভ করতে পারেনি; আল্লাহ তায়ালাই (এ) যুদ্ধে মোমেনদের জন্যে যথেষ্ট প্রমাণিত হলেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা প্রবল শক্তিমান ও পরাক্রমশালী, ২৬. আহলে কেতাবদের মধ্যে যারা (এ যুদ্ধে) তাদের সাহায্য করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরও দূর্গ থেকে অবতরণ করালেন এবং তাদের অন্তরে (মুসলমানদের সম্পর্কে এমন) ভীতির সঞ্চার করালেন যে, (আজ) তোমরা (তাদের) এক দলকে হত্যা করছো, আরেক দলকে বন্দী করছো, ২৭. তিনি তোমাদের তাদের যমীন, বাড়ীঘর ও সহায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন, (আল্লাহ তায়ালা এর ফলে তোমাদের) এমন সব ভূখন্ডেরও (অধিকারী বানিয়ে দিলেন) যেখানে তোমরা এখনো কোনো (সামরিক) অভিযান পরিচালনাই করোনি; (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপর (একক) ক্ষমতাবান।

তাফসীর
আয়াত ৯-২৭

সেকালে যুদ্ধ বিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ইসলামী ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিলো। দিনের পর দিন ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটতে থাকায় এই ব্যক্তিত্ব অধিকতর পরিপক্কতা অর্জন করতো, উৎকর্ষ লাভ করতো এবং উত্তম গুণাবলী বিকশিত হতো। এই পরিপক্ক ও গুণধর ব্যক্তিত্বগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী সমাজ নিজের স্বতন্ত্র গুণ বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র্য মূল্যবোধ এবং স্বতন্ত্র্য চরিত্র ও কৃষ্টি নিয়ে মানব সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলো।

সদ্য গঠিত ইসলামী সমাজের জন্যে এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ এতো কষ্টকর হয়ে দেখা দিতো যে, কখনো কখনো তা কঠিন অগ্নি পরীক্ষার রূপ নিতো। স্বর্ণকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে আসল ও খাদ

বাছাই করা হয়, ঠিক তেমনি এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা মুসলমানদের নৈতিক মান যাচাই হয়ে যেতো। এরপর আর ভালোমন্দ মিলে-মিশে একাকার হয়ে থাকতে পারতো না এবং কার কেমন চরিত্র, তা অজানা থাকতো না।

এইসব অগ্নি পরীক্ষার মাঝে অথবা শেষে একটু একটু করে কোরআন নাযিল হয়ে ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতো, এর বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করতো এবং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মতামত, আবেগ অনুভূতি, উদ্দেশ্য ও মনোভাব উন্মোচন করে দিতো। সকলের অন্তকরণ যখন আলোয় উদ্ভাসিত এবং সবরকমের আড়াল ও আবরণ থেকে মুক্ত, তখন সেই অন্তরগুলোকে কোরআন সম্বোধন করতো, অন্তরের সেই কোমল স্থানগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করতো যার মধ্যে গ্রহণ করা ও প্রভাবিত হওয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা রয়েছে। এরূপ অন্তরগুলোকে সে দিনের পর দিন প্রতিটা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে লালন করে অধিকতর যোগ্য করে গড়ে তুলতো এবং তাঁর মনোনীত আদর্শে দীক্ষিত করতো।

কোরআন একই সাথে সমুদয় আদেশ নিষেধ এবং সমুদয় আইনগত বিধি বিধান ও নৈতিক নির্দেশাবলী নিয়ে নাযিল হবে এ জন্যে মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করা হয়নি। বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তুলেছেন। তিনি জানতেন যে, মানুষকে এ ধরনের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়া সঠিকভাবে প্রস্তুত করা ও পরিপক্কতা দান করা সম্ভব নয়। এরূপ প্রশিক্ষণ তার অন্তরের অন্তস্থলে বদ্ধমূল করা এবং মেরুমজ্জায় খোদাই করে দেয়া সম্ভব। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে এ প্রশিক্ষণ বিভিন্ন ব্যক্তিকে যতোটা কার্যকরভাবে দেয়া যায় ততোটা আর কোনোভাবে দেয়া যায় না। কোরআন তার শ্রোতাদের সামনে ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ ও তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে। পরীক্ষার আগুনে উত্তপ্ত, বিগলিত, ও বশীভূত এই অন্তরে সে বিভিন্ন নির্দেশিকা সফলতার সাথে উৎকীর্ণ করে ও তাকে আপন রংগে রঞ্জিত করে।

রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় মুসলমানরা যে সময়টা অতিবাহিত করেছেন, সেটা ছিলো যথার্থই একটা চমকপ্রদ সময়। এ সময়টাতেই মহান আল্লাহ ও বিশ্ব মানবের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য সংযোগ স্থাপিত হয়। বিভিন্ন ঘটনা ও উক্তির মধ্য দিয়ে এ সংযোগ ও মিলনের প্রতিফলন ঘটেছে। এ সময় প্রত্যেক মুসলমান গভীর রাতে নির্জনে নিভৃতে অবস্থানকালেও অনুভব করতো যে, আল্লাহর চোখ তার ওপর নিবদ্ধ রয়েছে এবং তিনি তার প্রতিটা কাজ দেখতে পাচ্ছেন, আর তার কান সর্বক্ষণ পাতা রয়েছে এবং তিনি সব কিছু শুনতে পাচ্ছেন।

সে আরো অনুভব করে যে, তারা যে কোনো কথা, কাজ, এমনকি অন্তরের সামান্যতম ইচ্ছা বা অভিলাষ যে কোনো মুহূর্তে কোরআনের কোনো আয়াত নাযিল হওয়ার মধ্য দিয়ে ফাঁস হয়ে যেতে পারে। এই সময়টাতেই প্রত্যেক মুসলমান নিজের ও তাঁর প্রতিপালকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ অনুভব করতো। এ জন্যে যখনই সে কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতো, আল্লাহর পক্ষ থেকে সে সমস্যার একটা সমাধান আসবে বলে বিশ্বাস করতো এবং সে জন্যে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতো। এই সময়ে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে বলতেন, ওহে অমুক, তুমি তো এই কথা বলেছিলে, এই কাজ করেছিলে, এই কথা মনের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছিলে, এই কথা প্রকাশ করেছিলে, তুমি এরূপ হও এবং এরূপ হয়ো না ইত্যাদি ইত্যাদি। কী বিস্ময়কর ব্যাপার যে, মহান আল্লাহ একটা সুনির্দিষ্ট বিষয়ে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করেন। অথচ এই পৃথিবীর অধিবাসীরা সকলে মিলিত হয়েও এবং এই গোটা পৃথিবীটাও আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যে একটা ক্ষুদ্র কণার চেয়ে বেশী নয়।

বস্তুত সেটা একটা বিস্ময়কর সময়ই ছিলো বটে। আজকের মানুষ সে অবস্থাটা কেবল কল্পনাই করতে পারে। কিন্তু বুঝতে পারে না যে, এমন অবস্থার উদ্ভব কেমন করে হয়েছিলো।

কিন্তু মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে নিছক এসব আবেগ-অনুভূতির কাছে সোপর্দ করেই ক্ষ্যান্ত থাকেননি। তিনি চাননি যে, মহান আল্লাহর সাথে বান্দার প্রত্যক্ষ সংযোগের অনুভূতি এবং কোরআন নাযিল হওয়ার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তাদের মনের কথা প্রকাশিত হওয়ার দ্বারাই তাদের ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিকাশ বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা অর্জিত হতে থাকুক। বরঞ্চ তিনি তাদেরকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছেন এবং এমন পরীক্ষার মুখোমুখী করেছেন, যা তাদেরকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেও বাধ্য করেছে। আবার বেশ কিছু শিক্ষাও দিয়েছে। এ সব পরীক্ষার পেছনে ছিলো আল্লাহর সুগভীর প্রজ্ঞা ও মহৎ উদ্দেশ্য যা একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী, সবচেয়ে সুক্ষ্ম ও নির্ভুল। তিনি সর্ববিষয়ে সুক্ষ্মজ্ঞানী ও ব্যাপকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

মহান আল্লাহর এই সুক্ষ্ম ও নির্ভুল জ্ঞান এবং এই মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার জন্যে আমাদের কিছু চিন্তা গবেষণা করা প্রয়োজন। এই চিন্তা গবেষণা ও তা দ্বারা অর্জিত উপলব্ধির আলোকেই আমাদের বিবেচনা করতে হবে দুনিয়ার যাবতীয় ঘটনাবলী ও পরীক্ষা নিরীক্ষাকে।

ঐতিহাসিক খন্দকের যুদ্ধ

সূরা আল আহযাবের এই অংশটুকুতে ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম জাতির ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং মুসলমানদের ওপর আপতিত কঠিন পরীক্ষার একটা পর্ব আলোচিত হয়েছে। সেই ঘটনা হলো আহযাব যুদ্ধ। এটা সংঘটিত হয় হিজরী চতুর্থ বা পঞ্চম সনে। এটা ছিলো মদীনার সদ্য প্রসূত মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও চরিত্রের দৃঢ়তা ও পরিপক্কতার পরীক্ষা। কোরআনের এই অংশের আয়াতগুলো ঘটনা বর্ণনায় যে ধরনের বাচনভংগী প্রয়োগ করেছে এর বিভিন্ন দৃশ্য, মন্তব্য, তৎপরতা ও মানসিক প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা এবং এ সংক্রান্ত আল্লাহর বিধান ও মূল্যবোধ বিশ্লেষণের যে রীতি অবলম্বন করেছে, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি মহান আল্লাহ একই সাথে কোরআন দ্বারা ও ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে কিভাবে শিক্ষা দিতেন।

ঘটনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণে কোরআনের গৃহীত পদ্ধতি বুঝবার উদ্দেশ্যে আমি প্রথমে সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত এই ঘটনার বিবরণ কিছুটা সংক্ষেপে তুলে ধরছি এবং তারপর সূরার তাফসীরে আত্ম নিয়োগ করবো। এতে কোনো ঘটনা সম্পর্কে মানুষের বর্ণনায় ও আল্লাহর বর্ণনায় পার্থক্য বুঝা যাবে।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধ সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া গেছে তা বলো যে, বনু নযীর গোত্রের হুয়াই বিন আখতার, কেনানা বিন আবিল হাকীক, সালাম বিন আবিল হাকীক, বনু ওয়ায়েশ গোত্রের হাওদা বিন কায়েস ও আবু আম্মার প্রমুখসহ বনু নযীর ও বনু ওয়ায়েলের একদল ইহুদী নেতা, যারা খন্দক যুদ্ধের উদ্যোক্তা ছিলো এবং আরবের বেশীর ভাগ গোত্রকে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে সমবেত করেছিলো, মক্কার কোরায়শদের কাছে উপনীত হয়ে তাদেরকে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্ররোচনা দিতে লাগলো। তারা বললো, আমরা মোহাম্মদ (স.)-কে সমূলে উৎখাত করার জন্যে তোমাদের সাথে থাকবো। কোরায়শরা তাদেরকে বললো, ' শোনে ইহুদী নেতৃবর্গ, তোমরা তো প্রথম কেতাবের অধিকারী ছিলে, আর আমরা ও মোহাম্মদ (স.) যে বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত আছি, সে সম্পর্কেও তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছ।

এখন বলো, আমাদের ধর্ম ভালো, না মোহাম্মদের ধর্ম ভালো! তারা বললো, 'বরঞ্চ তার ধর্মের চেয়ে তোমাদের ধর্মই ভালো এবং তোমরা অধিকারের ক্ষেত্র তার চেয়ে অগ্রগণ্য।' এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা সূরা নেসার ৫১ থেকে ৫৬ নং আয়াত নাযিল করেন।

ইহুদী নেতাদের মুখ থেকে এ কথাগুলো শুনে কোরায়েশ নেতারা আনন্দিত হলো এবং রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে তারা যে আহ্বান জানালো, তা বাস্তবায়নে তারা পুরোমাত্রায় প্রস্তুত হয়ে গেলো।

এরপর সেই ইহুদী নেতৃবর্গ বনু গাতফানের কাছে গেলো। তারা তাদেরকেও রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করলো। তারা তাদেরকে জানালো যে, ইহুদীরা এ ক্ষেত্রে তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে এবং কোরায়শরাও তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এ কথা শুনে গাতফানীরাও প্রস্তুত হয়ে গেলো এবং যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হলো।

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কোরায়শ, উযায়না ইবনে হাসনের নেতৃত্বে বনু গাতফান, হারেস ইবনে আওফের নেতৃত্বে বনু মুরাহ্ এবং মাশয়ার বিন রুখাইলের নেতৃত্বে বনু আশজা মদীনা আক্রমণ করার জন্যে অভিযানে বেরিয়ে পড়লো।

রসূল (স.) আগ্রাসনের খবর শুনে মদীনার চারপাশে খন্দক বা পরিখা খনন করলেন। এই খননকার্যে সাধারণ মুসলমানদের সাথে সাথে স্বয়ং রসূল (স.) ও অংশগ্রহণ করলেন। সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন। কিন্তু কিছুসংখ্যক মোনাফেক সাধারণ মুসলমানদের সাথে ও রসূল (স.)-এর সাথে পরিখা খনন থেকে নানা ওযুহাতে পিছিয়ে থাকলো। কেউ কেউ রসূল (স.)-এর কাছ থেকে কোনো অনুমতি না নিয়ে এবং তাকে কিছু না জানিয়ে গোপনে নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে যেতে লাগলো। ওদিকে মুসলমানদের মধ্য থেকে কারো কোনো জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে সে রসূল (স.)-কে তা জানিয়ে ও অনুমতি নিয়ে যেতো এবং জরুরী কাজ সেরে ফিরে এসে আবার নিজ কাজে আত্মনিয়োগ করতো। কেননা তারা সৎ কাজে অতিশয় আগ্রহী ও নিষ্ঠাবান ছিলো। এসব নিষ্ঠাবান মোমেনদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা নূরের ৬১ নং আয়াত নাযিল করেন। অতপর কাজে ফাঁকি দিয়ে গোপনে বিনা অনুমতিতে বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে মোনাফেকদেরকে ভর্ৎসনা করে ৬২ নং আয়াত নাযিল করেন।

রসূল (স.)-এর পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত হবার পর কোরায়শরা তাদের অনুগত নিগ্রো দাস, বনু কিনানা ও তেহামাবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত দশ হাজারের বিশাল বাহিনী নিয়ে হাযির হলো। তাদের সাথে আরো যোগ দিল বনু গাতফান ও অনুগত নাজদবাসীও। তারা ওহুদ পাহাড়ের পাশে সমবেত হলো। এদিকে রসূল (স.) তিন হাজার মুসলমানের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী নিয়ে পরিখা নিজেদের ও শত্রুদের মাঝখানে রেখে অবস্থান নিলেন। মুসলমানদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে দুর্গের অভ্যন্তরে রেখে আসার নির্দেশ দিলেন।

আল্লাহর দুশমন হুয়াই ইবনে আখতার বনু কোরায়যার নেতা কা'ব বিন আসাদের কাছে গেলো। রসূল (স.) কা'বের সাথে ইতিপূর্বে উভয় পক্ষের বেসামরিক লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু হুয়াই আসাদকে এই চুক্তি ভংগ করতে প্ররোচিত করতে লাগলো। সে কা'বকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলো যে, কোরায়শ ও গাতফান যদি মোহাম্মদ (স.)-কে অক্ষত অবস্থায় রেখে চলে যায়, তাহলে আমি তোমার সাথে তোমার দুর্গে অবস্থান করবো এবং তোমার যে পরিণাম হবে, আমারও তাই হবে।' হুযাইয়ের এই প্ররোচণায় কা'ব তার সাথে রসূল (স.)-এর যে চুক্তি ছিলো, তা ভংগ করলো।

এই পর্যায়ে মুসলমানদের বিপদ ভয়ংকর রূপ ধারণ করলো এবং তাদের ভয়ভীতি ও শংকা নিদারুণভাবে বেড়ে গেলো। তাদের শত্রুরা সর্বদিক থেকে তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বসলো। এ সময় কোনো কোনো দুর্বল ঈমানধারী মুসলমান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কেও বিরূপ ধারণা পোষণ করতে লাগলো। মোনাফেকদের মোনাফেকী তীব্রতর হয়ে উঠলো। বনু আমরের মোয়াত্তাব বিন কুশায়ের বলে উঠলো, 'মোহাম্মদ (স.) আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, রোম ও পারস্যের সম্রাটদের সম্পত্তি আমাদের হস্তগত হবে। অথচ আজ আমাদের অনেকে পেশাব পায়খানা করতে গিয়েও নিজের জীবন নিয়ে শংকিত থাকে। বনু হারেসা গোত্রের আওস বিন কায়সী বললো, 'হে রসূল, আমাদের বাড়ী-ঘর শত্রুদের নাগালের ভেতরে রয়েছে। কাজেই মদীনার বাইরে অবস্থিত আমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

এভাবে রসূল (স.) ও মোশরেকদের অবরোধসূচক অবস্থান প্রায় একমাসের কাছকাছি বহাল থাকলো। পরস্পরে কিছু পাথর ছোঁড়াছুড়ি ও তীর বিনিময় করা ছাড়া আর কোনো যুদ্ধ হয়নি।

মুসলমানদের জন্যে পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করলো, তখন রসূল (স.) বনু গাতফানের দুই নেতা উয়াইনা ইবন হাসন ও হারেস বিন আওফের কাছে এই মর্মে সন্ধি প্রস্তাব পাঠালেন যে, তারা তাদের দলবলসহ মদীনা ত্যাগ করতে রাযী হলে তিনি তাদেরকে মদীনার উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ দেবেন।(১) এই দুই গাতফানী নেতার সাথে রসূল (স.)-এর এই সন্ধি চুক্তির আলোচনা এবং লেখার কাজ সম্পন্ন হলো। কেবল সাক্ষীর সাক্ষ্য ও উভয় পক্ষের স্বাক্ষর দান বাকী ছিলো। এ ব্যাপারে উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি আদায়ের জন্যে চেষ্টা ও দর কষাকষি চলছিলো। রসূল (স.) চুক্তিটা চূড়ান্ত করার আগে আওস নেতা হযরত সাদ ইবনে মোয়ায ও খাজরায নেতা সাদ বিন ওবাদাকে জানালেন এবং তাদের উভয়ের মতামত ও পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা উভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা কি আপনার ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়, যা আমাদের করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? অথবা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এ কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন, যা আমাদের অবশ্য করণীয়? নাকি, এটা আপনি নিজস্ব বিবেচনায় আমাদের কল্যাণার্থে করতে চাইছেন? রসূল (স.) বললেন, তোমাদের উপকারার্থে আমি নিজস্ব বিবেচনায় এ কাজটা করতে চাই, আল্লাহর কসম, আমি এ কাজটা শুধু এ জন্যেই করতে চেয়েছি যে, আমি দেখেছি, সমগ্র আরবজাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদেরকে একই তীরে বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে এবং তোমাদের ওপর চতুর্দিক থেকে আগ্রাসন চালিয়েছে। এমতাবস্থায় তোমাদের ওপর থেকে তাদের দাপট যতোটুকু সম্ভব খর্ব করতে চেয়েছি।' সা'দ ইবনে মোয়ায বলেন, 'হে রসূলাল্লাহ, এক সময় আমরা ও এই লোকেরা একই সাথে আল্লাহর সাথে শেরেক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলাম। তখন আল্লাহর এবাদতও করতাম না, আল্লাহ তায়ালাকে চিনতামও না। অথচ সে সময়ও তারা নেহাৎ অতিথিসুলভ আপ্যায়ন অথবা কিনে খাওয়া ছাড়া আমাদের উৎপন্ন ফসল থেকে একটা দানাও খেতে পারেনি। আর আজ যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলামের ন্যায় অমূল্য সম্পদ দিয়ে সম্মানিত করেছেন, ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং আপনাকে ও ইসলামকে দিয়ে আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছেন, তখন তাদেরকে আমাদের সম্পদ দেবো? আল্লাহর কসম, আমাদের এর কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, আমরা তাদেরকে তরবারী ছাড়া আর কিছুই দেবো না, যতোক্ষণ না তাদের ও আমাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালা কোনো চূড়ান্ত

(১) ওদিকে ইহুদীরা তাদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তারা তাদেরকে সাহায্য করলে তাদেরকে খয়বরের এক বছরের ফসল দেবে। (মিকরীনী)।

ফায়সালা না করে দেন।' রসূল (স.) বললেন, ঠিক আছে। ব্যাপারটা এখন তোমার হাতেই ন্যস্ত করলাম।' এরপর সা'দ চুক্তির খসড়াটা হাতে নিলেন এবং যা কিছু লেখা হয়েছিলো, সব নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'ওরা আমাদের যা করতে পারে করুক।'

রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীরা তীব্র ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশে অবস্থান করতে লাগলেন। এ সময় চতুর্দিক থেকে শত্রু সেনাদের আনাগোনা ও তাদের আগ্রাসী হামলা অব্যাহত ছিলো।(১)

অবশেষে এক সময় বনু গিতফানের নঈম ইবনে মাসউদ ইবনে আমের রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তবে আমার গোত্র আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানে না। এখন আপনি আমাকে যা ইচ্ছে আদেশ দিতে পারেন। রসূল (স.) বললেন, 'তুমিই আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি, যে কিছু কার্যকর অবদান রাখতে পারো। কাজেই যদি পারো, কোনো কৌশল অবলম্বন করে আমাদের ওপর থেকে এই সংকট দূর করো। মনে রেখ, যুদ্ধ কৌশলেরই আর এক নাম।'

(অতপর সত্যিই নঈম ইবনে মাসউদ এক যুগান্তকারী কৌশল অবলম্বন করে হানাদার বাহিনীগুলো ও বনু কোরায়যার মধ্যে পারস্পরিক অনাস্থার সৃষ্টি করে দিলেন। এ কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ সীরাত গ্রন্থাবলীতে রয়েছে। দীর্ঘসুত্রিতার আশংকায় এখানে সেই বিবরণ উদ্ধৃত করা থেকে বিরত রইলাম।)

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিলেন। একে তো প্রচন্ড শীতের রাত, তদুপরি তাদের ওপর এমন ঝড়ো হাওয়া চালিয়ে দিলেন, যা তাদের ডেগচিগুলোকে উপুড় করে ও তাঁবুগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো।

আগ্রাসী বাহিনীগুলোর মধ্যে মতভেদ ও বিশৃংখলার খবর জানতে পেরে রসূল (স.) হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামানকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে তাঁকে রাতের বেলায় আগ্রাসী বাহিনীগুলোর অবস্থা ও তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করতে পাঠিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা নিম্নরূপ,

জনৈক কুফাবাসী হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামানকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি রসূল (স.)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তার সাথে কখনো অবস্থান করেছেন? হোযায়ফা বললেন, হ্যাঁ। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনারা তাঁর সাথে কেমন ব্যবহার করতেন? হোযায়ফা বললেন, আমরা তাঁর আদেশ পালনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। সে বললো, আল্লাহর কসম, আমরা যদি তাঁকে পেতাম, তবে তাকে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে দিতাম না বরং তাকে ঘাড়ে করে রাখতাম। হোযায়ফা বললেন, শোনো, আমরা খন্দকের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছিলাম। রাতের একটা অংশ তিনি নামায পড়ে কাটিয়ে দিলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, উঠে গিয়ে শত্রুদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে

(১) হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর সাথে এমন অনেকগুলো রণাংগনে উপস্থিত থেকেছি, যেখানে তুমুল যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করছিলো, যেমন মুরাইসী, খয়বর ও হুনায়ন। এ ছাড়া মক্কা বিজয় এবং হোদাইবিয়ার ঘটনাস্থলেও আমি ছিলাম। কিন্তু এ সবের কোনোটাই রসূল (স.)-এর জন্য খন্দকের চেয়ে পীড়াদায়ক এবং আমাদের জন্য ত্রাসোদ্দীপক ছিলো না। কেননা খন্দক যুদ্ধের সময় মুসলমানরা পুরোপুরি অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলো এবং ইহুদী গোত্র বনু কোরায়যার দিক থেকে আমাদের ছেলে-মেয়েরা নিরাপদ ছিলো না। মদীনাকে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারারাত পাহারা দেয়া হতো এবং সারারাত মুসলিম জনতার আল্লাহু আকবর ধ্বনি শুনতে শুনতে ভীতি ও শংকার মধ্য দিয়েই আমাদের সকাল হতো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা শত্রুদেরকে বিন্দুমাত্র সাফল্য ছাড়াই ফিরে যেতে বাধ্য করলেন।

পারে? কিন্তু তীব্র ভীতি, প্রচন্ড ক্ষুধা ও ভয়ংকর ঠান্ডার কারণে কেউ উঠে দাঁড়িয়ে সম্মতি প্রকাশ করলো না। কেউ যখন দাঁড়ালো না, তখন রসূল (স.) আমাকে ডাকলেন। আমাকে যখন ডাকলেন, তখন আমার না দাঁড়িয়ে গত্যন্তর ছিলো না। অতপর তিনি আমাকে বললেন, 'হোযায়ফা, তুমি যাও, শত্রুদের ভেতরে ঢুকে পড়ো এবং দেখো তারা কী করে। আমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো ঘটনা ঘটিও না।' হোযায়ফা বলেন, এরপর আমি গেলাম এবং ওদের শিবিরের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তাদের হাড়িকুড়ি, চুলোর আগুন, তাঁবু ও অন্যান্য স্থাপনা-সবই তছনছ হয়ে যাচ্ছিলো। এই সময় আবু সুফিয়ান উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, হে কোরায়শী বাহিনী, তোমাদের প্রত্যেকের নিজের পাশে কে বসে আছে এবং কী করছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।' হোযায়ফা বলেন, আমি তৎক্ষণাত আমার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে ধরে বললাম, তুমি কে? সে বললো, অমুকের ছেলে অমুক। আবু সুফিয়ান আবার বললো, হে কোরায়শী বাহিনী, আল্লাহর কসম, আমরা এমন জায়গায় অবস্থান করছি, যা অবস্থানের যোগ্য নয়। আমাদের উট ঘোড়া সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। বনু কোরায়যা আমাদেরকে ফেলে চলে গেছে। তাদের সম্পর্কে যে খবর পেয়েছি, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তাছাড়া তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কী সাংঘাতিক ঝড়ের কবলে পড়েছি। আমাদের একটা ডেগচিও স্থির থাকছে না, আগুন নিভে গেছে, তাঁবু ও অন্যসব স্থাপনা তছনছ হয়ে গেছে। তাই সবাই রওনা হও। আমিও রওনা হচ্ছি।' তারপর সে তার রজ্জুবদ্ধ উটের দিকে এগিয়ে গেলো এবং তার পিঠে চড়ে বসলো। তিনবার আঘাত করার পর উটটা তাকে নিয়ে লম্ফঝম্প করতে করতে যাত্রা শুরু করলো। আল্লাহর কসম, বন্ধন খুলে দেয়ার পরও উটটা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলো। রসূল (স.) যদি আমাকে পূর্বাহ্নে আদেশ না দিতেন যে, আমার কাছে ফিরে না এসে কোনো ঘটনা ঘটিও না, তাহলে আমি চাইলেই তাকে বর্শা মেরে হত্যা করতে পারতাম।

হোযায়ফা বলেন, এরপর আমি রসূল (স.)-এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি তখনো তাঁর কোনো স্ত্রীর ইয়ামানী কম্বলে আবৃত হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে তিনি তাঁর পায়ের কাছে আমাকে বসতে দিলেন এবং কম্বলের এক প্রান্ত আমার গায়ের ওপর ফেলে দিলেন। তারপর তিনি যখন রুকু ও সেজদা দিলেন তখনো আমি সেই কম্বলের ভেতরে। তিনি যখন সালাম ফেরালেন, আমি তাকে সব খবর জানালাম। ওদিকে কোরায়শরা কী করেছে, সেটা যখন গাতফানীরা শুনলো, তখন তারাও উঠি পড়ি করে স্বদেশের পথে পাড়ি জমালো।

আল কোরআনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কোরআনের বক্তব্যে সাধারণত নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করা হয় না। তার লক্ষ্য থাকে শুধু মানুষের ও তার স্বভাব প্রকৃতির নমুনা তুলে ধরা। কোরআনে ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটি বর্ণনা দেয়া হয় না। কেবল স্থায়ী ধ্যান ধারণা এবং প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ বর্ণনা করা হয়। এ জিনিসগুলো ঘটনার সমাপ্তির সাথে সাথে সমাপ্ত হয় না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ধানের সাথে সাথে অন্তর্হিত হয় না। এজন্যে এগুলো প্রত্যেক যুগ ও প্রজন্মের জন্যে স্থায়ী দৃষ্টান্ত ও মূলনীতি হিসেবে বহাল থেকে যায়। কোরআন সংশ্লিষ্ট ঘটনার মহান আল্লাহর শক্তি ও পরিকল্পনার সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করে, যিনি যাবতীয় ঘটনা, ব্যক্তি ও বস্তুর ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, এসব জিনিসের ভেতর দিয়ে সে মহান আল্লাহর দোর্দন্ড ক্ষমতা ও প্রতাপ এবং তাঁর সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ কৌশলকে প্রতিফলিত করে। আর দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রতিটি পর্যায়ে সে নির্দেশ দান, পর্যালোচনা ও প্রধানতম মূলনীতির সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকে।

যদিও কোরআন তার প্রত্যক্ষ শ্রোতাদের কাছেও কেসসা কাহিনী ও ঘটনাবলী বর্ণনা করতো, কিন্তু এ দ্বারা সে তাদেরকে একটা বাড়তি তথ্যও পরিবেশন করতো এবং তা থেকে এমন সব আনুসংগিক তত্ত্বও তাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করতো, যা তারা কোরআন নাযিল হওয়ার সমসাময়িক হয়েও বুঝতে পারেনি। কোরআন তাদের অন্তরের অন্তস্থলে লুকানো যাবতীয় বক্রতা ও খটকা প্রকাশ করে দিতো।

সেই সাথে কোরআনের দৃশ্য চিত্রায়নে যে অপরূপ সৌন্দর্য, শক্তিমত্তা ও তেজস্বীতা ফুটিয়ে তুলেছে, কাপুরুষতা, ভীরুতা, ভন্ডামী ও বক্রতার প্রতি যে বিদ্রূপ ও শ্লেষের বাণ নিক্ষেপ করেছে, এবং ঈমানদারদের ঈমানী বীরত্ব, সাহসিকতা, ধৈর্য, সহনশীলতা ও প্রত্যয়ের দৃঢ়তার যে উদ্দীপনাময় চিত্র তুলে ধরেছে, তা প্রত্যেক পাঠককেই অভিভূত করে।

বস্তুত কোরআন শুধু তার সমকালীন মানব গোষ্ঠীর জন্যেই নয়, বরং সর্বকালের মানুষের জন্যেই কর্ম প্রেরণার উৎস। বিশেষত যে মানবগোষ্ঠী তার সমকালীন মানবগোষ্ঠীর মতোই পরিস্থিতি ও পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হয়। তার মন মগযে সে ঠিক ততোখানি জোরালোভাবেই কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করে, যতোখানি জোরালোভাবে প্রথম মুসলিম সমাজের মন মগযে সৃষ্টি করেছিলো।

সত্য বলতে কি, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় সে যে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো। ঠিক সেই পরিস্থিতিরই সম্মুখীন না হয়ে কেউ কোরআনের বক্তব্যের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। সেই ধরনের পরিস্থিতির মুখেই কোরআন তার সঞ্চিত ভান্ডার উজাড় করে দেয় এবং তার পাঠকদের মন মগজ তার সমুদয় আলোচ্য বিষয় উপলব্ধির জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর এহেন পরিস্থিতি ও পরিবেশে তার সেই সব লিখিত বক্তব্য থাকে না বরং তা অদম্য শক্তি এবং অমিত তেজে রূপান্তরিত হয়। সেখানে যে সমস্ত ঘটনা প্রবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা যেন এক জীবন্ত, জাগ্রত, তেজোদ্দীপ্ত, প্রেরণাময় ও তরতাজা এক দল প্রাণীর রূপ ধারণ করে এবং তারা যেন জীবনের কর্মময় অংগনে ও মন মগযে আলোড়ন তোলে।

মনে রাখতে হবে, কোরআন এমন কোনো পুস্তক নয়, যা কেবল সুরেলা আবৃত্তি ও সুললিত পাঠই যথেষ্ট হতে পারে। কোরআন তো হচ্ছে কর্মোদ্দীপক, প্রাণ শক্তির ভান্ডার এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও প্রত্যেক ঘটনায় প্রতিনিয়ত কর্মস্পৃহা যোগানের উৎস। যদি তার মন মস্তিষ্ক কোরআনের আদর্শে উজ্জীবিত হয় এবং বিরাজমান পরিবেশে কোরআনের হতবুদ্ধিকর ও তাৎপর্যময় আয়াতগুলোর ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে থাকা প্রাণশক্তির ছোঁয়া লাগে তাহলে এর প্রতিটি বক্তব্য প্রতি মুহূর্তে মানুষকে কর্মচঞ্চল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

মানুষ অনেক সময় কোরআনের কোনো আয়াতকে শতবার পড়েও তার তেমন কোনো তাৎপর্য খুঁজে পায় না। কিন্তু যখন বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে বা বিশেষ কোনো দুর্যোগ ও দুর্বিপাকে পড়ে সেই আয়াতটা পড়ে, তখনই তার কাছে মনে হয়, আয়াতটা যেন নতুন, আগে যেন কখনো সে তা আর পড়েনি। সে এখন যে তাৎপর্য ও প্রেরণার সন্ধান তাতে পেয়েছে, আগে যেন কখনো তা পায়নি। এখন তা থেকে যে কঠিন প্রশ্নের জবাব, যে জটিল সমস্যার সমাধান, যে অজানা পথের ও যে নির্ভুল গন্তব্যের সন্ধান এ ইপ্সিত বিষয়ে যে অটুট প্রত্যয় ও গভীর তৃপ্তির স্বাদ সে পেয়েছে, তাও যেন আগে কখনো পায়নি।

কোরআন ছাড়া প্রাচীন বা আধুনিক আর কোনো গ্রন্থই এ বৈশিষ্টের অধিকারী নয়।

খন্দক যুদ্ধের ধারা পর্যালোচনা

পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু হয়েছে আহযাব যুদ্ধের পর্যালোচনা। এ পর্যালোচনার সূচনায় মোমেন বান্দাদেরকে আল্লাহর এই অকল্পনীয় অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে হানাদার শত্রু বাহিনী তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়েছিলো, তাদেরকে তিনি হটিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর সূক্ষ্ম কৌশল ও সহৃদয় সাহায্য যদি না থাকতো, তাহলে ওরা মদীনার মুষ্টিমেয়সংখ্যক মুসলমানকে একেবারেই নাস্তানাবুদ করে দিয়ে চলে যেতো। এ জন্যে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার আগে প্রথম আয়াতেই তার ধরণ ও প্রকৃতি এবং আরম্ভ ও সমাপ্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহের বিশালতার চিত্র তুলে ধরেছেন এবং তা স্মরণ করতে বলেছেন। এই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে শুধু তাঁর ওহীর অনুসরণ, একমাত্র তাঁর ওপর নির্ভর করা এবং কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য না করার আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন না, বরং সেই সাথে তিনি তাঁর দ্বীনের দাওয়াতের কাজে নিয়োজিতদেরকে কাফের ও মোনাফেকদের আগ্রাসন থেকে রক্ষাও করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে ঈমানদাররা! তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের ওপর সেনাদলগুলো আক্রমণ করেছিলো, তখন আমি তাদের ওপর প্রবল বাতাস ও এমন সৈন্যদেরকে পাঠিয়েছিলাম যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আল্লাহ তায়ালা অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী।' (আয়াত ৯)

এভাবে এই সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক বক্তব্যে যুদ্ধের আরম্ভ ও সমাপ্তি এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী ঘটনাবলী যেমন শত্রু সেনাদের আক্রমণ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ঝড় ও তার এমন (ফেরেশতা) সেনাদল প্রেরণ, যাদেরকে মুসলমানরা কখনো দেখেনি এবং আল্লাহর গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সুক্ষদর্শিতামূলক সাহায্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পরই পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু হয়েছে এর বিশদ বিবরণ,

'যখন তারা তোমাদের ওপর থেকেও এলো, নীচ থেকেও এলো .... ।' (আয়াত ১০, ১১, ১২ ও ১৩)

এ হচ্ছে সেই প্রলয়ংকরী আগ্রাসী হামলার চিত্র, যা সমগ্র মদীনায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো এবং এমন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছিলো, যা থেকে কোনো একজন অধিবাসীও রেহাই পাচ্ছিল না। কোরায়শী ও গাতফানী মোশরেকেরা ও বনু কোরায়যার ইহুদীরা মদীনার ওপর ও নীচ-সর্বদিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছিলো। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অনুভূতিতে মদীনাবাসীদের কেউ কারো থেকে পিছিয়ে ছিলো না। কেবল একটা বিষয়ে পার্থক্য ছিলো। সেটা হলো, এই আগ্রাসনে মদীনাবাসীর মানসিক প্রতিক্রিয়া, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের ধারণা, বিপদাপদে তাদের আচরণ এবং ঘটনার কারণ ও ফলাফলের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ। এ জন্যে পরীক্ষাটা ছিলো সর্বাত্মক ও সূক্ষ। আর মোমেন ও মোনাফেকদের ছাঁটাই বাছাইটাও ছিলো চূড়ান্ত ও বেপরোয়া।

ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, সেই খন্দক যুদ্ধ তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। এই ক্ষুদ্র আয়াতটার মধ্য দিয়ে আমরা যেন তার একটা চিত্র দেখতে পাই।

ঘটনার বাহ্যিক রূপটা দেখতে পাই এ রকম, 'যখন তারা তোমাদের ওপর থেকেও এলো, নীচ থেকেও এলো'....... পুনরায় দৃষ্টি দিলে মনের ওপর এর প্রতিক্রিয়াটা দেখতে পাই এরকম।

'আর যখন তোমাদের চোখগুলো ভয়ে বিস্ফারিত এবং প্রাণগুলো ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিলো' .... এটা আসলে সেই ভয়াল, উদ্বেগজনক ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির চিত্র, যাতে মুখমন্ডলের আলামত ও মনের ভাবান্তর দ্বারা অংকন করা হয়েছে।

'এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে রকমারি ধারণা পোষণ করছিলে'..............

ধারণাগুলো কিরকম ছিলো, তার বিবরণ দেয়া হচ্ছে না, বরং এমন সংক্ষিপ্ত রেখে দেয়া হচ্ছে, যাতে সেই সংকটকালের মানসিক অস্থিরতা, কল্পনার বিক্ষিপ্ততা এবং এক একজনের মনে এক একরকম ভাবনার উদ্রেকের চিত্র ফুটে ওঠে।

এরপর পুনরায় যুদ্ধাবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং আতংকজনক দৃশ্যগুলোকে আরো স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

'সেখানে ঈমানদারদের পরীক্ষা নেয়া হয় এবং তাদেরকে প্রচন্ডভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হয়। যে আতংক মুসলমানদের কাঁপিয়ে দেয়, তা খুবই ভয়ংকর ধরনের হওয়ারই কথা।

মোহাম্মদ বিন মুসলিমা প্রমুখ বর্ণনা করেন,

আহযাব যুদ্ধ উপলক্ষে তৈরী খন্দক বা পরীখাগুলোর ভেতরে আমাদের রাত ছিলো দিনের মতো স্বচ্ছ। মোশরেক নেতারা পালাক্রমে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতো। একদিন আবু সুফিয়ান, একদিন খালেদ ইবনুল ওলীদ, একদিন আমর ইবনুল আস, একদিন হুবাইবা ইবনে আবি ওহব একদিন ইকরামা ইবনে আবি জাহল, একদিন যেরার ইবনুল খাত্তাব সেনাপতিরূপে আবির্ভূত হতো। ফলে সংকট ঘনীভূত হতে থাকে এবং জনগণের মধ্যে ক্রমেই আতংক ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মিকরিযী মুসলমানদের অবস্থার যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ,

'মোশরেকরা ভোর রাতে এসে পৌঁছলো। রসূল (স.) তার সাহাবীদেরকে সংঘবদ্ধ করলেন এবং তারা সারাদিন রাত পর্যন্ত যুদ্ধ করলো। যুদ্ধের তীব্রতায় রসূল (স.) স্বয়ং এবং অন্য কোন মুসলমান নিজ নিজ জায়গা থেকে একটুও নড়তে পারলেন না। এমনকি, রসূল (স.) জোহর, আছর, মাগরিব ও এশার নামায পর্যন্ত পড়তে পারেননি। সাহাবীরা বলতে লাগলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা তো নামায পড়লাম না।' রসূল (স.) বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমিও নামায পড়িনি।' অবশেষে আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদেরকে হটিয়ে দিলেন এবং উভয় পক্ষ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলো। উসায়দ ইবনুল হুযায়র দুইশ মুসলিম সেনাকে সাথে নিয়ে খন্দকের কিনারে রুখে দাঁড়ালেন। এটা দেখে খালেদ বিন ওলীদের নেতৃত্বে একদল মোশরেক তাদেরকে আক্রমণ করার জন্যে রুখে দাঁড়ালো। উসায়দের বাহিনী কিছুক্ষণ তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। এই সংঘর্ষকালে ওহুদ যুদ্ধে হযরত হামযাকে হত্যাকারী ওয়াহশী হযরত তোফায়েল ইবনুন্ নুমান ইবনু খানসা আল আনসারীকে বল্লম মেরে হত্যা করলো। এই দিন রসূল (স.) বললেন, মোশরেকরা আমাদেরকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে আসরের নামায পড়তে দেয়নি। আল্লাহ তায়ালা যেন ওদের পেট ও হৃদয় আগুন দিয়ে ভরে দেন।(১)

গভীর রাতে মুসলমানদের দুটো সেনাদল বাইরে গিয়ে পরস্পরকে চিনতে না পেরে এবং উভয়ে উভয়কে শত্রুপক্ষীয় মনে করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং কয়েকজন আহত ও নিহত হয়। এরপর তারা ইসলামী ধ্বনি দেন, 'হুম্মা, লা ইউনসারূন' অর্থাৎ 'অবধারিত হয়ে গেছে, ওরা জয়

---

(১) হযরত জাবের বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রসূল (স.)-এর সেদিন শুধু আসরের নামায কাযা হয়েছিলো। তবে মনে হয়, এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছিলো। একবার শুধু আসর এবং আর একবার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই কাযা হয়েছিলো।

লাভ করবে না।' এরপর তারা সংঘর্ষ থেকে বিরত হয়। রসূল (স.) এ খবর শুনে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আহত হয়েছে, তারা আল্লাহর পথে আহত এবং যারা নিহত হয়েছে তারা শহীদ গণ্য হবে।'

মুসলমানরা মোশরেকদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যখন পরিখার পাশে অবস্থান করছিলো, তখনই সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় কাটাচ্ছিলেন। কেননা ওখানে বসে তারা খবর পাচ্ছিলেন যে, ইহুদী গোত্র বনু কোরায়যা মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভংগ করেছে। এ কারণে তারা একমুহূর্তের জন্যেও নিশ্চিত হতে পারছিলো না যে, মোশরেক ও ইহুদীরা একযোগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না। অথচ এ দুই গোষ্ঠী তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এসেছিলো এবং এদের সম্মিলিত জনশক্তির মোকাবেলায় মুসলমানরা ছিলো নগন্য সংখ্যালঘু।

এছাড়া মোনাফেক ও গুজব রটনাকারীদের একটা বর্ণচোরা গোষ্ঠী শুধু মদীনায় নয়, বরং খন্দকের রণাংগনে মুসলিম সেনাদলের অভ্যন্তরেও তৎপর ছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'মোনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিলো তারা বলছিলো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা ভাওতা ছাড়া আর কিছু নয়।' (আয়াত ১২)

বস্তুত সেই লোমহর্ষক ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে এই লোকগুলো নিজেদের মনের গোপন কু মতলবগুলো প্রকাশ করার অবাধ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলো। তারা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত ছিলো যে, তাদেরকে কেউ তিরস্কার করবে না বা ধিক্কার দেবে না। তারা মুসলমানদেরকে অপমানিত করা ও বেকায়দায় ফেলা এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতির সত্যতা সম্পর্কে সংশয় ছড়িয়ে দেয়ারও মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলো। আর এ কাজের জন্যে কেউ তাদেরকে পাকড়াও করবে এমন আশংকাও তাদের ছিলো না। বরং মুসলমানদেরকে অপমানিত করা ও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার অপতৎপরতায় বাস্তব পরিস্থিতি তাদের সহায়ক ও সমর্থক ছিলো। তা সত্তেও তারা নিজেদের সাথে ও নিজেদের আবেগ অনুভূতির সাথে যুক্তিসংগত আচরণ করে যাচ্ছিল। আতংক ও ভীতির আতিশয্যে তারা আর কোনো রাখঢাক করার এবং তাদের কৃত্রিম ঈমানের তোয়াক্কা করারও প্রয়োজন অনুভব করছিলো না। তাই তারা সমস্ত দ্বিধা সংকোচ ঝেড়ে ফেলে যা বুঝেছিলো, তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলো।

এ ধরনের মোনাফেক ও বর্ণচোরা লোক সকল সমাজে ও সকল দলেই থাকে। বিপদাপদে তারা তাদের এই ধরনের লোকদের মতই ভূমিকা পালন করে। সকল দলে ও সকল প্রজন্মে যুগে যুগে বারবার তাদের আবির্ভাব ঘটে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখন তাদের একটা দল বললো, 'হে ইয়াসরাববাসী, এখানে তোমাদের টিকে থাকার অবকাশ নেই। কাজেই তোমরা ফিরে যাও।' (আয়াত ১৩)

তারা স্পষ্টতই মদীনাবাসীকে রণাংগন ছেড়ে চলে যেতে উদ্বুদ্ধ করলো এবং বাড়ী ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানালো। তাদের যুক্তি ছিলো যে, পরিখার সামনে তাদের এরূপ সংঘবদ্ধভাবে অবস্থানের কোনো অবকাশ নেই, বিশেষত তাদের বাড়ীঘর যখন নিরাপদ নয়। আসলে এটা একটা ন্যক্কারজনক আহ্বান, যা স্ত্রী ও সন্তানদের নিরাপত্তাহীনতার ওজুহাতে করা হতে থাকে। অথচ এ আশংকা নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

'তাদের একটা দল নবীর কাছ থেকে এই বলে ছুটি চায় যে, আমাদের ঘরবাড়ী অরক্ষিত।' অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়, এই ওজুহাতে তারা পরিবারের কাছে যাওয়ার অনুমতি চায়। 'অথচ তা মোটেই অরক্ষিত নয়।'

তারা নিছক মিথ্যাচার, প্রতারণা, কাপুরুষতা ও পলায়নী মানসিকতায় আক্রান্ত।'

'তারা পালানো ছাড়া আর কিছু চায় না।'

বর্ণিত আছে যে, বনু হারেসা গোত্র আওস বিন কায়সীর মারফত রসূল (স.)-এর কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠিয়েছিলো যে, আমাদের ঘরবাড়ী অরক্ষিত। আনসারদের কারো বাড়ীই আমাদের বাড়ীর মতো বিপজ্জনক অবস্থানে নেই। আমাদের ও গাতফানের মাঝে এমন কেউ নেই, যে তাদের আক্রমণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। কাজেই আমাদের অনুমতি দিন, আমরা বাড়ীঘরে গিয়ে ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। রসূল (স.) তাদেরকে অনুমতি দিলেন।' সাদ ইবনে মোয়ায এ খবর শুনে রসূল (স.)-কে বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, ওদেরকে অনুমতি দেবেন না। কারণ আমরা ও ওরা যখন কোনো বিপদে পড়ি, তখনই ওরা এ ধরনের অজুহাত খাড়া করে থাকে। তখন রসূল (স.) তাদের অনুমতি বাতিল করলেন।

কোরআন যাদের সম্পর্কে বলেছে যে, 'তারা পালানো ছাড়া আর কিছু চায় না' এই হচ্ছে তাদের পরিচিতি।

মোনাফেকদের চরিত্র বিশ্লেষণ

ঘোরতর অরাজকতা, আতংক ও পলায়নপরতার পরিবেশের চিত্র অংকনকারী এই চমকপ্রদ শৈল্পিক বিবরণ দিয়েই এখানে যুদ্ধ ও যুদ্ধের ময়দানের বর্ণনা শেষ হয়েছে। এরপর এইসব মোনাফেক ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের ঈমানের দুর্বলতা, কাপুরুষতা এবং বিপথগামী হবার সম্ভাবনাসহ তাদের মানসিক অবস্থার একটা সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ১৪ নং আয়াতে,

'আর যদি শত্রুরা নগরীর চতুর্দিক থেকে প্রবেশ করে বিদ্রোহের জন্যে তাদেরকে প্ররোচিত করতো, তবে তারা তৎক্ষণাত তাই করতো ......।'

এই ছিলো তখন পর্যন্ত তাদের ও শত্রুদের অবস্থা। শত্রুরা তখনো তাদের ওপর আক্রমণ চালায়নি। ভয়ভীতি ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা যতোই থাক, কল্পিত বিপদাশংকা ও বাস্তব বিপদ এক কথা নয়। যদি সেই বিপদ সত্যিই দেখা দিতো, তারা যদি চতুর্দিক থেকে মদীনায় ঢুকে পড়তো এবং তাদেরকে বিদ্রোহ করার অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগ করার প্ররোচণা দিতো, তাহলে তারা কোনো দ্বিধা সংকোচ না করেই তাই করতো। 'অল্প কিছু ব্যতীত' অর্থাৎ অল্পকিছু সময় ভেবে দেখা ব্যতীত বা অল্প কিছু লোক ব্যতীত-যারা কুফরিতে ফিরে যাওয়ার আগে একটু চিন্তাভাবনা করতো। বস্তুত তাদের ঈমান ছিলো দুর্বল ও অস্থিতিশীল। আর এ ধরনের দুর্বল ঈমান প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতার শামিল, যা কুফরির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পারে না।

এভাবে কোরআন তাদের মুখোস খুলে দিয়েছে। তাদের ওপর থেকে সকল আবরণ সরিয়ে দিয়েছে। তারপর তাদের আরো একটা চারিত্রিক বিকৃতিও তুলে ধরেছে, সেটা হচ্ছে ওয়াদা খেলাপী। আর সেটা কার সাথে? স্বয়ং আল্লাহর সাথে। তারা ইতিপূর্বেও তাঁর সাথে আরো বহু ব্যাপারে ওয়াদা করেছে। কিন্তু সে ওয়াদা রক্ষা করেনি। ১৫ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

ইবনে হিশাম বলেন, 'এ আয়াতে বনু হারেসা গোত্রের কথা বলা হয়েছে, যারা ওহুদ যুদ্ধের দিন ব্যর্থতার পরিচয় দেয়ার উপক্রম করেছিলো। তাদের সাথে বনু সালমাও ছিলো এবং উভয় গোত্রই সেদিন ওয়াদা ভংগ করতে উদ্যত হয়েছিলো। তারপর তারা আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে, আর কখনো যুদ্ধ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না বা পালাবে না। এখানে তাদের সেই প্রতিজ্ঞার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

ওহুদের দিনে তো আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর রহমত করেছেন এবং তাদের ব্যর্থতার কুফল থেকে বাঁচিয়েছেন। এটা ছিলো জেহাদের আদেশ আসার পরবর্তী সময়কার একটা প্রাথমিক প্রশিক্ষণ। কিন্তু আজ এতো দীর্ঘকাল পরে এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে কোরআন আর কোনো নমনীয়তা দেখাতে প্রস্তুত নয়। সে এ ধরনের আচরণকে অত্যন্ত কঠোরভাবে মোকাবেলা করে।

এই পর্যায়ে, যখন বিপদাশংকা থেকে মুক্তি ও ভীতি থেকে নিরাপত্তা লাভের আশায় প্রতিশ্রুতি ভংগ করা হয়েছে, তখন কোরআন তার অবশিষ্ট শিক্ষাগুলো এক একটাকে কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে। যে ভ্রান্ত চিন্তাধারা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি ভংগ করার ও রণাংগন থেকে পালানোর প্ররোচণা দেয় তা সংশোধন করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বলো, তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যা থেকে পালাও, তবে সেই পলায়নে কোনো লাভ হবে না....... ' (আয়াত ১৬-১৭)

আল্লাহ তায়ালা যে ভাগ্য নির্ধারণ করেন, সেটাই সকল ঘটনা ও তার পরিণামকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা ঘটনাবলীকে আল্লাহর পরিকল্পিত পথে ঠেলে দেয় এবং তার স্থীরিকৃত পরিণতিতে পৌঁছে দেয়। আর মৃত্যু বা হত্যা নির্ধারিত সময়ে ঘটা অবধারিত। তা থেকে রেহাই পাওয়া বা এক মুহূর্ত আগ পাছ হওয়া সম্ভব নয়। পলায়নকারী পালিয়ে তার অনিবার্য পরিণাম থেকে রক্ষা পায় না। পালানো সত্তেও নির্ধারিত ভাগ্য তাকে নির্দিষ্ট সময়ে বরণ করতেই হয়। আল্লাহর ইচ্ছা কেউ রোধ করতে পারে না, তা তিনি ভালো ইচ্ছা করেন বা মন্দ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত মানুষের আর কোনো রক্ষক বা সাহায্যকারী নেই। আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে না।

সুতরাং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। তার হুকুমের আনুগত্য করতেই হবে। তাঁর সাথে করা ওয়াদা সুখ-দুখ সর্বাবস্থায় পালন করতে হবে। সব ব্যাপারে তাঁর ওপর ভরসা করতে হবে, সব কিছুর বিচার বিবেচনা তাঁর হাতে ন্যস্ত করতে হবে। তারপর তিনি যা খুশী তাই করবেন।

এরপর বলা হয়েছে যে, জেহাদ থেকে পলায়নপর ও নিস্ক্রিয় সেসব লোক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন, যারা অন্যদেরকেও রণাংগনে যেতে দেয় না। তারা তাদেরকে বলে,

'তোমাদের অবস্থানের অবকাশ নেই কাজেই ফিরে যাও।'

এখানে তাদের এমন এক মানসিক অবস্থা চিত্রিত করা হয়েছে, যা খুবই অদ্ভুত। এই চিত্র অভ্রান্ত ও অকাট্য সত্য। তবে তা এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে হাসির উদ্রেক করে। এ ধরনের মানুষ যুগে যুগে বারবার আবির্ভূত হয়। একটু ভীতিজনক ও বিপদজনক অবস্থা দেখা দিলেই তারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করে। আর যখন ভালো অবস্থা থাকে, তখন তাদের মুখ হয়ে ওঠে অতিশয় বাকপটু। ভালো কাজ ও কল্যাণমূলক কাজ করতে তারা মানুষকে নিরুৎসাহিত করে। আর অনেক দূর থেকেও বিপদের আশংকা দেখা দিলে তারা ঘাবড়ে যায় ও অস্থির হয়ে পড়ে। কোরআনের ভাষায় এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে এমন চমৎকার রূপ দেয়া হয়েছে, যার তুলনা অন্য কোথাও নেই।

তোমাদের মধ্যে কারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে 'আমাদের কাছে এসো' তা আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন।' (আয়াত ১৮, ১৯ ও ২০)

আয়াতের সূচনাতেই বলা হয়েছে যে, যারা মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয় তাদের আল্লাহ ভালো করেই চিনেন ও জানেন। তারা

জেহাদে খুব কমই অংশ নেয়। তারা আল্লাহর কাছে খুবই পরিচিত এবং তাদের প্রতারণা কারো অজানা নেই।

'তোমাদের প্রতি বিরক্তি সহকারে।' অর্থাৎ তাদের মন মুসলমানদের প্রতি বিরক্ত ও বিদ্বিষ্ট। এই বিরক্তি ও বিদ্বেষ তাদের চেষ্টা সাধনায়, অর্থ সম্পদে ও আবেগ অনুভূতিতে সমভাবেই প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

'তারপর যখন বিপদ এসে পড়ে, তখন তাদেরকে দেখতে পাও, মৃত্যুর ভয়ে বেহুশ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় তোমার দিকে চোখ উল্টিয়ে তাকাচ্ছে।'

এটা মোনাফেকদের একটা স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ও চলমান চিত্র। সেই সাথে এটা তাদের একটা হাস্যোদ্দীপক ও বিদ্রূপাত্মক ও কাপুরুষোচিত চিত্রও। এতে দেখা যায় যে, তাদের প্রতিটা অংগ-প্রত্যংগ যেন বিপদের মুহূর্তে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে ও কাঁপার মাধ্যমে নিজের কাপুরুষতা ব্যক্ত করছে। তাদের আরো হাস্যোদ্দীপক চিত্র ফুটে ওঠে তখন, যখন বিপদ দূর হয়ে শান্তি ফিরে আসে।

'যখন বিপদ দূর হয়ে যাবে, তখন তারা লম্বা লম্বা বুলি আওড়িয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবে'

তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে। তাদের কাঁপুনি থেমে যাবে এবং তারা উচ্চস্বরে কথা বলবে। গর্বে ও অহংকারে তারা মত্ত হয়ে যাবে। সমস্ত লজ্জা ও সংকোচ ঝেড়ে ফেলে তারা যুদ্ধে বড়ো বড়ো বীরত্ব ও কৃতিত্বের দাবী করবে।

এসবই করবে তারা বিজয়ের সুফল ভোগ করার লোভে,

'কল্যাণের লোভে'

অথচ এতোসব বড়ো বড়ো দাবী করা সত্তেও তারা এই কল্যাণ লাভের জন্যে নিজেদের বিন্দুমাত্রও শ্রম, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে না।

এ ধরনের মানুষ কোনো কালেও কোনো প্রজন্মে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। সব সময়ই তারা সমাজে বিদ্যমান থাকে। দেশে যখন সুখ শান্তি বিরাজ করে, তখন তারা ভয়ংকর বীরদর্পে বিচরণ করে, সবকিছুতে অগ্রণী থাকে এবং উঁচু গলায় কথা বলে। কিন্তু যেখানেই ভয়ভীতি ও বিপদাশংকা বিরাজ করে, সেখানে তারা অতিমাত্রায় ভীরু, কাপুরুষ ও নীরব। সৎকাজ ও সৎকর্মশীলদের বেলায় তারা অত্যধিক কৃপণ। লম্বা লম্বা বুলি কপচানো ছাড়া তারা আর কিছুই ব্যয় করে না।

'তারা আদৌ ঈমান আনেনি, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় সৎ কাজ বাতিল করে দিয়েছেন।'

এটা হচ্ছে প্রথম কারণ। তাদের হৃদয়ে ঈমানের নামগন্ধও ঢোকেনি, ঈমানের আলোয় তা আলোকিত হয়নি এবং ঈমানের পথে চালিতও হয়নি।

'তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের সৎ কাজগুলো বাতিল করে দিয়েছেন।'

সৎ কাজগুলো বৃথা গেছে। কেননা ওগুলোর সফলতার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান এবং সেই ভিত্তিই সেখানে অনুপস্থিত।

'এটা আল্লাহর কাছে নিতান্ত সহজ।'

বস্তুত আল্লাহর কাছে কঠিন বা জটিল বলতে কিছু নেই। আল্লাহ যা করতে চান, তা অনায়াসেই করে ফেলেন।

এরপর খন্দক যুদ্ধে মোনাফেকদের হাস্যকর ভূমিকার আরো বিবরণ আসছে পরবর্তী আয়াতে,

'তারা মনে করে যে, হানাদার দলগুলো এখনো যায়নি।'

অর্থাৎ তাদের কাঁপুনি, ভীরুতা ও ভীতি ছড়ানোর তৎপরতা এখনো চলছে। তারা এখনো স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় যে, হানাদাররা চলে গেছে। ভয়ভীতি কেটে গেছে এবং শান্তি ফিরে এসেছে।

'আর হানাদার বাহিনীগুলো যদি ফিরে আসে, তাহলে তারা প্রত্যাশা করে যে, তারা যদি মরুবাসী বেদুঈন হয়ে তোমাদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করে বেড়াতে পারতো তাহলেই ভালো হতো।' ....

কী হাস্যকর ও ন্যক্কারজনক চিত্র! হানাদার বাহিনীগুলো এলে এই কাপুরুষরা মনে করে, আহা, আমরা যদি মদীনাবাসী না হয়ে মরুচারী বেদুঈন হতাম। মদীনাবাসীর জীবন ও ভাগ্যের অংশীদার না হতাম, তাদের কী হচ্ছে তা না জানতাম এবং এতো নিরাপদ দূরত্বে থাকতাম যে, তাদের সম্পর্কে একজন প্রবাসী যেমন আরেক জন প্রবাসীকে জিজ্ঞেস করে, তেমনি জিজ্ঞেস করে জেনে নিতাম, তাহলেই ভালো হতো।'

এরকমই ছিলো তাদের হাস্যোদ্দীপক বাসনা। অথচ তারা ছিলো নিষ্ক্রীয়, যুদ্ধ বিমুখ এবং যুদ্ধের সাথে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিলো না। দূর থেকেই তারা ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকতো, তবে খুব কমই যুদ্ধ করতো।'

এ পর্যন্তই শেষ হয়ে যাচ্ছে মদীনার নবীর ইসলামী সমাজে জীবন যাপনকারী এই বর্ণচোরা ভন্ড মুসলমানদের চরিত্র চিত্রণ। এ ধরনের ভন্ডদের আবির্ভাব প্রত্যেক প্রজন্মেই বারবার ঘটে থাকে এবং ঘটবে। চিরদিনই তাদের একই ধরনের স্বভাব এবং একই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই শ্রেণীটির প্রতি ঘৃণা, ধিক্কার, বিদ্রূপ, আল্লাহ তায়ালা ও জনগণের কাছে এদের মর্যাদাহীনতা এবং এদের কাছ থেকে দূরে থাকার শিক্ষাই এই আলোচনার সার কথা।

আদর্শ মানুষ হযরত মোহাম্মদ (স.)

ওপরে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে, ওটা ছিলো মোনাফেক তথা কপট ও ভন্ড মুসমানদের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত তথা বিপথগামী মুসলমানদের এবং মুসলিম সমাজে নানারকমের কুৎসা রটনা, অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানোর অপকর্মে নিয়োজিত বর্ণচোরা গৃহশত্রুদের। এটা ছিলো তাদের চরিত্রের কুৎসিত দিক। তবে বিপদ-মুসিবত ও দুর্যোগ দুর্বিপাক মুসলমানদের সবাইকে পুরোপুরি বিকৃত ও বিপথগামী করতে পারেনি। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতরেও একশ্রেণীর আলোকোজ্জ্বল, অটল ও দৃঢ় প্রত্যয়ী, আল্লাহর ওপর আস্থাশীল, তাঁর ফয়সালায় তুষ্ট এবং তাঁর সাহায্য লাভে আশাবাদী একশ্রেণীর মুসলমানও ছিলো। সমস্ত ভয়ভীতি, ও বিপদ-মুসিবতকে উপেক্ষা করে তারা নিজেদের নৈতিক মান টিকিয়ে রেখেছিলো।

এই দীপ্তিমান শ্রেণীটার বিবরণ স্বয়ং রসূল (স.)-এর বর্ণনা দিয়েই শুরু হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ-যারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ তায়ালাকে বেশী করে স্মরণ করে তাদের জন্যে।' (আয়াত ২১)

সেই বিপজ্জনক ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতেও রসূল (স.) মুসলমানদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টিযুক্ত আশ্রয়স্থল ছিলেন এবং তাদের আশা ভরসা ও পরিতুষ্টির উৎস ছিলেন। এই ভয়ংকর ঘটনায় অর্থাৎ খন্দক যুদ্ধে রসূল (স.) যে নীতি অনুসরণ করেন, তাতে বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগঠনের নেতাদের জন্যে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যারা আল্লাহ তায়ালা ও

আখেরাতে বিশ্বাসী, যাদের মন পবিত্র ও নিখুঁত আদর্শ কামনা করে এবং আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ রাখে, ভুলে যায় না, তাদের জন্যে রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

রসূল (স.)-এর জীবনে যে উত্তম ও চমৎকার অনুকরণীয় আদর্শ রয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া তো সম্ভব নয়, তবে উদাহরণস্বরূপ তার কিছু নমুনা তুলে ধরছি,

রসূল (স.) খন্দক বা পরিখা খননের কাজে মুসলমানদের সাথে সর্বতোভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বহস্তে কোদাল দিয়ে মাটি কাটা, ঝুঁড়িতে করে মাটি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, সাধারণ মুসলমানদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে উদ্দীপনাময় ধ্বনি বা শ্লোগান দেয়াসহ সব কাজে অংশ নেন। মুসলমানরা প্রচলিত ঘটনাবলীর শিক্ষা সম্বলিত সহজ-সরল কিছু গানও সমবেত সুরে গাচ্ছিলো। এই মুসলমানদের মধ্যে 'জুয়াইল' নামে এক ব্যক্তি ছিলো। রসূল (স.) তার নামটা অপছন্দ করলেন এবং তাঁর নাম রাখলেন আমর। তৎক্ষনাৎ পরিখা খননের কাজে নিয়োজিত লোকেরা সমবেত স্বরে গেয়ে উঠলো,

'নাম ছিলো তার জুয়াইল রসূল রাখলেন আমর
দুস্থ মানুষটির দিন হয়ে গেলো উজ্জ্বল সুদিন।'

আর তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে রসূলও (স.) গাইলেন। আমরা ভেবে দেখতে পারি, কেমন পরিবেশে মুসলমানরা কাজ করছিলো। রসূল (স.) তাদের মধ্যেই ছিলেন, কখনো কোদাল দিয়ে মাটি কাটছিলেন, কখনো ঝুড়িতে বয়ে মাটি সরাচ্ছিলেন, আর তাদের সাথে সমবেত কণ্ঠে উদ্দীপনামূলক গানও গাইছিলেন। ভেবে দেখা উচিত, এই পরিবেশ তাদের অন্তরাত্মায় কোন্ শক্তি সঞ্চারিত করছিলো, তাদের সত্ত্বার অভ্যন্তরে বীরত্ব, সাহস, প্রত্যয়, আত্মসম্মানবোধ ও সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার মনোভাব কোন্ উৎস থেকে এনে দিচ্ছিলো।

যায়দ বিন ছাবেত মাটি সরানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। রসূল (স.) তার প্রশংসা করে বললেন, বালকটা চমৎকার! ক্লান্তি ও অবসাদে এক সময় সে পরিখার ভেতরে ঘুমিয়ে পড়লো। তখন প্রচন্ড শীত। আম্মারা ইবনে হাযম যায়েদের অস্ত্রটা নিয়ে গেলেন। যায়দ তা টের পেলো না। পরে সে জেগে উঠে অস্ত্র না পেয়ে অস্থির হয়ে পড়লো। রসূল (স.) তাকে বললেন, 'ওহে ঘুমের বাবা, তুমি এমন ঘুমই পেড়েছো যে, তোমার অস্ত্র হারিয়ে গেছে।' তারপর পুনরায় বললেন, এই বালকের অস্ত্রের সন্ধান কারো জানা আছে নাকি? আম্মারা বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ, ওর অস্ত্র আমার কাছে আছে। তিনি বললেন, তাহলে ওটা ওকে ফিরিয়ে দাও। সেই সাথে বললেন, খেলাচ্ছলেও কখনো কোনো মুসলমানকে আতংকিত করা উচিত নয় এবং তার কোনো জিনিস নেয়া উচিত নয়।'

এটা এমন একটা ঘটনা, যা মুসলিম বাহিনীর প্রত্যেক ছোট ও বড়ো সদস্যের চোখ ও মনের সচেতনতা ফুটিয়ে তোলে। সেই সাথে 'হে ঘুমের বাবা, এমন ঘুম ঘুমিয়েছো যে, তোমার অস্ত্র উধাও হয়ে গেছ .... ' এ উক্তির সন্ধান পাই সেই কঠিনতম পরিস্থিতিতেও মুসলমানরা পরিখাগুলোর ভেতরে তাদের নবীর নেতৃত্বে কেমন মিষ্ট ও মমতা বিজড়িত পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলো।

তাছাড়া কোদাল দিয়ে মাটি কাটার সময়েও রসূল (স.)-এর অন্তরাত্মা ইসলাম ও মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিলো এবং সে কথা তিনি মুসলমানদেরকে জানিয়ে তাদের ভেতরে দৃঢ় আস্থা ও প্রত্যয় গড়ে তুলছিলেন।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, 'সালমান ফারসী বলেছেন যে, আমি খন্দকের এক কিনারে কোদাল চালালাম। কিন্তু একটা পাথর আমার কাছে অত্যন্ত শক্ত মনে হলো। রসূল (স.) তখন

আমার কাছেই ছিলেন। আমাকে যখন মাটিতে আঘাত করতে দেখলেন এবং জায়গাটা আমার কাছে শক্ত লাগছে বলে অনুভব করলেন, তখন তিনি পরিখার ভেতরে নামলেন এবং আমার কাছ থেকে কোদালটা নিলেন। তারপর এমন জোরে কোদাল মারলেন যে, বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। তারপর পুনরায় কোদাল মারলেন। এবারও আগুন জ্বলে উঠলো। তৃতীয়বারও কোদাল মারলেন এবং আগুন জ্বললো। আমি বললাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার মা বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক! এটা কী দেখলাম? আপনি কোদাল দিয়ে আঘাত করা মাত্র আগুন জ্বললো কেনো? তিনি বললেন, হে সালমান, তুমি কি এটা দেখেছো? আমি বললাম, জ্বী হা! তিনি বললেন, প্রথম আগুন জ্বালার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইয়ামানের বিজয় দেবেন। দ্বিতীয়টার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সিরিয়া ও পাশ্চাত্যের বিজয় দেবেন। আর তৃতীয়টার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রাচ্যের বিজয় দান করবেন।

মিকরীযী রচিত 'ইমতাউল আসমা' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এ ঘটনায় হযরত সালমান ফারসী উপস্থিত ছিলেন বটে। তবে ঘটনাটা রসূল (স.) এর সাথে নয়, বরং হযরত ওমরের সাথে ঘটেছিলো।

আমাদের ভাবা দরকার যে, যে সময়ে মদীনার সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চরম সংকট ও হুমকির সম্মুখীন, তখন এ কথাটা তাদের অন্তরে কিভাবে রেখাপাত না করে থাকতে পারে, ওদিকে হানাদার বাহিনীর খবরাখবর নিয়ে হযরত হোযায়ফা যখন ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলেন, তখনকার দৃশ্যটাও লক্ষ করার মতো। তখন স্বীয় স্ত্রীর একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে নামায আদায়রত থেকেও রসূল (স.) হোযায়ফার প্রতি নিস্পৃহ থাকতে পারলেন না, বরং নামাযের ভেতরেই তিনি হোযায়ফাকে পায়ের কাছে বসালেন এবং তার গায়ের ওপর নিজের কম্বলের একাংশ দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর নামায শেষে হোযায়ফা (রা.) রসূল (স.)-কে সেই সুসংবাদটা দিলেন, যা তিনি আগেভাগেই জেনে নিয়েছিলেন। হোযায়ফাকে কেবল হানাদার বাহিনীর পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণের জন্যেই পাঠিয়েছিলেন।

এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে রসূল (স.) এর সাহসিকতা, ধৈর্য, ও বিশ্বাস কেমন ছিলো, সেটা সমগ্র ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত। সেগুলো নতুন করে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। ওগুলো সকলেরই জানা আছে।

আল্লাহ তায়ালা যথার্থই বলেছেন,

'তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।' ....

মানবীয় দোষ গুণ সহ একজন মোমেনের পরিচয়

এরপর আসছে অটুট ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয়ের দৃশ্য তথা ঈমানী জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় মুসলমানরা সেই ভয়াবহ সংকট কিভাবে মোকাবেলা করলেন তার দৃশ্য। যে সংকট মোমেনদের হৃদয়কে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো, সেই সংকটকে তারা শুধু ধৈর্যের সাথে মোকাবেলাই করেননি, বরং তা থেকে দৃঢ় প্রত্যয়, আস্থা ও পরিতৃপ্তিও অর্জন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর যখন মুসলমানরা হানাদার বাহিনীগুলোকে দেখলো, তখন বললো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন, এটা তো তারই বাস্তব রূপ। আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূল সত্য কথাই বলেছেন। বস্তুত এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে'।

বস্তুত খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানরা যে ভীতি, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ত্রাসের কবলে পড়েছিলো, তা এতো কঠিন, মারাত্মক ও ভয়াবহ ছিলো যে, তা তাদেরকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন,

'সেখানে ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো এবং প্রবলভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হয়েছিলো।'

তারা তো মানুষই ছিলেন। আর মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মানবীয় শক্তির অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেন না। আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষে সাহায্য করবেনই এই বিশ্বাস থাকা সত্তেও এবং রসূল (স.)-এর ইয়ামান, সিরিয়া, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিজয়ের সুসংবাদ পাওয়া সত্তেও উপস্থিত ভয়াবহ বিপদ তাদেরকে দিশাহারা, অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে তুলছিলো।

এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সবচেয়ে নিখুঁত বর্ণনা আমরা হযরত হোযায়ফা থেকে পাই। রসূল (স.) তাঁর সাহাবীদের অবস্থা তখন অনুভব করছিলেন এবং ভেতর থেকেই তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাই বললেন, এমন কে আছে যে, কাফেরদের অবস্থার খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে আসতে পারবে? অর্থাৎ রসূল (স.) বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শর্ত আরোপ করছিলেন যে, যে ব্যক্তি যাবে, তাকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে, তারপর বললেন, এই ব্যক্তি যাতে বেহেশতে আমার সাথী হয়, সে জন্যে আমি আল্লাহর কাছে আবেদন জানাবো।' ফিরে আসার এই শর্ত এবং বেহেশতে রসূল (স.)-এর সাথী হবার এই দোয়া সত্তেও কোনো সাহাবী তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন না। কেবল নাম ধরে হোযায়ফা (রা.)-কে ডাকার পরই তিনি যেতে উদ্বুদ্ধ হলেন। তিনি বলেন, তিনি যখন আমাকে ডাকলেন, তখন আমার উঠে দাঁড়ানো ছাড়া উপায়ন্তর ছিলো না। সর্বোচ্চ পর্যায়ের আতংকের শিকার হওয়া ছাড়া এমন ব্যাপার যে ঘটতেই পারে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এই ভীতিজনিত কাঁপুনি, চোখ উল্টে যাওয়া ও শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম সত্তেও আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি এবং আল্লাহর চিরাচরিত রীতিনীতি সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি ভ্রষ্ট হয়নি। তাদের এ বিশ্বাস অটুট ছিলো যে, আল্লাহর পরীক্ষার স্তর যখন সফলতার সাথে উতরে যাওয়া যাবে, তখন তার সুফল তথা বিজয় অবশ্যই আসবে। এ জন্যে মুসলমানরা তাদের এই প্রাণান্তকর কষ্টের পর আল্লাহর সাহায্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং বিজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন। কেননা তারা ইতিপূর্বে সূরা বাকারার এই আয়াতের বক্তব্যকে বাস্তবায়িত করেছিলেন,

'তোমরা কি ভেবেছ, বেহেশতে চলে যাবে, অথচ এখনো তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিপদ মুসিবত আসেনি। তাদের ওপর এতো বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট এসেছে যে, তারা কেঁপে উঠেছে। এমনকি রসূল ও তাঁর সাথীরা বলে উঠেছে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।'

যেহেতু তারাও কেঁপে উঠেছে। তাই আল্লাহর সাহায্য তাদের কাছেও আসন্ন। এ জন্যেই তারা শত্রুদেরকে দেখে বলেছে যে, 'এটা তো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তারই বাস্তব রূপ। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সত্য কথাই বলেছেন। এটা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণকে কেবল বাড়িয়েই দিয়েছে।'

যেহেতু তারা মানুষ ছিলেন, তাই মানবীয় আবেগ অনুভূতি ও দুর্বলতার উর্ধ্বে তারা ছিলেন না এবং সেটা তাদের কাছে আশাও করা হয়নি। মানুষ তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের উর্ধ্বে উঠবে, বা সেই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে, তা কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মানুষ বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা মানুষই থাকে, ফেরেশতা, শয়তান, জীব জানোয়ার, গাছ পাথর ইত্যাদিতে পরিণত না হয়। মানুষ হিসেবে তারা ভীতিজনক পরিস্থিতিতে ভীত সন্ত্রস্ত হতেন, বিপদে-আপদে

বিব্রত হতেন এবং ক্ষমতা বহির্ভূত সংকটে পড়ে ভয়ে কাঁপতেন। কিন্তু এসব সত্তেও তারা আল্লাহর সাথে সেই অটুট বন্ধনে আবদ্ধ থাকতেন, যা তাদেরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রাখতো, তাদেরকে পতন থেকে রক্ষা করতো, তাদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করতো এবং কখনো হতাশায় ভেংগে পড়তে দিত না। এভাবে তারা মানবেতিহাসে এমন বিরল জাতের মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, যা ছিলো অতুলনীয় ও নযীরবিহীন।

এ জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে এ জন্যে যে, আমরা মানবেতিহাসের এই নযীরবিহীন ও শ্রেষ্ঠমানের মানুষগুলোকে যেন চিনতে ও বুঝতে পারি। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, তারা মানুষ ছাড়া আর কিছু ছিলেন না এবং মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি তথা জন্মগত দোষগুণের উর্ধেও ছিলেন না। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, তারা মানুষ হয়েও মানুষের পক্ষে যে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব, সেই সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। মানবীয় দোষগুণের অধিকারী হয়েও তারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমেই সেই সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন।

আমরা যখন দেখি যে, আমাদের চরিত্রে কোনো দুর্বলতা ও দোষ ঢুকে গেছে কিংবা যখন দেখি যে, আমরা কোনো পার্থিব ভয়ভীতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি, তখন আমাদের নিজেদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে যাওয়া উচিত নয় এবং এমন ভাবা উচিত নয় যে, আমরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। কিংবা সমস্ত মহৎ কাজের যোগ্যতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তবে আমাদের জন্মগত স্বভাব এবং আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর মানুষদের ভেতরেও ছিলো বিধায়, ওগুলো ভালো ও মহৎ-এরূপ মনে করা অন্যায়। মহান আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে এবং সেই সম্পর্কের সাথে সামঞ্জস্যশীল গুণবৈশিষ্ট গড়ে তুলতে হবে যাতে আমরা দুর্বলতা ও কাপুরুষতা থেকে রক্ষা পাই। আত্মবিশ্বাস এবং বিবেকের তুষ্টি ও তৃপ্তি পুনর্বহাল করা আমাদের কর্তব্য। যতো আতংকজনক দুর্যোগই আসুক, বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ওটা আমাদের বিজয়ের সুসংবাদ মাত্র। আর এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ধৈর্য, স্থিরতা, সাহসিকতা ও মনোবল গড়ে তুলতে হবে, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও খুঁত খুঁতে মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং দ্বিধাহীন ও নির্ভীকচিত্তে পথ চলা অব্যাহত রাখতে হবে। এই ভারসাম্যপূর্ণ গুণাবলী ও মানসিকতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিলো ইসলামের প্রথম যুগের সেই শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী- যাদের অতীতের উজ্জ্বল ভূমিকা, আল্লাহর কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তরণ, সর্বাত্মক জেহাদ এবং আল্লাহর সাথে করা অংগীকার রক্ষায় আপোষহীন ভূমিকার কথা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভূমিকা পালন করতে করতে কেউবা আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেছে, কেউবা পৌঁছার প্রতীক্ষায় রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ঈমানদারদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি এমন রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে করা অংগীকার পূরণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউবা শহীদ হয়েছে, কেউবা শহীদ হবার অপেক্ষায় রয়েছে। ......' (আয়াত ২৩)

এর ঠিক বিপরীত হলো তারা, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথে অংগীকার করেছে যে, কখনো কাপুরুষের মতো জেহাদ থেকে পালাবে না, কিন্তু সেই অংগীকার রক্ষা না করে তারা তারা পালিয়েছে।

ইমাম আহমাদ (র.) হযরত ছাবেতের একটা বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এই বর্ণনায় হযরত ছাবেত বলেন, 'আমার চাচা আনাছ ইবনুন নাযার (রা.) রসূল (স.)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এটা সহ্য করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। তিনি বললেন, রসূল (স.)-এর অংশ নেয়া প্রথম যুদ্ধটায় আমি অনুপস্থিত থেকে গেলাম! পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা

যদি আর কোনো যুদ্ধ আমার জীবদ্দশায় সংঘটিত করেন, তাহলে আমি কী করবো, সেটা আল্লাহ তায়ালা দেখতেই পাবেন। (অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে অংশ নেবো) ছাবেত বলেন, তিনি এ ছাড়া অন্য কিছু (নির্দিষ্টভাবে) বলতে সাহস করেননি। পরে তিনি রসূল (স.)-এর সাথে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধ চলাকালে তিনি সাদ ইবনে মোয়ায (রা.)-কে দেখে আনাস (রা.) বললেন, 'ওহে আমরের বাবা, কোথায় যাচ্ছ? আমি কিন্তু ওহদের অপর পাশ থেকে বেহেশতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।' এই বলেই লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তার দেহে ৮০ টারও বেশী তরবারী, বর্শা ও তীরের আঘাত ছিলো। হযরত আনাসের বোন অর্থাৎ আমরের ফুফু রুহিয়্যী বিনতে নাযার বলেছেন, 'আমি আমার ভাইকে শুধু তার আংগুল দেখে চিনেছি।' হযরত ছাবেত বলেন, এই ঘটনা উপলক্ষেই উক্ত ২৩ নং আয়াত নাযিল হয়। অনেকে মনে করতেন যে, এ আয়াত রসূল (স.) এবং তার সাহাবীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হাদীসটা মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন।)

এই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মোমেনদের সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মোনাফেকী, ভন্ডামী, দুর্বল ঈমান ও অংগীকার ভংগ করার মোকাবেলায় এগুলোর বিপরীত ঈমানের পূর্ণাংগ চিত্র তুলে ধরা যাতে কোরআনের শিক্ষা ও ময়দানী শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের প্রশিক্ষণের কাজটা সমাধা করা যায়।

পরবর্তী আয়াতে এসব পরীক্ষার নিগূঢ় উদ্দেশ্য এবং অংগীকার পালন করা ও ভংগ করার পুরস্কার ও শাস্তি কী তা বর্ণনা করা আর এসব কিছুর বেলায় আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সবকিছুকে সোপর্দ করার কথা বলে মন্তব্য করা হয়েছে। (আয়াত ২৪)

সব ঘটনার মাঝখানেই এ ধরনের মন্তব্য করা হয়ে থাকে, যাতে ব্যাপারটাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে ন্যস্ত করা যায় এবং ঘটনাবলীতে আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্য বর্ণনা করা যায়। কেননা কোনো ঘটনাই নিরর্থক নয় বা কাকতালীয় নয়। যা কিছুই ঘটে, আল্লাহর সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও মহৎ উদ্দেশ্য অনুসারেই ঘটে। তিনি যে ঘটনাকে যে খাতে প্রবাহিত করতে চান, তা সেই খাতেই প্রবাহিত হয়। এবং তাতেই আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা লাভ করা যায়। তাঁর দয়া ও ক্ষমাই সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে নিকটবর্তী। 'আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

মদীনায় ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও তাদের পতন

অতপর এই বিরাট ও ভয়াবহ ঘটনার বিবরণের সমাপ্তি টানা হচ্ছে এর সেই শেষ ফল বর্ণনার মাধ্যমে, যা মহান প্রতিপালক সম্পর্কে মোমেনদের সুধারণার সত্যতা প্রতিপন্ন করে, মোনাফেক ও গুজব রটনাকারীদের বিপথগামিতা ও তাদের ধ্যান-ধারণার ভ্রান্তি তুলে ধরে এবং ঈমানী মূল্যবোধগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে,

'আর আল্লাহ কাফেরদেরকে ফেরত পাঠালেন এমনভাবে যে, তারা কোনোই সুফল অর্জন করতে পারেনি। (আয়াত-২৫)

যুদ্ধ শুরু হয়েছে, অগ্রসর হয়েছে এবং শেষ হয়েছে। এই সবক'টা পর্যায়েই তার নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে থেকেছে। তিনি যেভাবে চেয়েছেন, তাকে চালিয়েছেন। কোরআন নিজস্ব ভাষায় ও বর্ণনাভংগীতে এ বিষয়টা ব্যক্ত করেছে এবং যুদ্ধের প্রতিটা ঘটনা ও ফলাফলকে সরাসরি আল্লাহর অবদান বলে ঘোষণা করেছে, যাতে এই সত্য প্রমাণিত হয়, হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং বিশুদ্ধ ইসলামী ধ্যান ধারণা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

খন্দক যুদ্ধের ফলে শুধু কোরায়শ ও বনু গাতফানের মোশরেকরাই বিপর্যয়ের কবলে পড়েনি, বরং মোশরেকদের মিত্র ইহুদী গোত্র বনু কোরায়যাও ঘোরতর বিপর্যয়ের শিকার হয়। ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে এই বিপর্যয়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এই কাহিনী বর্ণনার জন্যে মুসলানদের সাথে ইহুদীদের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা প্রয়োজন।

মদীনায় ইসলাম ও মুসলমানদের আগমনের পর ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে অল্প কিছুদিন ছাড়া শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেনি। অথচ রসূল (স.) মদীনায় আসার অব্যবহিত পরই তাদের সাথে একটা শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। সেই চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষের পরস্পরকে সাহায্য করা ও আক্রান্ত হলে রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। তাদের ওপর এই শর্তও আরোপ করা হয় যে, কখনো এই চুক্তি লংঘন করা যাবে না, কারো ওপর বাড়াবাড়ি করা যাবে না, গোয়েন্দাগিরি করা চলবে না, শত্রুকে সাহায্য করা চলবে না এবং কাউকে কোনোরকমের কষ্ট দেয়া চলবে না।

কিন্তু ইহুদীরা শীঘ্রই বুঝতে পারলো যে, প্রথম আসমানী কেতাবধারী হিসেবে তারা মদীনায় এতোকাল যে ঐতিহ্যগত মর্যাদা ভোগ করে এসেছে, তা ইসলামের কারণে হুমকির সম্মুখীন। অনুরূপভাবে রসূল (স.)-এর নেতৃত্বে নতুন সামাজিক অবকাঠামো পুর্নগঠনের যে কাজ করা হয়, তাতেও তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। কেননা ইতিপূর্বে তারা মদীনায় নিজেদের আধিপত্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বিরোধকে কাজে লাগাতো। কিন্তু ইসলাম এসে রসূল (স.)-এর নেতৃত্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে ঐক্যবদ্ধ করে ফেললো। ফলে দুই গোত্রের বিরোধের সুযোগে তাদের ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অবকাশ আর রইল না।

সব শেষে মদীনার ইহুদীদের ওপর যে ঘটনা মড়ার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে নেমে এসে তাদের মেরুদন্ড ভেংগে দিলো। তা ছিলো তাদের সবচেয়ে বড়ো পন্ডিত ও আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ। এই ইহুদী আলেম যখন সর্বান্তকরণে উপলব্ধি করলেন যে, ইসলামই একমাত্র সত্য সঠিক ধর্ম, তখন তিনি শুধু নিজেই ইসলাম গ্রহণ করলেন না, বরং তার পরিবার-পরিজনকেও ইসলাম গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু তিনি আগে ভাগে ইসলামের ঘোষণা দিলে ইহুদীরা তার সম্পর্কে নানারকমের মনগড়া অভিযোগ তুলবে, এই আশংকায় ঘোষণা দিলেন না। বরং রসূল (স.)-কে অনুরোধ করলেন, তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানানোর আগে তিনি যেনো তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক। রসূল (স.) তাই করলেন। ইহুদীরা জবাব দিলো যে, তিনি তো আমাদের নেতার ছেলে নেতা, আমাদের বড়ো আলেম ও পন্ডিত। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তাদের সামনে বেরিয়ে এলেন এবং তাদেরকে অনুরোধ করলেন তার মতো ইসলাম গ্রহণ করতে। আর যায় কোথায়! তারা তার সাথে ঝগড়া শুরু করে দিলো, তাকে নানারকমের অশালীন ও অশ্রাব্য কটূবাক্য শোনাতে লাগলো। তারা ইহুদী গোত্রগুলোকে তার উপদেশ গ্রহণ করা থেকে সাবধান করে দিলো। তথাপি ইহুদীরা বুঝতে পারলো যে, তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবার যথার্থই বিপন্ন। তাই তারা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে মারাত্মক চক্রান্ত শুরু করে দিলো।

এই দিন থেকেই শুরু হয়েছে ইহুদীদের সাথে ইসলামের প্রাণান্তকর লড়াই এবং সে লড়াই আজো আব্যাহত রয়েছে।

প্রথমে শুরু হলো আজকালকার ভাষায় যাকে বলা হয় স্নায়ূযুদ্ধ বা ঠান্ডা লড়াই। রসূল (স.) ও ইসলামের বিরুদ্ধে শুরু হলো ঘোরতর অপপ্রচার। এই যুদ্ধে ইহুদীরা তাদের অতীতের সুপরিচিত যাবতীয় অপকৌশলগুলো প্রয়োগ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ তারা মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়ত সম্পর্কে সন্দেহ ও ইসলামী মতাদর্শের সত্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতে লাগলো। কখনো আবার মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভেদ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করতে লাগলো। কখনো আওস ও খাযরাজের মাঝে এবং কখনো আনসার ও মোহাজেরদের মাঝে

বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালালো। কখনো মুসলমানদের ভেতরকার গোপন তথ্য জানার জন্যে গোয়েন্দাগিরির কৌশল অবলম্বন করে তাদের শত্রু মোশরেকদের সাহায্য করতে লাগলো। কখনো মুসলিম নামধারী মোনাফেকদেরকে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করতে লাগলো। সবার শেষে তারা তাদের সমস্ত মুখোস খুলে ফেলে নগ্নভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুদেরকে সংঘবদ্ধ করতে লাগলো, যেমনটি করেছে খন্দক যুদ্ধে। প্রধান ইহুদী গোত্রগুলো ছিলো বনু কাইনুকা, বনু নযীর ও বনু কোরায়যা। রসূল (স.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র আক্রোশ ছিলো। এদের মধ্যে বনু কাইনুকাই ছিলো সবচেয়ে শৌর্য বীর্যধারী ইহুদী গোত্র। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভের কারণে তারা তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। তাদের ও রসূল (স.)-এর মাঝে যে চুক্তি ছিলো, সেটা তারা লংঘন করতে লাগলো। পাছে তিনি ও তার দল এতো শক্তিশালী হয়ে যায় যে, পরে আর তাদেরকে প্রতিরোধ করা যাবে না-এই আশংকায় তারা তখন থেকেই তাদের শক্তি খর্ব করার চেষ্টা করতে লাগলো। কেননা কোরায়েশদের সাথে প্রথম সংঘর্ষেই তাদের বিজয় লাভ করায় এই ধারণাই বদ্ধমূল হতে শুরু করেছিলো যে, ভবিষ্যতে হয়তো মুসলমানদের পথ আর আগলে রাখা যাবে না।

সীরাতে ইবনে হিশামে বলা হয়েছে,

রসূল (স.) বনু কাইনুকার বাজারে এক জনসভায় তাদেরকে সমবেত করে বললেন, 'হে ইহুদী সম্প্রদায়, কোরায়শদের ওপর যে ধরনের বিপর্যয় নেমে এসেছে, তেমন কিছু সংঘটিত হবার আগে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে সাবধান হও এবং ইসলাম গ্রহণ করো। তোমরা তো জেনেছোই যে, আমি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের কেতাবেও এটা রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশও দিয়েছেন।' তারা বললো, ওহে মোহাম্মদ! তুমি কি আমাদেরকে তোমার গোত্র কোরায়শ ভেবেছো? যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয় এমন একটা গোত্রের ওপর জয়ী হয়ে তুমি অহংকারী হয়ে যেও না। আল্লাহর কসম, আমরা যদি তোমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই, তাহলে তুমি জানতে পারবে আমরা মানুষ বটে।'

সীরাতে ইবনে হিশামে আরো বলা হয়েছে,

জনৈকা মুসলিম মহিলা দুধ নিয়ে বনু কাইনুকার বাজারে বিক্রি করতে এসে জনৈক স্বর্ণকারের দোকানের পাশে বসলো। ইহুদী যুবকরা তার মুখ খোলার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু সে রাযী হলো না। তখন স্বর্ণকার চুপিসারে গিয়ে মহিলার কাপড়ের এক প্রান্ত তার পিঠের সাথে বেঁধে রেখে দিলো। ফলে মহিলা যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন তার লজ্জাস্থান বেরিয়ে পড়লো। তা দেখে সবাই হেসে উঠলো। মহিলা চিৎকার করে উঠলো। তার চিৎকার শুনে জনৈক মুসলমান স্বর্ণকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করলো। স্বর্ণকার ছিলো ইহুদী। তৎক্ষণাত ইহুদীরা মুসলমান হামলাকারীকে হত্যা করলো। এবার তার আত্মীয় স্বজন মুসলমানদেরকে সমবেত করলো। আর সংগে সংগে বনু কাইনুকার সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বেধে গেলো।

এরপর রসূল (স.) বনু কাইনুকা গোত্রকে অবরোধ করলেন। তারা তাঁর ফায়সালার সামনে নতি স্বীকার করলো। আল্লাহ তায়ালা বনু কাইনুকাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে যখন পরিবেশ রসূল (স.)-এর অনুকূল করে দিলেন, তখন মোনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল বললো, ওরা আমার মুক্ত গোলাম। ওদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। ওরা খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিলো। রসূল (স.) একটু থামলেন। সে আবারও বললো ইয়া রসুলাল্লাহ, আমার মিত্রদের প্রতি অনুগহ

করুন। রসূল (স.) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রসূল (স.) এর বর্মের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো। রসূল (স.) তাকে বললেন, আমাকে ছাড়ো। এই সময় রসূল (স.) এতো রেগে গিয়ে ছিলেন যে, তার চেহারায় রাগের ছাপ দেখা গিয়েছিলো। তিনি আবারো বললেন, 'তুমি এ কী করছো! আমাকে ছেড়ে দাও।' সে বললো, 'না, আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে ততোক্ষণ ছাড়বো না, যতক্ষণ না আমার মিত্রদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন। ওরা চারশ সাধারণ পোশাকধারী এবং তিনশ বর্মধারী। ওরা আমাকে সারা দুনিয়ার মানুষ থেকে রক্ষা করেছে। ওদেরকে আপনি এক সকালেই খতম করে দেবেন। আল্লাহর কসম, আমি বিপদের আশংকা করছি। রসূল (স.) বললেন, 'ঠিক আছে। ওদের ব্যাপারে অনুরোধ রাখলাম।'

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নিজ গোত্রে মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলো। তাই বনু কাইনুকার ব্যাপারে তার সুপারিশ রসূল (স.) এই শর্তে গ্রহণ করলেন যে, ওদেরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তারা অস্ত্র ছাড়া তাদের অন্যসব অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে যেতে পারবে। এভাবে মদীনা একটা শক্তিশালী ইহুদী গোত্রের হাত থেকে মুক্ত হলো।

এরপর বনু নযীরের প্রসংগ। ওহুদ যুদ্ধের পর রসূল (স.) পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী দুটো দিয়ত (রক্তপণ) পরিশোধ করার ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা চাইতে এই গোত্রটার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি গেলে বনু নযীর গোত্রের লোকেরা বললো, ঠিক আছে, আমরা আপনাকে সাহায্য করবো।' কিন্তু আড়ালে গিয়ে তারা পরস্পরকে বললো, এই ব্যক্তিকে তোমরা এমন অবস্থায় আর কখনো পাবে না। এই সময় রসূল (স.) তাদের বাড়ীর একটা প্রাচীরের পাশে বসেছিলেন। ওরা বললো, তোমরা একজন এই বাড়ীর ছাদের ওপর গিয়ে বড় একটা পাথর ওর ওপর ফেলে দাও এবং ওর হাত থেকে আমাদেরকে মুক্ত করো।

এরপর তারা এই জঘন্য চক্রান্ত বাস্তবায়নের চেষ্টা শুরু করলো। আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে ওহীর মাধ্যমে পুরো ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং মদীনায় ফিরে গেলেন। তিনি মুসলমানদেরকে বনু নযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। বনু নযীরের লোকেরা দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নিল। মোনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের কাছে বার্তা পাঠালো যে, তোমরা পালিও না, নিজ নিজ স্থানে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকো। আমরা তোমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে দেবো না। তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপানো হলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। কিন্তু মোনাফেকরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। আল্লাহ তায়ালা বনু নযীরের লোকদের মনে ভয় সৃষ্টি করে দেন, ফলে তারা বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করে। তারা রসূল (স.)- এর কাছে আবেদন জানায় যে, তিনি যেন তাদেরকে হত্যা না করেন, বরং তাদের প্রত্যেককে অস্ত্র বাদে যা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি একটা উটের পিঠে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যেতে দেন। রসূল (স.) অনুমতি দিলেন। বনু নযীরের লোকেরা মদীনা থেকে বেরিয়ে গেলো। কেউ গেলো খয়বর, কেউ গেলো সিরিয়ায়। যারা খয়বরে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সালাম ইবনে আবিল হাকীম, কেনানা ইবনে আর রবী ইবনে আবিল হাকীক ও হুয়াই ইবনে আখতারী। এরা কোরায়শ ও গাতফানের মোশরেকদেরকে মদীনায় জড়ো করে আহযাব যুদ্ধ সংগঠিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এবার বনু কোরায়যা অভিযানের বিষয়ে আসা যাক। আহযাব যুদ্ধের প্রসংগে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, তারা মোশরেকদের মিত্র হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছিলো। এ ব্যাপারে হুয়াই বিন আখতারের নেতৃত্বে বনু নযীরের নেতারা তাদেরকে উস্কে দিয়েছিলো। এ

পরিস্থিতিতে রসূল (স.) -এর কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বনু কোরায়যাকর্তৃক ভংগ করাটা মুসলমানদের জন্যে মদীনার বাইরে থেকে আরবের সকল গোত্রের হামলা পরিচালনার চেয়েও ভয়ংকর বিপজ্জনক ব্যাপার ছিলো। বনু কোরায়যার এই প্রতিশ্রুতি ভংগ মুসলমানদের জন্যে যে ভীতি ও আতংকের কারণ হয়েছিলো, সেটা কতো মারাত্মক ছিলো, তা বুঝবার জন্যে নিম্নের বর্ণনাটা যথেষ্ট।

রসূল (স.) যখন বনু কোরায়যার প্রতিশ্রুতি ভংগের খবর শুনলেন, তখন তিনি আওস নেতা হযরত সাদ ইবনে মোয়াযকে এবং খাযরাজ নেতা সাদ ইবনে ওবাদাকে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ও খাওয়াত ইবনে যাবায়েরকে পাঠালেন। তাদেরকে তিনি বললেন, তোমরা যাও, ওদের সম্পর্কে যা শুনেছি, তা সত্য কি না আমাদেরকে জানাও। যদি সত্য হয়, তাহলে একটা সংকেত দিয়ে আমাকে জানিও এবং সাধারণ জনগণের কাছে প্রকাশ করো না। আর যদি তারা প্রতিশ্রুতি পালন করে, তাহলে সেটা জনগণের কাছে, প্রকাশ করে দিও।

তারা বেরিয়ে গেলেন এবং বনু কোরায়যার কাছে পৌঁছলেন। তারা দেখলেন, তাদের সম্পর্কে তারা যেসব জঘন্য খবরাদি শুনেছিলেন, তার সবই সত্য। তাদেরকে যখন রসূল (স.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন 'তারা বললো, রসূলুল্লাহ আবার কে? আমাদের ও মোহাম্মদের মধ্যে কোন্যো চুক্তি বা অংগীকার নেই। অতপর সেই প্রতিনিধি দল রসূল (স.)-এর কাছে ফিরে এলো এবং ইশারা-ইংগিতে সবকিছু তাঁকে জানালো। রসূল (স.) তৎক্ষণাত বললেন, আল্লাহু আকবার, হে মুসলমানরা, সুসংবাদ নাও! (দুঃসংবাদটা যাতে মুসলমানদের বিচলিত করতে না পারে)।

ইবনে ইসহাক বলেন, এই পর্যায়েই সংকট চরম আকার ধারণ করলো। আতংক তীব্রতর হলো এবং শত্রুরা মুসলমানদের ওপর ও নিচ থেকে আসতে লাগলো। মুসলমানরা হরেক রকমের ধারণা করতে লাগলো এবং কিছু মোনাফেক মোনাফেকীর বিস্তার ঘটাতে লাগলো।

আযহাব যুদ্ধের সময় এভাবেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিলো। অবশেষে যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে সাহায্য করলেন, তাঁর শত্রুদেরকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দিলেন এবং তাঁর ঈমানদার বান্দাদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যে নিজেই যথেষ্ট হয়ে গেলেন, তখন রসূল (স.) বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে গেলেন, মোজাহেদরা অস্ত্র রেখে দিলেন এবং রসূল (স.) যুদ্ধে বিগ্রহের অবসাদ ঝেড়ে ফেলে উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমার গৃহে গোসল করতে লাগলেন। এ সময়ে তাঁর সামনে হযরত জিবরীল হাযির হলেন। জিবরীল বললেন, 'ইয়ারসূলাল্লাহ, আপনি কি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? রসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ। জিবরীল বললেন, কিন্তু ফেরেশতারা এখনও অস্ত্র রাখেনি। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বনু কোরায়যা অভিযানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।' বনু কোরায়যার আবাসস্থল মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিলো। সেখানে যোহরের নামাযের পর যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। রসূল (স.) বললেন, 'তোমাদের কেউ যেন বনু কোরায়যার মহল্লায় না গিয়ে আসরের নামায না পড়ে। লোকেরা রওনা হয়ে গেলো। পথিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলো। কেউ কেউ পথিমধ্যেই নামায আদায় করলেন। তারা বললো যে, রসূল (স.) বনু কোরায়যায় পৌঁছেই যে আসরের নামায পড়তে বলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছা। অন্যেরা বললো, আমরা বনু কোরায়যা না গিয়ে নামায পড়বো না। রসূল (স.) এই দুই দলের কাউকেই তিরস্কার করেননি।

তাদের পেছনে পেছনে রসূল (স.) গেলেন। ইবনে উম্মে মাকতুমকে (যার উপলক্ষে 'আবাছা ওয়া তাওয়াল্লা' সূরাটা নাযিল হয়েছিলো) মদীনার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে গেলেন। আর হযরত

আলীকে করলেন সেনাপতি। অতপর যথাস্থানে গিয়ে বনু কোরায়যাকে ২৫ দিন অবরুদ্ধ করে রাখলেন। অবশেষে অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়ায় তারা আওস নেতা সাদ ইবনে মুয়াযের মধ্যস্থতায় নিচে নেমে এলো। কেননা তারা জাহেলী যুগে পরস্পরের মিত্র ছিলো। তারা মনে করেছিলো যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল যেমন বনু কোরায়যার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে রসূল (স.)-এর কাছ থেকে তাদের প্রতি ক্ষমা আদায় করেছিলো, সাদ ইবনে মোয়াযও তেমনি করবেন। কিন্তু তারা জানতো না যে, খন্দকের অবরোধকালে সাদের বাহুতে একটা বর্শা এসে বিদ্ধ হওয়ায় এমন একটা প্রধান রগে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো, যা কাটা গেলে রক্তপাত বন্ধ হয় না। রসূল (স.) তাকে তপ্ত লোহার সেঁকা দিয়ে চিকিৎসা করলেন এবং তাকে মসজিদে নববীর একটা কক্ষে রাখলেন যাতে কাছ থেকে তার সেবা সুশ্রূষা করা যায়। এই সময় সা'দ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তায়ালা তুমি যদি কোরায়শদের সাথে আমাদের যুদ্ধের কিছু বাকী রেখে থাকো, তবে তার জন্যে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখো। আর যদি তাদের ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে থাকো, তবে যুদ্ধকে পুনরুজ্জীবিত করো। আর বনু কোরায়যার ব্যাপারে আমার চোখ না জুড়িয়ে আমাকে মৃত্যু দিও না।' (অর্থাৎ বনু কোরায়যার সমুচিত শাস্তি দেখে চোখ না জুড়ানো পর্যন্ত) আল্লাহ তায়ালা হযরত সা'দের দোয়া কবুল করলেন এবং বনু কোরায়যার ভাগ্য এমনভাবে নির্ধারণ করলেন যে, তারা স্বেচ্ছায় সা'দের সালিশী কামনা করে তারই ফায়সালা অনুসারে দুর্গ থেকে নেমে এলো।

এরপর রসূল (স.) সাদকে মদীনা থেকে ডেকে আনলেন, যাতে বনু কোরায়যা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। একটা গাধার পিঠে চড়ে যখন সাদ এলেন, তখন আওসের লোকেরা তাকে অনুরোধ করলো যে, 'হে সা'দ! বনু কোরায়যা আপনার মিত্র। তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।' এই অনুরোধ করার পর তারা সাদকে তাদের প্রতি দয়ায় বিগলিত করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা চালালো। কিন্তু সা'দ তাদের কথার কোনো জবাব না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করলেন। কিন্তু তারা যখন অতিরিক্ত অনুনয় বিনয় করতে লাগলো, তখন তিনি বললেন, 'সা'দের কাছে সেই সময়টা উপস্থিত হয়েছে, যখন সে আল্লাহর হুকুম পালনে কারো তিরস্কারের পরোয়া করবে না।' তখন আওসের লোকেরা বুঝে ফেললো যে, সা'দ বনু কোরায়যাকে রক্ষা করবেন না।

তিনি যখন রসূল (স.)-এর তাঁবুর কাছে গেলেন, তখন রসূল (স.) বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাঁড়াও। মুসলমানরা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করলো ও তাঁবুতে নিয়ে তাকে সাদরে থাকতে দিলো। তাঁর জন্যে এতো অভ্যর্থনার আয়োজন করার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তার কর্তৃত্বাধীন এলাকায় তিনি যেন পর্যাপ্ত সম্মান ও আনুগত্য লাভ করেন এবং বনু কোরায়যা সম্পর্কে তাঁর রায় সহজেই কার্যকরী হয়।

তিনি যখন বসলেন, তখন রসূল (স.) তাকে বললেন, এরা (বনু কোরায়যা) তোমাকে বিচারক মেনে নীচে এসেছে। এখন তাদের ব্যাপারে তুমি যেমন ইচ্ছা রায় দাও।' হযরত সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, আমার রায় কি তাদের ওপর কার্যকর হবে? রসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ, তিনি বললেন, আর এখানে (তাঁবুর যে পাশে রসূল (স.) ছিলেন, সেই দিকে ইংগিতপূর্বক। এ সময় পরম সম্মান ও ভক্তির সাথে তিনি রসূল (স.)-এর দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিচ্ছিলেন) যারা আছে, তাদের ওপরও? রসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ। হযরত সা'দ (রা.) বললেন, তাহলে আমি ফায়সালা ঘোষণা করছি যে, বনু কোরায়যার মধ্যে যুদ্ধ করার যোগ্য যতো পুরুষ রয়েছে তাদের সকলকে

হত্যা করা হোক, তাদের সকল সন্তান সন্ততিকে বন্দী এবং সমুদয় ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হোক।' রসূল (স.) তাকে বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা সাত আকাশের ওপর থেকে যে ফায়সালা করেছেন, তুমি সেই অনুসারেই ফায়সালা করেছো।'

এরপর রসূল (স.) লম্বা লম্বা কয়েকটা পরিখা খনন করার নির্দেশ দিলেন। পরিখা খনন করা হলে তাদের সকলকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে আনা হলো এবং সকলকে হত্যা করা হলো। এভাবে যাদেরকে হত্যা করা হলো তাদের সংখ্যা ছিলো সাতশ থেকে আটশর মধ্যে। সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও সকল মহিলাকে বন্দী করা হলো এবং সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। নিহতদের মধ্যে বনু নযীরের গোত্রপতি হুয়াই বিন আখতারও ছিলো। সে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাদের সাথে দুর্গে অবস্থান করছিলো।

সেই দিন থেকে মদীনায় ইহুদী শক্তির পতন ঘটে ও মোনাফেকদের আন্দোলন দুর্বল হয়। মোনাফেকরা মাথা নত করে এবং ইতিপূর্বে তারা যেসব বাড়াবাড়ি করছিলো, তা খর্ব হয়। এর ফল দাঁড়ায় যে, এরপর আর মোশরেকরা মুসলমানদের ওপর আগ্রাসন চালানোর স্পর্ধা দেখায়নি; বরং এর পর মুসলমানরাই তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে লাগলো এবং সেই ধারাবাহিকতায় মক্কা ও তায়েফ বিজিত হয়। বলা যেতে পারে যে, ইহুদী মোনাফেক মোশরেক-এই ত্রিশক্তির তৎপরতার মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিলো। মদীনা থেকে ইহুদীদের উচ্ছেদ এই সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই উচ্ছেদের পূর্বে ও পরে ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন ও স্থিতিশীলতায় সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

ইহুদী শক্তির মূলোৎপাটনের এই ঘটনাই অভিব্যক্ত হয়েছে ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে।

'ছায়াছী' অর্থ দুর্গ। আর 'যে ভূমি তোমরা এখনও পা দিয়েও মাড়াওনি' এর অর্থ বনু কোরায়যার মহল্লার বাইরে তাদের যেসব জায়গা-জমী ছিলো এবং যা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় মুসলমানদের দখলে এসেছিলো, অথবা বিনা যুদ্ধে বনু কোরায়যা কর্তৃক সমর্পিত ভূমি। 'পা দিয়ে মাড়ানো' দ্বারা যুদ্ধ বুঝানো হয়েছে। কেননা যুদ্ধের সময় ভূমি পদদলিত হয়ে থাকে।

'আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।'

এ হচ্ছে বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা। এই পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সবকিছুকে আল্লাহর কর্তৃত্বে ন্যস্ত করার ঘোষণা দেয়া হয়। ইতিপূর্বে সমগ্র যুদ্ধকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তার যাবতীয় বিষয় পুরোপুরিভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তার সমস্ত তৎপরতাকে সরাসরি আল্লাহর তৎপরতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা বাস্তব ঘটনাবলী এবং ঘটনার পরে নাযিল হওয়া কোরআন দ্বারা মুসলমানদের মনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের ধারণা বদ্ধমূল করতে চান এবং এর ওপরই ইসলামী চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করেন।

এভাবে সেই বিরাট ও গুরুতর ঘটনার পর্যালোচনা ও বিবরণ শেষ হচ্ছে। যে নীতিমালা, মূল্যবোধ, শিক্ষা ও মূলনীতি মুসলমানদের মনে বদ্ধমূল করা ও তাদের বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোরআন এসেছে, এই পর্যালোচনায় সে সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহসহ যাবতীয় ঘটনাবলী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয় এবং কোরআন জীবন, জীবনের ঘটনাবলী, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তার চিন্তাধারার দিক দর্শনে পরিণত হয়। এভাবেই দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ পরীক্ষামূলক ঘটনাসমূহ দ্বারা ও কোরআন দ্বারা মূল্যবোধ ও মূলনীতির স্থায়িত্ব ও স্থীতি এবং হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জিত হয়ে থাকে।

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾
يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ
ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ يٰنِسَآءَ
النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ
وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

রুকু ৪

২৮. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভোগবিলাস কামনা করো তাহলে এসো, আমি তোমাদের (তার কিছু অংশ) দিয়ে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই। ২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা করো তাহলে (জেনে রেখো), তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। ৩০. হে নবীপত্নীরা, তোমাদের মধ্যে যারা খোলাখুলি কোনো অশ্লীল কাজ করবে, তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেয়া হবে; আর এ কাজ আল্লাহ তায়ালার জন্যে অত্যন্ত সহজ। ৩১. তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, এর সাথে সে নেক কাজও করবে, আমি তাকে দু'বার তার কাজের পুরস্কার দান করবো, আমি (পরকালে) তার জন্যে সম্মানজনক রেযেক প্রস্তুত করে রেখেছি। ৩২. হে নবীপত্মীরা, তোমরা অন্যান্য নারীদের মতো (সাধারণ নারী) নও, যদি তোমরা (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তাহলে (অন্য পুরুষদের সাথে) কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন করো না, (যদি এমন করো) তাহলে যার অন্তরে কোনো ব্যাধি আছে সে তোমার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে, (তবে) তোমরা (সর্বদাই) নিয়মমাফিক কথাবার্তা বলবে, ৩৩. তোমরা ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বেকার জাহেলিয়াতের যমানার (নারীদের) মতো নিজেদের প্রদর্শনী করে বেড়াবে না, তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে; আল্লাহ তায়ালা (মূলত) এসব কিছুর মাধ্যমে নবী পরিবার (তথা) তোমাদের মাঝ থেকে (সব

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ

اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ

وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

ধরনের) অপবিত্রতা দূর করে (তোমাদের) পাক সাফ করে দিতে চান, ৩৪. তোমাদের ঘরে আল্লাহ তায়ালার কেতাবের আয়াত ও তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের যেসব কথা তেলাওয়াত করা হয় তা স্মরণ রেখো; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সম্যক অবগত।

রুকু ৫

৩৫. মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারী, মোমেন পুরুষ মোমেন নারী, ফরমাঁবর্দার পুরুষ ফরমাঁবর্দার নারী, সত্যবাদী পুরুষ সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ রোযাদার নারী, যৌন অংগসমূহের হেফাযতকারী পুরুষ (এ অংগসমূহের) হেফাযতকারী নারী, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ স্মরণকারী নারী– (নিসন্দেহে) এদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন।

তাফসীর

আয়াত ২৮-৩৫

'হে ঈমানদাররা .... বিরাট পুরস্কার।'

অবশ্যই নবী (স.) তাঁর নিজের জন্যে ও তাঁর পরিবারের জন্যে একেবারেই সাধারণ মানুষের উপযোগী জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, এটা শুধু মজবুরীর কারণেই ছিলো না, বরং জনসাধারণের সুখ দুঃখের সাথে তিনি নিজেকে ও নিজ পরিবারকে একাকার করে দিয়েছিলেন বলেই তিনি এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি এইভাবে জীবনযাপন করতে থাকেন। অতপর মক্কা বিজয়ের পর প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ আসতে থাকে এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের জীবনে সচ্ছলতা ফিরে আসে, সে সময় জনগণের জীবনেও প্রাচুর্য আসে এর পূর্বে কখনও এমন হয়েছে যে এক মাসের মধ্যেও তাঁর ঘরে আগুন জ্বলেনি, যদিও বিভিন্ন দিক থেকে দান উপঢৌকন বা যথেষ্ট পরিমাণে হাদিয়া আসতে থাকে। প্রিয় নবী (স.) এ সময়েও এই কৃচ্ছ্র সাধনা করেছেন যে, তিনি পার্থিব জীবন ও দুনিয়ার জীবনের সুখ শান্তির তুলনায় আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিতেন। আখেরাতের জীবনের উদ্দেশ্যে তিনি হাতে পাওয়া

সুখের জীবনকে পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য বিশ্বাসগতভাবে বা শরীয়তের নির্দেশ পালন করার উদ্দেশ্যেই যে রসূল (স.) এভাবে আত্মপীড়ন ও পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তা নয়। পবিত্র খাদ্য খাবার বর্জন করতে শরীয়ত বলেনি বা এটা ঈমানের কোনো অংগও নয়, আর বিনা কষ্টে যখন প্রাচুর্য আসছিলো তখন যে তিনি গ্রহণ করেননি তাও নয়; তবে এটাও সত্য যে বিলাসিতার জীবনযাপন করা তাঁর জীবনধারা ছিলো না, তিনি বিলাসী হয়ে যাননি এবং বিলাসিতায় মেতেও থাকেননি আর তাঁর উম্মত বিলাসিতা বর্জিত জীবনযাপন করুক এবং দুনিয়ার ভালো ভালো বস্তু গ্রহণ করা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখুক তিনি তাও চাননি। তিনি নিজে যে ত্যাগী জীবনযাপন করেছেন এটাকে তাঁর উম্মতের জন্যে তিনি চাপিয়েও দেননি, তবে কোনো ব্যক্তি তাঁর অনুসরণে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকে বর্জন করতে চাইলে তাকে তিনি মানাও করেননি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন ভালো ভালো খাদ্য-খাবার ও সৌন্দর্যের যেসব বস্তুসম্ভার সৃষ্টি করেছেন তার থেকে ভোগ ব্যবহারকে তিনি নিরুৎসাহিত করেননি, কারণ এটা হচ্ছে মানুষের মনের স্বাভাবিক চাহিদা।

উম্মুল মোমেনীনদের আখেরাতমুখী জীবন ধারা

নবী (স.)-এর স্ত্রীরা তো সাধারণ মানুষই ছিলেন– এ জন্যে তাদের মধ্যে মানুষ হিসাবে মানবীয় চাহিদা থাকা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। নবীর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করা সত্তেও মানবীয় এসব চাহিদা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। নবুওতের ঝর্ণাধারা থেকে তাঁরা সিঞ্চিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাই বলে তাঁদের প্রকৃতিগত চাহিদাগুলো একেবারে খতম হয়ে যায়নি, স্বভাবগত এসব চাহিদা তাঁদের মধ্যে অবশ্যই জাগরুক ছিলো। এ কারণে যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রসূল (স.) ও মোমেনদেরকে প্রশস্ততা ও সচ্ছলতা দান করলেন তখন নবী (স.)-এর স্ত্রীরা খরচ–পত্র দেয়ার ব্যাপারে তাঁর কাছে দরবার করা শুরু করলেন; কিন্তু নবী (স.) তাদের এই দাবী-দাওয়াকে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি, বরং হতাশা ও অসন্তোষ নিয়ে তাঁদের এসব দাবী দাওয়াতে সাড়া দিলেন। কারণ আল্লাহর নবী (স.) অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা যখন যে হালে তাঁকে রেখেছেন সেই অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এ জন্যে তাঁর স্ত্রীরা সম্মিলিতভাবে যখন বিভিন্ন দাবী পেশ করলেন তখন জীবনটা তাঁর কাছে বড়ই কঠিন মনে হলো। যদিও হালাল-হারাম প্রশ্নে তেমন কোনো সংকট ছিলো না-হালাল-হারাম এর ব্যাপারটা তাদের সবার কাছে স্পষ্ট ছিলো। তারা কোনো হারাম জিনিসের জন্যে দাবী করছিলেন তা নয়, তারা অন্যান্য দুনিয়াবাসীদের মতো একটু ভালো-খাওয়া, ভালো পরা ও অন্যান্যদের মতো একটু সচ্ছল জীবন যাপন করার প্রয়োজনে যা দরকার তাই-ই দাবী করছিলেন মাত্র– যা দাবী করায় প্রকৃতপক্ষে কোনো দোষ ছিলো না।

স্ত্রীদের নানাপ্রকার দাবী দাওয়া শুনে নবী (স.) বড়োই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুই অবহিত করেননি অথচ এ বিষয়টি ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তাদের অবহিত করতেন। এ বিষয়টি তাদেরকে না জানানোটা তাঁর নিজের কাছেই খুব কঠিন লাগছিলো। সাহাবারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর মনোবেদনার কথা বুঝার জন্যে এসেছেন। কিন্তু তাঁদেরকে রসূলুল্লাহ সাক্ষাতের অনুমতি দেননি। ইমাম আহমদ জাবের (রা.)-র বরাত দিয়ে রেওয়ায়াত করছেন, তিনি বলেন, একদিন আবু বকর (রা.) রসূলুল্লাহ (স.)–এর সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন, অন্যান্য আরও অনেকে দরজায় (সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে) বসেছিলেন। রসূলুল্লাহ (স.) সামনে বসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন না, এরপর ওমর (রা.) এসে

সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকেও রসূলুল্লাহ (স.) অনুমতি দিলেন না। এর কিছুক্ষণ পর রসূলুল্লাহ (স.) দুজনকে এক সাথে আসার অনুমতি দিলেন। তারা দুজনে প্রবেশ করে দেখেন রসূলুল্লাহ চুপ করে বসে আছেন এবং তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে ঘিরে বসে রয়েছেন। ওমর (রা.) বলছেন, আমি চিন্তা করলাম এমন কিছু আমি বলবো, যেন রসূলুল্লাহ একটু হাসতে বাধ্য হন। তাই ওমর (রা.) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ যায়েদের কন্যা (ওমরের স্ত্রী) যদি এর আগে আমার কাছে এটা ওটা দাবী করার সাহস দেখাতো তাহলে অবশ্য অবশ্যই তার গর্দান মেরে দিতাম।'(১) এ কথায় রসূলুল্লাহ (স.) এতো জোরে হেসে উঠলেন যে তাঁর আক্কেল দাঁত পর্যন্ত আমাদের নযরে ভেসে উঠলো। তিনি বললেন, 'এরা আমাকে ঘিরে ধরে নানাপ্রকার সামগ্রীর দাবী তুলেছে।' তখন আবু বকর উঠে আয়শাকে মারতে উদ্যত হলেন, ওমর (রা.)ও অনুরূপভাবে তার মেয়ে হাফসাকে মারার জন্যে এগিয়ে গেলেন। এই কথা বলতে বলতে তারা উভয়ে নিজ নিজ কন্যার দিকে এগিয়ে গেলেন, নবী (স.)-এর কাছে এমন কিছু তোমরা দাবী করছো যা তাঁর কাছে নেই। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে থামালেন, তখন তাঁর স্ত্রীরা বললেন, 'আল্লাহর কসম আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, এরপর থেকে আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এমন কিছু চাইবো না যা তাঁর কাছে নেই ..... রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, এরপরই মহান আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন, যাতে নবী (স.)-এর স্ত্রীদের এই এখতিয়ার দেয়া হলো যে তারা ইচ্ছা করলে কৃচ্ছ্র সাধনের জীবন নিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে থাকতে পারেন অথবা ভালোভাবে মান-ইযযতের সাথে বিদায় নিয়ে যেতে পারেন। তখন রসূলুল্লাহ পয়লা আয়শা (রা.)-কে বললেন, 'তোমাকে আমি একটি বিষয় সম্পর্কে জানাচ্ছি, তোমার আব্বা আম্মাকে জিজ্ঞাসা না করে মতামত না জানা পর্যন্ত সে বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ো না।' আয়শা (রা.) বললেন, সে বিষয়টি কি? রেওয়ায়াতকারী জাবের (রা.) বলেন! এরপর রসূলুল্লাহ (স.) ওপরে বর্ণিত আয়াতটি 'ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু কুল লে-আযওয়াজেকা'-শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। শোনার পর আয়শা (রা.) বললেন, আব্বা-আম্মাকে জিজ্ঞাসা করার এ কথা কি আপনার নিজের, না এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ? আর আমি আপনাকে একটি অনুরোধ করছি, যে এখতিয়ার আমাকে দিলেন এ বিষয়ে আপনাকে আমি যা বলবো, তা দয়া করে আপনার অন্য স্ত্রীদেরকে বলবেন না। অতপর রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমাকে একজন কঠোর মেযাজের মানুষ বানিয়ে পাঠাননি, বরং তিনি আমাকে একজন সহৃদয়বান শিক্ষক বানিয়েছেন। যে এখতিয়ার তাদেরকে আমি দিয়েছি, সে বিষয়ে ওদের যে কেউ আমাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করেছে আমি তার জবাব দিয়েছি।(২)

আর আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান-এর বরাত দিয়ে বোখারী শরীফে যে, রেওয়ায়েতটি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়। রসূলুল্লাহ (স.)-এর স্ত্রী আয়শা (রা.) তাঁকে জানিয়েছেন যে, যখন স্ত্রীদেরকে এখতিয়ার দেয়ার কথা বলে আয়াত নাযিল হলো তখন তিনি প্রথমেই আমাকে এখতিয়ার দিলেন, বললেন, আমি তোমাকে একটি কথা জানাচ্ছি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, বরং তোমার আব্বা আম্মাকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানাবে।' অথচ তিনি তো জানতেনই যে আমার

(১) এ কথায় বুঝা যায় যে আরবে এমন কোনো শাসন ব্যবস্থা ছিলো না যার কারণে কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো আইন কানুন চালু করা যেতো। কেউ এভাবে কাউকে হত্যা করলে ধরপাকড়ের কেউ ছিলো না, বিশেষ করে নারীদের ব্যাপারে, শুধু ভিন্ন গোত্রের হলে তারা হয় অনুরূপ হত্যার দাবী করতো, অথবা রক্তের মূল্য নিয়ে থেমে যেত।

(২) ইমাম মুসলিম যাকারিয়া ইবনে ইসহাক-এর বরাত দিয়ে হাদীসটি তার কেতাব মুসলিম শরীফে এনেছেন।

আব্বা-আম্মা কিছুতেই বিচ্ছেদ ঘটানোর পক্ষে মত দেবেন না। তিনি বলছেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স.)........নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হে নবী, বলো তোমার স্ত্রীদেরকে'.......দুটি আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়ে শোনালেন।' আমি তখন তাঁকে বললাম, কোনো জিনিস সম্পর্কে তাদের মতামত জানার জন্যে আপনি আমাকে বলছেন?' আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে এবং আখেরাতের বাসস্থানকেই চাই।'

জীবনের জন্যে ইসলামী মতাদর্শের মৌলিক মূল্যবোধকে শাণিত করে তুলে ধরার জন্যেই কোরআনুল করীমের অবতারণা। আর এই মূল্যবোধকে নবী (স.)-এর বাড়ীতেই জীবন্ত ছবির মতো তুলে ধরা হয়েছে, সুস্পষ্টভাবে জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই মোবারক ঘর, গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্যে এবং ইসলামের অগ্রগতির পথে চিরদিন এক উজ্জ্বল আলোক স্তম্ভ হিসাবে কাজ করতে থাকবে এবং সেদিন খুব দূরে নয় যখন সমুন্নত আদর্শের অবদান অবশেষে সারা পৃথিবী ও তার অধিকারীদের দ্বারা গৃহীত হবে। মানবমন্ডলীকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং এ পথের যৌক্তিকতা সমুজ্জ্বল করে তোলার জন্যে অত্যন্ত জোরদার দু'টি নমুনা পেশ করা হয়েছে। একটি একান্তভাবে দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্যে অনিয়ন্ত্রিত ও লাগাম ছাড়া এক জীবন, যার মধ্যে অদৃশ্য বিশ্বাসের প্রশ্ন নেই এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহ-রসূল ও আখেরাতের ওপর অবিচল বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চিরন্তন জীবন। অন্য কথায় বলা যায়, একটি হচ্ছে নিছক দুনিয়াকেন্দ্রিক জীবন এবং অন্যটি আল্লাহ তায়ালা রসূল ও আখেরাতমুখী জীবন। এমতাবস্থায় একথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একই অন্তরে দুটি চিন্তাধারা (সমানভাবে) স্থান পেতে পারে না, যেমন করে পারে না এক পেটের মধ্যে দুটি হৃদপিন্ড বিরাজ করতে।

নবী (স.)-এর স্ত্রীদের অবস্থা ছিলো যে, তাঁরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিয়েছিলেন, আল্লাহর কসম, আজকের এই বৈঠকের পরে আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এমন কিছু চাইবো না যা তাঁর কাছে নেই। এ জন্যে তাদের আসল অবস্থাটি জানিয়ে আল কোরআন নাযিল হলো। বলা হলো, রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে সুখ-সম্পদের দ্রব্যাদি আছে বা না আছে সেটা আসল প্রশ্ন নয়- আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতকে পূর্ণাংগভাবে গ্রহণ করা, অথবা দুনিয়ার সুখ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দুনিয়ার জীবনকে আকণ্ঠ ভোগ করার দিকে ঝুঁকে পড়া এবং দুনিয়ার সম্পদ ও বিলাস দ্রব্যাদি লাভ করার জন্যে মেতে ওঠা, আখেরাতের চিরন্তন জীবনকে বিশ্বাস করে তার জন্যে লালায়িত হওয়া, তাতে সুখ সম্পদের সকল উপকরণ ঘরে থাকুক বা ঘরে কোনো আসবাবপত্র না থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অকাট্য জ্ঞাতব্য বিষয়টি এসে যাওয়ার পর নবী (স.)-এর স্ত্রীরা খোলা মনে এবং একবাক্যে আল্লাহ তায়ালা, রসূল ও আখেরাতের যিন্দেগীকেই গ্রহণ করে নিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা প্রাণ প্রিয়নবী (স.)-এর পরিবার ভুক্ত ছিলেন, তাঁর সান্নিধ্য লাভে যে জীবন, তা ছিলো পরম পরিতৃপ্ত জীবন, যে জীবনের কোনো তুলনা হতে পারে না। রসূলুল্লাহ (স.)-এর গৃহ তো সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ গৃহ। কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায়, যে তাঁর নেককার স্ত্রীদের এই খোলা মনে আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের যিন্দেগী গ্রহণ করার ঘোষণা নবী (স.)-কে বড়োই মুগ্ধ করে ফেললো।

সে সময়ে পেয়ারা নবী (স.)-এর মানসিক অবস্থা আঁচ করার জন্যে আমাদের কিছুক্ষণের জন্যে একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং সে অবস্থা ও পরিবেশ মনের আঁখরে একবার টেনে আনতে হবে, আহ! কী মনোরম সে দৃশ্য, কতো মধুময় নবী (স.)-এর সেই মোহব্বত পরশ।

আশে-পাশে জীবনকে আকণ্ঠ ভোগ করার সকল বস্তু ও দৃশ্য মওজুদ, কিন্তু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে যে কোনো জীবন গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়ার পর শান্ত মনে তাঁরা সব কিছু ছেড়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে বড়ো করে দেখা ও আখেরাতের জন্যে সকল ভোগ-বিলাস ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া– এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিলো না। এটা একমাত্র তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো যাদের অন্তর ঈমানের আলোতে ঝলমল করছিলো এবং যারা দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিতে পেরেছিলেন।

তারা ছিলেন সত্যিকার আদর্শ নারী

প্রকৃতপক্ষে, সে ঘটনাটি তাদের চিন্তাধারার মূল্যমানকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের অনুভূতির মধ্যে তুলনা করে সাফল্যের সঠিক পথকে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ ঘটনাটি মুসলমানদেরকে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, দুনিয়ার নগদ পাওনা ও আখেরাতের বাকি পাওনার মধ্যে কোনটা বেশী লাভজনক এবং কোনটা অধিক স্থায়ী। দুনিয়ামুখিতা ও আখেরাতমুখিতার মধ্যে পার্থক্য কি তা বলে দিচ্ছে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে একান্তভাবে অন্তরের মধ্যে মোমেনদের দিলে আল্লাহর সাথে ও শান্তভাবে অন্তরের মধ্যে মোমেনদের দিলে আল্লাহর মোহব্বত কতো গভীরভাবে বিরাজ করছে তার প্রমাণ পেশ করছে, তাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, এমন মোহব্বত একমাত্র আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্যেই সম্ভব, অন্য কারও জন্যে নয়, আল্লাহর প্রতি এই মোহব্বতই ঈমানের মাধুর্যকে দুনিয়াবাসীর সামনে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে এবং আখেরাতের যথার্থতাকে প্রমাণ করেছে।

এ ঘটনাটি কয়েকটি দিক দিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের মাহাত্মকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছে, ফুটিয়ে তুলেছে তাদের জীবনকেও যারা তাঁর সাথে ঈমানের নিশানবরদার হিসাবে কাজ করেছেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে থেকে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করেছেন। এ ঘটনার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এবং সব থেকে সুন্দর যে জিনিসটি মনকে প্রবলভাবে দোলা দেয়, তা হচ্ছে প্রিয় নবী (স.)-এর সংগী সেসব মানুষের যিন্দেগী তো দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের মতোই মানবীয় জীবন ছিলো। স্বাভাবতই মানবীয় জীবনের সকল চাহিদা ও বৈশিষ্টও তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলো, তারা জৈবিক চাহিদা ও মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। চেতনা, অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতার দিক দিয়েও তাঁরা অন্যান্য মানুষের উর্ধের কোনো জীব ছিলেন না। এতদসত্তেও কিসের টানে, কিসের আকর্ষণে এবং কিসের মোহব্বতে তাঁরা এসব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন? সকল প্রকার মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি-ভুল-ভ্রান্তি, প্রবণতা আবেগ-উচ্ছ্বাস ও দুর্বলতা সবই তাঁদের মধ্যে থাকা সত্তেও তারা তাদের মানবতাবোধকে সমুন্নত করতে পেরেছিলেন যে, সোনার কাঠির ছোঁয়াতে সেই খাঁটি সোনা-না– সেই পরশ পাথরই তো ছিলেন নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)। তাহলে কি তারা শয়তানের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিলেন, তারা মানবীয় চেতনা ও অনুভূতিনিচয় থেকে উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলেন? মানবীয় দুর্বলতাগুলো কি তাদের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো? না, সকল ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা সবই তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলো; কিন্তু আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস, আখেরাতের প্রতি অবিচল আস্থা এবং নবী মোহাম্মদ (স.)-এর মহান পরশ মাটির এ কায়াগুলোকে সকল সুষমায় ভরে দিয়েছিলো পাপ-পংকিলতায় ভরা এ পৃথিবীর সকল আবর্জনার মধ্যে থেকেও আল্লাহভীতির মহিমায় তারা মহিমান্বিত হয়েছিলেন। বিশ্বনবী (স.)-এর মধুর সাহচর্য তাদেরকে সম্ভাব্য সকল দিক থেকে পূর্ণতা দান করেছিলো।

আমরা নবী করীম (স.) ও তাঁর সাহাবাদের সম্পর্কে যখন কল্পনা করি তখন বেশীর ভাগ লোকই তাঁদের সম্পর্কে অনুমান করতে গিয়ে এক অবাস্তব চিন্তা করে বসি বা অপূর্ণাংগ এক ধারণার মধ্যে পড়ে যাই-আমরা মনে করে বসি যে, তারা মানবীয় ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ থেকে একেবারেই পবিত্র হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের চিন্তা-চেতনাও মানবীয় সম্পর্কের সাধারণ নিয়ম থেকে তারা অনেক উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলো, আর এসব কথা মনে করেই আমরা তাদেরকে সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত মনে করতে চাই, আর সকল ক্রটি ও দুর্বলতার উর্ধ্বে মনে করতে গিয়ে আমরা দারুণ ভুল করে বসি।

আমাদের অধিকাংশের এই ক্রটির কারণে অবাস্তব ও কল্পনা-কুসুম অনেক কিছু আমরা আশা করি। কোনো কোনো মানুষকে আমরা এতো রহস্যপূর্ণ গুণের অধিকারী মনে করি যে তাদের মানব প্রকৃতির আসল দুর্বলতাকে আর বুঝতে পারি না। এর ফলে আমাদের এবং তাদের মধ্যে মানবীয় সম্বন্ধ কেটে যায়। তাদের সম্পর্কে ধারণা-কল্পনা এতোদূর বৃদ্ধি পায় যে তাদেরকে আর মর্তের মানুষ মনে করা যায় না। বরং তাদেরকে মনে করতে শুরু করি, তারা অতিমানব ও মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের এক কাল্পনিক জীব। আমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্য আর সৃষ্টি...........অনেকটা ফেরেশতাদের সম্পর্কে...... আমাদের কল্পনার মতো। তখন হয় তাদেরকে মনে করা হতে থাকে ফেরেশতা বা তাদের মতোই অন্য কোনো সৃষ্টি, যাদের সাথে কোনো অবস্থাতেই মানুষের কোনো সম্পর্ক বা সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না। আর তাদের সম্পর্কে মনের মধ্যে এই ধরনের কাল্পনিক চিন্তা আনার পর তারা মূলত আমাদের জীবন সীমানা থেকে অনেক অনেক দূরে সরে চলে যায়। তখন তাদের সম্পর্কে এমন হতাশা জন্মে যায়, যা আর কখনও দূর হতে চায় না এবং তাদের থেকে আমাদের জীবনের জন্যে কোনো প্রভাব গ্রহণ করাও আর সম্ভব হয় না। বরং তাদের থেকে প্রভাব গ্রহণ করা বা তাদের অনুকরণ অনুসরণ মানুষের জন্যে ক্ষতিকর বলে মনে হতে থাকে। এইভাবে তাদের থেকে আমাদের জীবনের জন্যে কোনো আদর্শ খুঁজে পাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। যেহেতু আমাদের চিন্তা-চেতনায় তারা ভিন্ন এক সৃষ্টি বলে প্রতীতি জন্মে যায়, ফলে তাদেরকে বড়ো করতে গিয়ে তারা আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যায়। আসলে সত্যিকারে সম্পর্ক তো তাদের সাথেই গড়ে উঠতে পারে যাদের সাথে প্রকৃতিগত মিল থাকে, মিল থাকে তাদের সাথে চিন্তা-চেতনায়, সম্পর্ক-সম্বন্ধে, কাজে-কর্মে, চেষ্টা-সাধনায় এবং বাস্তব জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে। যখন তাদের উন্নতি এসব সীমানা পার হয়ে যায় তখন তারা আর ইহজগতের মানুষ থাকে না, এ জন্যে তারা আর অনুসরণযোগ্যও থাকতে পারেন না।

মহা বিজ্ঞানময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন এসব যুক্তি বিবেচনায় মানুষের শিক্ষক হিসাবে মানুষকেই বাছাই করেছেন এবং তাঁর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে মানুষকেই তিনি নিয়োগ দিয়েছেন, তিনি মানুষ ছাড়া ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে এ দায়িত্ব দেননি। যাতে তাদের মধ্যে আসল সম্পর্কের চেতনা বহাল থাকে এবং সে চেতনার কারণে তারা পরস্পরের কাছে যেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় প্রভাব গ্রহণ করে জীবনকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পায়। যেন তারা অনুভব করে, যাদের অনুকরণ করার চিন্তা আসছে তারাও তো মানুষ, তারা যদি এমন ভালো হতে পারে তাহলে আমরা কেন হতে পারবো না। তখন মানবিক কারণে তাদের সাথে অতি স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক-সম্বন্ধ ও আন্তরিক মোহব্বত-এ মোহব্বত গড়ে উঠতে পারে মানুষে মানুষে স্বাভবিক সম্পর্কের কারণে– ছোট মানুষের জন্যে বড়ো মানুষের অনুকরণ করার তখন আকাংখা পয়দা হয়।

ওপরে বর্ণিত 'এখতিয়ারদানের' ঘটনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতিগত কারণেই ধন-সম্পদ ও আসবাব পত্রের জন্যে নবী (স.)-এর সহধর্মিনীদের মধ্যে এক বাসনা, আবার সাথে সাথে আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি নবী (স.) ও তাঁর ঘরের বাসিন্দাদের মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও উন্নত মননশীলতার এক অত্যুজ্জ্বল নমুনা। দেখা যাচ্ছে, তারা যখন আসবাবপত্র ও সুখ সম্পদের দ্রব্যাদির জন্যে নবী (স.)-এর কাছে দরবার করছেন তখন নবী (স.) ঠিকই কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) যখন তাদেরকে প্রহার করতে উদ্যত হচ্ছেন তখন এই কষ্টদায়ক ব্যবহার, প্রাণপ্রিয় নবী (স.) আর সহ্য করতে পারছেন না, তাই তিনি কিছুতেই সে বিষয়ে অনুমতি দিতে পারছেন না। এতে বুঝা যাচ্ছে আয়শা (রা.) ও হাফসা (রা.) সহ তাঁর স্ত্রীদের জন্যে তাঁর মোহব্বত ছিলো কতো গভীর। তাদের ব্যবহারে তিনি নিজে কষ্ট পেলেও তাঁর দ্বারা কেউ কষ্ট পাক এটা ছিলো তাঁর সহ্যের বাইরে। নবী (স.)-এর মধ্যে এ বিবেচনা কাজ করছিলো যে ভালো খাওয়া পরা ও বিলাস দ্রব্যের জন্যে চাহিদা-এটা অবশ্যই মানব প্রকৃতির দাবী, এ চাহিদাকে পরিমার্জিত করা যেতে পারে, কিন্তু এ চাহিদাকে দমিয়ে দেয়া যায় না। এ আকাংখাকে একেবারে নিভিয়েও দেয়া তো যায় না! মানব জাতির সাধারণ এ প্রবণতার কারণেই রসূল পত্নীদের এসব দাবী-দাওয়া অযৌক্তিক বা অগ্রাহ্য করার মতো ছিলো না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন নবী (স.)-এর সাথী হওয়ার যে সম্মান তাদের দিয়েছিলেন তারই দাবী হিসাবে চেয়েছিলেন তাঁরা সাধারণ মহিলাদের মধ্যে বাস করা সত্তেও এক অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে এক আদর্শ স্থাপন করুক- আল্লাহ তায়ালা এটা কেন তাদের কাছে চাইবেন না; তারা যে মোমেনকূলের মা! তাই, দুনিয়ার জীবনের স্বাদ-আহলাদ ও আখেরাতের জীবনকে সামনে রেখে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে কোনো বিষয় পছন্দ করার এখতিয়ার দিলেন, যেন তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর রসূলের মোহব্বতে আখেরাতের যিন্দেগীকে গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের ঈমানের জ্বলন্ত প্রমাণ পেশ করতে পারে এবং দুনিয়াবাসীদের সামনে ভোগী ও ত্যাগী জীবনের মধ্যে পার্থক্য করে দেখাতে পারে। এখতিয়ার দেয়ার আর একটি উদ্দেশ্য বুঝা যায়, স্বেচ্ছায় যেন ত্যাগ স্বীকার করার নিদর্শন হাযির করে- অসন্তোষের সাথে নয়, কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়েও নয়, অথবা বাইরের কোনো চাপে পড়েও নয়! তাদের এ মহান ভূমিকায় প্রাণপ্রিয় স্বামী ও নবীকূল শিরোমনি বড়োই চমৎকৃত হলেন, খুশীতে ভরে গেলো তাঁর অন্তর, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে স্ত্রীদের মর্যাদা ও মোহব্বত আরও সমুন্নত হলো। আহ! একবার ভেবে দেখুন, স্বামীভক্ত স্ত্রী হওয়ার সুযোগের সাথে সাথে তারা সারওয়ারে দো-আলমের নয়নমণিতে পরিণত হলেন! এ সৌভাগ্য কি সব পাওয়া থেকে বড়ো পাওয়া নয়, নয় কি এটা ইহ-পরকালের পরম ও চরম মর্যাদা! বিশ্ববাসী নারীকূলের জন্যে কি এ ঘটনা এ শিক্ষা বহন করেনি যে, ভালো কিছু পেতে হলে অবশ্যই কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং এ যামানার পরে সকল মাতৃকূল কি এ শিক্ষা লাভ করেনি যে তারা তাদের স্বভাবজাত চাহিদা-নিচয়কে দমন করার মাধ্যমে স্বামীর সন্তোষের সাথে সাথে বেহেশতের সুসংবাদ ও নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে!

কোরআনের আয়াতে আমরা এখানে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমরা যেন দেখছি যে প্রবাহমান প্রেম-সুধার নহরের সামনে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি। প্রেমের প্রতীক মহান নবী (স.)-কে যেন সহাস্যবদনে আমাদের সামনে উপবিষ্ট দেখতে পাচ্ছি! তিনি আয়শাকে ভালবাসেন, এটা সবার কাছেই সুস্পষ্ট, স্বভাবতই তিনি চাইছেন তার মর্যাদা আরও বাড়ুক এবং নবী (স.)-এর আদর্শ এবং উপযুক্ত স্ত্রী হওয়ার মর্যাদায় তিনি ভূষিত হন; আল্লাহ রব্বুল আলামীনও চাইছেন তাঁর

জন্যে আয়শাকে আদর্শ বানাতে, চাইছেন নবীর পরিবারের জন্যে এই মহিয়ষী মহিলা এক আদর্শ নমুনা স্থাপন করুন, এই জন্যে এখতিয়ার দেয়ার কাজটি তাঁর থেকেই শুরু করা হয়েছে। তাঁর মর্যাদা-বৃদ্ধি এবং আল্লাহ-মুখী হওয়ার প্রচেষ্টায় যেন তিনি তার বাপ-মার সাথে পরামর্শ না করে জলদি কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে বসেন।

অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তো ভালো করেই জানতেন আয়শার বাপ-মা তাকে বিচ্ছেদ ঘটানোর পরামর্শ দেবেন না, যেমন আয়শা (রা.)-এর প্রথম কথাতেই জানা গেছে। যেহেতু নবী (স.)-এর হৃদয়ে তার জন্যে কতো মধুর অনুরাগ ছিলো, একথা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাঁর থেকে বেশী কে আর জানতো! তাই তিনি একথা বুঝে তার মতামত প্রকাশ করতে ভুল করেননি। তিনি হৃষ্ট-চিত্তে যে কথাটি বলে উঠলেন তা তার গভীর হৃদয়ানুভূতির সুবাস ছড়িয়ে এমনই এক মধুর কথোপকথোনকালে বেরিয়ে এলো। মানুষ নবী (স.)-এর হৃদয় থেকে তাঁর কনিষ্ঠতম স্ত্রীর জন্যে প্রাণঢালা মোহব্বত ঝরেছিলো। এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর হৃদয়াবেগ এক স্ত্রীর জন্যে উদ্বেলিত হলে অন্য স্ত্রীরা কি কষ্ট পাননি? এর জবাব হচ্ছে, সবাই জানেন যে একমাত্র তিনিই ছিলেন কুমারী বাকি সবই ইতিপূর্বে কিছু না কিছু স্বামী সোহাগ পেয়েছেন, একমাত্র আয়শা (রা.)-ই তা পাননি, এ জন্যে তার পাওনা অগ্রগণ্য। সবাই ছিলেন বয়স্কা এবং দু'একজন বাদে সবাই ছিলেন সন্তানের মা, আয়শা (রা.) ছিলেন নিঃসন্তান এবং নয় বছরের ছোট মানুষটি তিপ্পান্ন বছর বয়সের একজন মানুষকে, আল্লাহর নবী হওয়ার কারণেই সানন্দে বরণ করে নিচ্ছেন। এ জন্যে একটু বেশী আদর সোহাগ পাওয়া তার ন্যায্য হকও ছিলো, তাছাড়া ত্যাগ-কোরবানী ও মানবীয় সকল বৈশিষ্ট বিবেচনায় খাদীজা (রা.) বাদে তিনি বাকি সবার মধ্যে ছিলেন অনন্য, যার কারণে রসূলুল্লাহ (স.)-এর মনটা মানবীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবীতেই তার দিকে একটু বেশী ঝুঁকে ছিলো-এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দায়ী করেননি, যেহেতু এটা মানুষের আয়ত্বের বাইরে। তবে, বস্তুগত সকল ব্যাপারে ইনসাফ করার হুকুম রয়েছে এবং এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স.) ইনসাফ করে দেখিয়েছেন।

এ জন্যে রসূলুল্লাহ (স.) যে উন্নতর জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা নিয়ে দুনিয়ার স্বাদ আহলাদ ও বিলাস ব্যসনকে গৌণ করে দেখেছেন, সেই বুঝটা আয়শা (রা.)-এর মধ্যে বেশী পয়দা হোক এবং ইতিপূর্বেকার সর্বাধিক ত্যাগ-তিতীক্ষার সাথে আরও ত্যাগ যুক্ত হয়ে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাক এটাই ছিলো কাম্য। নবী (স.)-এর ত্যাগী জীবনের সাথে শরীক হয়ে তিনিও নবী (স.)-এর ঘরনী হিসাবে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারেন এবং পরবর্তী মোমেন নারীকূলের জন্যে আদর্শ স্থাপন করতে পারেন, তার রবও তার জন্যে এটাই চেয়েছেন। আয়শা (রা.)-এর আত্মপ্রকাশ এইভাবেই ঘটেছে। মানুষ হিসাবে, নারী জীবনের সব থেকে বড়ো পাওনা স্বামীর প্রাণঢালা ভালবাসা– সকল কিছুর বিনিময়ে তিনি তা অত্যন্ত দ্রুত ও তাৎক্ষণিক ইতিবাচক সিদ্ধান্তদানের মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন। তার প্রখর বুদ্ধিমত্তা তাকে জানাচ্ছে স্বামী কী চান, স্বামীর প্রশ্ন সর্বাগ্রে তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত হওয়ার আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি কাংখিত জবাবদানে সাফল্য মন্ডিত হচ্ছেন। তিনি পরম পুলকিত, প্রিয়তম স্বামী, প্রাণপ্রিয় আল্লাহর রসূল (স.)-এর মনোযোগ লাভে, তাঁর মোহব্বত হাসিল করায় এবং পিতামাতার সাথে পরামর্শ করার প্রতি অমনোযোগিতা দেখিয়ে কথা বলা দ্বারা নবী (স.)-এর মনোযোগ আকর্ষণে তিনি আসলেই সফল হচ্ছেন। তারপর আমরা আবারও আঁচ করতে পারছি তার নারীসুলভ চিন্তা-চেতনা ও উপলদ্ধিকে, যেহেতু তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আবেদন পেশ করছেন যেন তিনি তাঁর অন্য স্ত্রীদেরকে এ কথা না জানান যে এখতিয়ার দেয়ার পর তিনি নবী (স.)-কেই সব কিছুর বিনিময়ে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এ এখতিয়ার অন্যদেরকেও পরবর্তীতে দেয়া হয়েছে এবং তারাও নবী (স.)-কেই গ্রহণ করেছেন,

কিন্তু আয়শা (রা.) প্রথমে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় নবী (স.)-এর মনোযোগ লাভে অগ্রাধিকার পেয়েছেন এবং বুঝছেন তাঁর স্থান রসূলুল্লাহ (স.)-এর হৃদয়ের কতো কাছে। এ পর্যায়ে এসে আমরা নবুওতের মর্যাদাও অবলোকন করতে পারছি, দেখছি কেমন করে মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূলের ভূমিকা পালন করছেন, তিনি বলছেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে কঠোর হৃদয় বানাননি, বরং তিনি আমাকে সহৃদয়বান শিক্ষক বানিয়েছেন। আমি যা এখতিয়ার ওদের সবাইকে দেয়ার মনস্থ করেছি সে বিষয়ে আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জানাবো; সুতরাং এ বিষয়ে তুমি আমাকে তাদের কার সাথে কী ব্যবহার করবো বা কাকে কী বলবো না বলবো সে বিষয়ে কিছু বলো না।'

এ কথাগুলোতে দেখা যাচ্ছে, নবী (স.) তাদের সবার জন্যে যে বিষয়টিকে কল্যাণকর বলে বুঝেছেন তা কারও কাছে গোপন করা পছন্দ করেননি এবং তাদেরকে কোনো বড়ো পরীক্ষার মধ্যেও ফেলেননি; বরং সহজ অবস্থা যে চায় তার জন্যে তিনি সহজ অবস্থাকে অবারিত করে দিয়েছেন, যাতে করে সহজ অবস্থা গ্রহণ করে সে উপকৃত হতে পারে এবং পৃথিবীর সাধারণ আকর্ষণীয় দ্রব্য থেকে মনকে মুক্ত করে নিয়ে চিরস্থায়ী যিন্দেগীর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত এসব বৈশিষ্ট্য আমাদের বড়ো প্রয়োজন। গোটা জীবন এবং তার নানামুখী দাবী দাওয়াসমূহ আমাদের সামনে রয়েছে এগুলোকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না বা এসব বিষয়কে অন্তর থেকে একেবারে মুছেও ফেলতে পারি না; এগুলোকে আমরা অবহেলা করতে পারি না অথবা কোনো অবস্থাতেই এগুলোর অবমূল্যায়ন করতেও পারি না। এ জন্যে এ সব বিষয়কে আল্লাহর রসূল (স.) সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং আমাদের ও রসূলুল্লাহ (স.)-এর মধ্যে প্রকৃত যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা দরকার তা স্থির করে দিয়েছেন। এসব বিষয়ে তাঁর মর্যাদা ও সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা কি হওয়া দরকার তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা আজও আমাদের মধ্যে জীবন্ত রয়েছে। এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধের বিষয়টিও রয়েছে, মোহব্বতের আদান-প্রদান, যা কঠোর বাস্তবতার মধ্যে বড়ো প্রয়োজন তাও রয়েছে। বাস্তব জীবনের কঠিন সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়ে মানুষ যখন হতাশ হয়ে পড়ে তখন প্রেম-প্রীতির সুশীতল স্পর্শ তার হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে আশার স্নিগ্ধ আলো আর ঠিক তখনই সে সঠিক পথে চলার দিশা পেয়ে সংকটমুক্ত বোধ করে।

নবীপত্নীদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের মর্যাদা

কিছুক্ষণের জন্যে মূল আলোচ্য বিষয় থেকে একটু দূরে সরে গেলেও আসুন আমরা কোরআনুল করীমের মূল আয়াতের দিকে আবার ফিরে যাই, সেখানে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সঠিক অবস্থা আমরা দেখতে পাবো এবং আমাদের করণীয় কাজগুলো কিভাবে নিরূপণ করে দেয়া হয়েছে তাও বলা হয়েছে। সকল বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর আয়াতসমূহের স্বর্ণালী শিক্ষা জানানো হয়েছে,। এরশাদ হচ্ছে,

'কারো বুকে আল্লাহ তায়ালা দু দুটি হৃদয় বানাননি।'

অর্থাৎ নবী (স.) এর বাস্তব জীবনে ও তাঁর পরিবারের মধ্যে যে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে তাইই ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে অনুকরণীয়। এই বিবৃতির পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নবী (স.)-এর স্ত্রীদের জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর কাছে যে প্রভুত পুরস্কার রক্ষিত রয়েছে তার বিশদ বর্ণনা। এ বর্ণনায় একদিকে যেমন তাদের বৈশিষ্ট্যের কথা এসেছে, তেমনি এসেছে তাঁদের মহান দায়িত্বের কথাও। তাঁদের ব্যক্তিগত উঁচুমানের কারণে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে তাঁদের যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

হে নবী পত্নীরা, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ খোলাখুলি কোনো অশ্লীল কাজ করে, তাহলে তার জন্যে দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা ....তার কাজের পুরস্কার দান করবো, আমি (পরকালের জীবনে সত্যিই) তার জন্যে সম্মানজনক রেযেক প্রস্তুত করে রেখেছি। (আয়াত ৩০-৩১)

ওপরের আয়াত দু'টিতে বলা হচ্ছে যে, নবী (স.)-এর স্ত্রী হওয়ার কারণে যেমন সকল মোমেন স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনি তাদের দায়িত্বও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা মোমেনদের মা হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত। মোমেনদের মা ও নবী (স.)-এর স্ত্রী-এই দুটি মর্যাদা একত্রিত হয়ে তাদের ঘাড়ে কঠিন দায়িত্বের বোঝা এসে গেছে এবং এ দায়িত্ববোধ তাদেরকে হেফাযত করছে লজ্জাজনক সকল আচার আচরণের-আক্রমণ থেকে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ বা আচরণ করে বসে তাহলে তাকে অন্য যে কোনো ব্যক্তির তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি পেতে হবে। এটা এই জন্যে যে তাদেরকে যে উঁচু মর্যাদা দান করা হয়েছে তার অমর্যাদা করার কারণেই এ কঠিন সাজা। আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'এটা আল্লাহর জন্যে বড়োই সহজ।'

অর্থাৎ তাদের এ কথা ভালোভাবে হৃদয়ংগম করা দরকার যে মহা সম্মানিত রসূল (স.)-এর জীবন সাথী হওয়ার কারণেই যে কোনো ব্যক্তি মানবীয় এ সব দুর্বলতা থেকে দূরে থাকতে পারবে এই গ্যারান্টি তাদের কখনও দেয়া হয়নি, এ মর্যাদার কারণে অন্যায় কাজ করা তাদের কাছে কঠিনও করে দেয়া হয়নি, যেমন সাধারণভাবে মানুষ মনে করে, তবে মর্যাদানামক প্রাপ্ত হওয়ার নেয়ামতকে যে কদর করবে তাকে তার পুরস্কার দো-জাহানের সবখানেই দেয়া হবে, কিন্তু এ নেয়ামতের অমর্যাদা করলে শাস্তিও হবে দ্বিগুণ। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে অনুগত থাকবে এবং ভালো কাজ করবে'

'কুনূত' শব্দটি বলতে বুঝায় আনুগত্য ও বিনয় নম্রতা; এবং এই গুণ দুটির বহিপ্রকাশ ঘটে সকল প্রকার ভালো কাজের মাধ্যমে।......... এসব নেক আমলের দ্বারা যদি কেউ আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তার জন্যে আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে,

'আমি তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবো।'

একইভাবে তাদের অন্যায় কাজের সাজাও হবে দ্বিগুণ। এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁদের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন।

'আমি তাদের জন্যে সম্মানজনক রেযেক ঠিক করে রেখেছি।'

এ রেযেক অবশ্যই মজুদ রয়েছে এবং দ্বিগুণ পুরস্কারদানের ওয়াদার সাথে অতিরিক্ত সম্মানজনক রেযেক- দুনিয়াতেই নগদ পাওনা হিসাবে দান করার নিশ্চয়তা তাদেরকে দেয়া হয়েছে। এটা মানুষের জন্যে আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী এবং সকল বান্দার জন্যে বিরাট এক এহসান।

এরপর মোমেনদের মা-দের কাছে, তাদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদার কথা সুস্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে। তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, এসব নেয়ামত একমাত্র তাদেরকেই খাস করে দেয়া হচ্ছে যা অন্য কোনো মহিলাদেরকে দেয়া হবে না। তারা মানুষের সাথে কিভাবে ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে তাঁদের কর্তব্যও স্থির করে দেয়া হচ্ছে, স্থির করে দেয়া হচ্ছে তাদের জন্যে আল্লাহর হুকুম পালন করার পদ্ধতিসমূহ এবং ঘরে তারা কি কি কর্তব্য পালন করবেন তাও তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। আলোচ্য ঘটনার আলোকে নবী (স.)-এর এই সম্মানিত ঘরের

উপযোগী করে তাদেরকে যে বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে সে কথাটিকেও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হচ্ছে। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন বিশ্বনবী (স.)-এর এই মহান ঘরকে সকল আবিলতা থেকে হেফাযত করতে, মুক্ত করতে সকল প্রকার কলুষতা থেকে। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এই পবিত্র ঘর সম্পর্কে তাঁর অবতীর্ণ আয়াতগুলো তাদের স্মরণ করাচ্ছেন, স্মরণ করাচ্ছেন এই ঘরে সদা সর্বদা যে জ্ঞান ও বুদ্ধির গবেষণা হচ্ছে সে সম্পর্কে, যাতে করে এ বাড়ী সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথিবীর সকল নারীকূলের জন্যে আদর্শ হতে পারে এবং সবকিছুর ব্যাপারেই এ মর্যাদাপূর্ণ অনন্য ও একক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

নবী পত্নীরা, তোমরা অন্য নারীদের মতো (সাধারণ কোনো নারী) নও, যদি তোমরা (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তাহলে (বাইরের পুরুষদের সাথে) কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন করো না .... করা হয় তা স্মরণ রেখো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (বিষয় সম্পর্কে) জানেন এবং তিনি (সবার অবস্থা সম্পর্কেই) সম্যক অবগত। (আয়াত ৩২-৩৪)

পারিবারিক শান্তির রক্ষাকবচ

যখন ইসলামের আগমন ঘটলো তখন এই মহান আদর্শের সামনে উপস্থিত আরব সমাজ তৎকালীন অন্যান্য অনারব সমাজের মতো একই প্রকার কুসংস্কার ও ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলো। নারীদেরকে ভোগের সামগ্রী মনে করা হতো, তাদেরকে মাত্র কামনা বাসনা মেটানোর বস্তু মনে করা হতো; আর এই কারণে তাদেরকে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক মর্যাদা না দিয়ে হীন দৃষ্টিতে দেখা হতো।

এইভাবে সমাজের সর্বত্র যৌন উৎচ্ছৃখলতা বিরাজিত ছিলো এবং পারিবারিক বন্ধন ছিলো অত্যন্ত শিথিল। এই বর্ণনাও ইতিপূর্বে আলোচ্য সূরার মধ্যে এসে গেছে।

একথা সেকথা যাই বলা হোক না কেনো যৌন বিষয়ের প্রতি হীন নযর থাকার কারণে এবং সুরুচি বিনষ্ট হওয়ার ফলে তৎকালীন মানুষের এই অধপতন এসেছিলো, উন্মুক্ত উৎসব স্থলে উৎকট শারীরিক সৌন্দর্য্য ও যৌন উদ্দীপক দৈহিক প্রদর্শনী করা হতো। এর ফলে পরিচ্ছন্ন আবেগ-উচ্ছ্বাস ও প্রেম প্রীতি এবং সৎপথ চলার উদ্দীপনা প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। শুধু নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের চর্চা রয়ে গিয়েছিলো, যা তৎকালীন বিভিন্ন আরবী কাব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। তাদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে পাশববৃত্তি বিরাজ করতো, পশুদের মতোই তাদের লজ্জা শরম বলতে কিছু ছিলো না এবং মানুষ ও পশুর মধ্যে মানবতারূপ পার্থক্যটা তারা প্রায় ভুলেই দিয়েছিলো।

তারপর যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো, তখন নারী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেয়া হলো এবং নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানবতার দিকটিকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হলো। ইসলাম এ শিক্ষা দিলো যে, নারী পুরুষের সম্পর্ক শুধু দৈহিক ও যৌন তৃপ্তির বিষয়ই নয়, নয় এটা শুধু রক্ত মাংসের ক্ষুধা মেটানোর ব্যাপার! এটা হচ্ছে একজন ব্যক্তি থেকে উদ্‌গত দুই মানব সৃষ্টির মিলন। মোহব্বত ও পারস্পরিক দয়া সহানুভূতির স ম্পর্ক এবং উভয়ের এ মিলনের মাধ্যমে শান্তি ও আনন্দ আসে; মানবজাতির মধ্যে মিল-মোহব্বত পয়দা করার লক্ষ্যেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীকে গড়ে তুলতে তাদের পয়দা করেছেন এবং এর মধ্যেই তিনি তাদের খলীফা বানিয়েছেন।

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা পরিবারের মধ্যে বন্ধন কায়েমের মাধ্যমে এ বিশ্বকে আবাদ করেছেন, পারিবারিক জীবন থেকে গড়ে ওঠা এক নিয়মকানুন বানিয়ে দিয়েছেন। এরই ভিত্তিতে

মযবুত সামাজিক বন্ধন কায়েম হয়। এই পরিবারকে এমন এক সূতিকাগার বানানো হয়েছে যার মধ্যে ভবিষ্যতের বংশধর ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু জাতি লালিত হয়।

এই পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ বানানোর জন্যে একে বিভিন্নভাবে হেফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আর মানুষের ধারণা কল্পনা এবং ব্যক্তিগত লাগামদ্বারা ও মুক্ত চিন্তা থেকে পরিবারের সদস্যদেরকে পবিত্র রাখার জন্যে সর্ব প্রযত্নে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে,

আসলে ইসলামী শরীয়তের যতগুলো বিধান রয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটি বড়ো অংশ দখল করে আছে পরিবারকে কেন্দ্র করে এবং আমরা দেখছি, আল কোরআনের আয়াতসমূহ থেকেই সে সব বিধান আসছে, এসব বিধানের পাশাপাশি মুসলিম সমাজে প্রচলিত বাস্তব অনুশীলন থেকেই এসবের সার্বক্ষণিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যা পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত সেইসব মৌলিক নিয়ম কানুনকে শক্তিশালী করে, এগুলোর ভিত্তিতেই মূলত গড়ে ওঠে এক সুন্দর সমাজ। ইসলাম এমন এক সমাজ গড়তে চায় যা আত্মা ও মনের দিক থেকে হয় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, যা নারী ও পুরুষের সম্পর্ককে মধুর ও পবিত্র বানায়, তাকে সকল কলুষতা ও চারিত্রিক খারাবী থেকে, এমনকি এসব নিয়ম-কানুন মানুষকে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সর্বত্র এর যথাযথ নিরাপত্তা দেয়।

আলোচ্য এ সূরাটিতে এই সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে যে আইন কানুন বর্ণনা করা হয়েছে তা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধানের বিরাট একটি অংশ দখল করে আছে এবং আল কোরআনের এই আয়াতগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে যে কথাগুলো বলছেন তা আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে চিরদিনের জন্যে আমাদের সামনে এক মাইলফলক হয়ে রয়েছে, গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে তা এক উজ্জ্বল দিক-নির্দেশক হয়ে রয়েছে। এ ঘটনা তাঁদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় এবং আল্লাহর সাথে তাঁদের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। এমন এক শিক্ষা এখানে আছে যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা চান তোমাদের থেকে কলুষতা দূর করে দিতে',

যেহেতু [তোমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর] আহলে বায়ত। তিনি তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে পবিত্র করতে চান।'

আমাদের এখানে লক্ষ্য করতে হবে, কলুষতাকে দূর করার উপায়সমূহ কি কি? এবং কি কি উপায়ে মানুষকে পবিত্র করা যায় যা খোদ আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা বলছেন এবং সেগুলোকে বাস্তবে কাজে লাগিয়ে তিনি মানুষকে পবিত্র করছেন। ওরা তো আহলে বায়ত এবং নবী (স.)-এর স্ত্রী, তারা পৃথিবীর জানা সকল নারীদের মধ্যে সর্বাধিক পবিত্র। রসূলুল্লাহ (স.)-এর মর্যাদাপূর্ণ ঘরের হেফাযত থাকা সত্তেও মোমেনদের মা-দেরকে যেসব উপায়-উপাদান দ্বারা নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে অন্যান্যদের জন্যে এর থেকে আরও অনেক বেশী নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রয়োজন এবং অন্যান্যদেরকে আরও বেশী হেফাযতে রাখা দরকার।

নবী (স.)-এর স্ত্রীদেরকে যে উঁচু মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিলো আলোচ্য অধ্যায়ে সে বিষয়ে তাঁদের চৈতন্য উদয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে। সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা চাইছেন তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে, (কারণ তোমরা যে) আহলে বায়ত (প্রিয় রসূলের ঘরের লোক)। আরও চাইছেন তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে পবিত্র করতে।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সকল প্রকার গুণ দ্বারা ভূষিত করার কারণে রসূল (স.)-এর স্ত্রীরা সারা জগতের সকল রমণীকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারিণী

ছিলেন-এ জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনও চান তাঁরা এ অনন্য মর্যাদার কদর করবেন এবং এ মহা সম্মানের হক আদায় করবেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'হে নবীর স্ত্রীরা, তোমরা যদি তাকওয়া এখতিয়ার করে থাকো, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা অন্য স্ত্রীলোকদের মতো নও।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলার জীবন যদি তোমরা গ্রহণ করে থাকো তাহলে তোমাদের জানা দরকার যে, কোনো দিক দিয়েই তোমাদের অবস্থা দুনিয়ার অন্য কোনো মহিলার মতো নয়..... এমন এক অবস্থানে তোমরা উপবিষ্ট রয়েছো, যেখানে তোমাদের মর্যাদার অন্য কেউ অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু এ মর্যাদা একমাত্র তাকওয়া পরহেযগারী দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, শুধু নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণেই এ মর্যাদা নয়, বরং এ মর্যাদা লাভ তখনই সম্ভব যখন তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী বিশেষভাবে বর্তমান থাকবে, আর নবীর স্ত্রী হওয়ার সুবাদেই তোমাদের মধ্যে এ সব গুণাবলী চূড়ান্তরূপ নিতে পেরেছে।

এই অকাট্য ও চূড়ান্ত সত্যের ওপরেই দ্বীন ইসলামের মযবুত দ্বীন এর ভিত্তি গড়ে উঠেছে। রসূলুল্লাহ (স.) ও এ কথাটিকেও সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে চূড়ান্তভাবে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর সাথে সম্পর্কের কারণেই যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এ ধোঁকার মধ্যে যেন তারা না থাকে, তাঁর স্ত্রী বলে যে কারও জন্যে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ মর্যাদা আদায় করে আনতে পারতেন তাও নয়। এজন্যে তাঁর পরিবারকে ডাক দিয়ে তিনি বলছেন, 'হে ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ, তুমি নিজেকে আগুন থেকে বাঁচাও। হে সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মোত্তালেব, হে আব্দুল মোত্তালেবের বংশধর আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে বাঁচানোর আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তোমরা আমার সম্পদ থেকে যা খুশী চেয়ে নাও।'(১)

অপর আর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, 'হে কোরায়শ জাতি, তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও, হে কাবের গোষ্ঠী, তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও, হে হাশেমের গোত্র, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদুল মোত্তালেবের বংশধরেরা, তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও। শোনো আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে বাঁচানোর আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তবে তোমাদের হক রয়েছে আমার দরদ সহানুভূতি লাভ করার, এ জন্যে অবশ্যই আমি সে দয়া মমতার আর্দ্রতা দ্বারা সে আগুনকে নেভাবো।'

নারীদের রূপ ও সুরের পসরা যখন ধ্বংস আনে

যে জিনিসটি দ্বারা তারা আগুন থেকে বাঁচার আশা করবে তা হচ্ছে তাকওয়া। সেই তাকওয়ার গুণটি দ্বারা তারা যে উঁচু মর্যাদার অধিকারী হবে, সে বিষয়টি বর্ণনা করার পর আসছে সেই সব উপায়ের বর্ণনা যেগুলো দ্বারা আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা আহলে বায়তের লোকদের দোষ-ত্রুটি দূরীভূত করে তাদেরকে পুরোপুরিভাবে পবিত্র বানাতে চান। তাই এরশাদ হচ্ছে,

সুতরাং তোমাদের কথাকে মোলায়েম (ও শ্রুতিমধুর) বানিয়ো না, কারণ তাতে যার অন্তরের মধ্যে ব্যাধি রয়েছে, সে লোভাতুর হয়ে উঠবে।'

ওপরের আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন (বিশেষভাবে) নবী (স.)-এর স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেন, অজানা লোকদের সাথে এমন মোলায়েম ও মিষ্টি আওয়াযে কথা না

(১) মুসলিম শরীফের মধ্যে হাদীসটি আনা হয়েছে। (২) মুসলিম ও তিরমিযীতে বর্ণিত।

বলে, কারণ তাতে (নারী কণ্ঠের এই মধুর আওয়ায) মানুষের যৌন আবেগকে উস্কিয়ে দেয়, তাদের প্রকৃতিগত মোহকে নাড়িয়ে তোলে এবং যাদের অন্তরের মধ্যে (ভাবের আবেগ-দ্বারা অস্থির হয়ে যাওয়ার) ব্যাধি আছে তাদের মধ্যে কামনা বাসনার সৃষ্টি হবে এবং তাদের যৌন আবেগকে উদ্দীপিত করে তুলবে। ফলে, হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জিত হয়ে তারা কোনো অন্যায় পদক্ষেপ নিয়ে বসতে পারে! অবশ্যই এটা এক কঠিন সত্য যে, চিরদিন অসুস্থ অন্তর মানুষকে প্রবাহিত করে এবং অদম্য লালসা সৃষ্টি করে। সকল পরিবেশ পরিস্থিতি এ ধরনের শয়তানী ওয়াসওয়াসা সকল মানুষের পেছনে লেগে থাকে এবং এ দিকে তাদেরকে প্ররোচিত করে, এমনকি মহানবীর স্ত্রী মোমেনদের মায়েরাও তাদের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারে না। এ জন্যে, মৌলিক যেসব উপায়-উপকরণ মানুষকে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে সে সব উপাদানের প্রবেশ পথগুলো বন্ধ না করা পর্যন্ত কলুষ কালিমা ও নানা প্রকার কদর্যতা থেকে মানুষ বাঁচতে পারে না।

আমরা আজ যে সমাজে বাস করছি তার অবস্থা একবার চিন্তা করে দেখা দরকার। আমাদের এ যুগে আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভীতির অভাবে এবং মানুষের জীবন দুনিয়াকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ার কারণে এ মনোরোগ মানুষকে অধপতনের অতল তলে ডুবিয়ে দেয়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ফেৎনা-ফাসাদের সয়লাব, মানুষ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দাস হয়ে গেছে এবং লোভ-লালসা মানুষকে পশুর অধম বানিয়ে ফেলেছে, সব কিছুর মধ্যে যৌন আবেগকে হাওয়া দেয়া হচ্ছে এবং নারী-পুরুষের সহজাত বৃত্তি পারস্পরিক আকর্ষণকে নানাভাবে উস্কিয়ে তোলা হচ্ছে। তাদের উত্তপ্ত যৌন অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে, এমন পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলতে চাই, তাঁকে মানতে চাই এবং তাঁর হুকুম মতো জীবন যাপন করতে চাই, তারা এই চরম বিশৃংখল সমাজে কিভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখবো, কিভাবে এই পরিবেশে চলাফেরা করবো? যেখানে কণ্ঠস্বর উচ্চমার্গে তোলার জন্যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে কণ্ঠশিল্পের প্রতিযোগিতা নামে নারীরা তাদের সুরেলা কণ্ঠের মনমাতানো তালে সকল শ্রেণীর পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে বদ্ধপরিকর, উন্মত্ত-যৌবনা নারীরা তাদের সকল অংগ প্রত্যংগকে সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বেগানা পুরুষের সামনে এগিয়ে দিচ্ছে, প্রতিপক্ষকে আকৃষ্ট করার জন্যে যতো প্রকার যৌন সুঁড়সুড়ি থাকতে পারে সবকিছুকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কু-প্রবৃত্তিকে ভীষণভাবে জাগিয়ে তোলার জন্যে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চলছে, তাদের উচ্চমার্গের যৌনাবেগপূর্ণ সংগীতের লহরী পুরুষের হৃদয় তরংগে উপর্যুপরি আঘাত হেনে চলেছে- সে অবস্থায় তাদের কাছে আমরা কি পবিত্রতা আশা করতে পারি? কি করে এই কলুষিত অবস্থায় পবিত্র পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব- যেখানে ললনারা তাদের শারীরিক সৌন্দর্যকে সর্ব সমক্ষে বিকশিত করে হেলে দুলে চলেছে, আর কোমল কণ্ঠে প্রলুব্ধ করছে পুরুষদেরকে। সেখানে সেই সব অন্যায়-অপকর্ম ও দুশ্চরিত্রতা রোধ করা কিভাবে সম্ভব, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরই মূলোৎপাটন করতে চেয়েছেন, যাতে তাঁর অনুগত বান্দারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মধুর ও পবিত্র পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে? এই জন্যে আল্লাহ তায়ালা নারীকূল শিরোমনি ও মোমেনদের মায়েদেরকে মডেল হিসাবে তাঁদের জীবন, চাল চলন, বেশ ভূষা ও আচার আচরণকে সকল মানুষের অনুসরণযোগ্য করে তুলে ধরার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন,

'তোমরা এমন কথা বলো, যা বোধগম্য হয় (এবং যা অপরের জন্যে কল্যাণবাহী হয়) এবং কল্যাণকর হয়।

এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য, মোমেনদের মায়েদেরকে নরম মোলায়েম ও আকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বলতে মানা করা হচ্ছে এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এমন ভাষা ও এমন আওয়াযে কথা বলতে যা তাদের সবার জন্যে উপকারী হয়, তা যেন ভাল কথা হয়, মন্দ কথা না হয়। অবশ্য

এখানে আয়াতের যে উদ্দেশ্য বুঝা যায় তা হচ্ছে, নারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে কণ্ঠস্বর দিয়েছেন তা স্বাভাবিকভাবে পুরুষদের জন্যে প্রিয় ও আকর্ষণীয়। এরপর তারা আওয়াযকে মোলায়েম বানিয়ে তাদের কণ্ঠস্বরকে আরও সুমধুর, আরও আকর্ষণীয় বানাতে পারে এবং ইচ্ছা করলে সে এই মাধুর্যকে ঠেকাতেও পারে। এ জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন দৃঢ়তাপূর্ণ আওয়াযে কথা বলে এবং বেগানা পুরুষের সাথে জরুরী কথা ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে পরহেয করে, যেন তাদের গলার সুর বা কোনো ভাব-ভংগী, ঠাট্টা-মস্কারি, অপ্রয়োজনীয় গল্প-গুজব, রশিকতা বা আনন্দ-কৌতূকপূর্ণ কথা বলাবলি না করা হয়, যা শীঘ্র ও অথবা দেরীতে হলেও মনের মধ্যে দূরাকাংখার জন্ম দিতে পারে।

নারীদের ঘরে থাকার নির্দেশ ও তার কারণ

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তিনিই তাঁর সৃষ্টির সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনিই সঠিকভাবে তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে জানেন, জানেন তাদের অবস্থান সম্পর্কে। তিনিই মোমেনদের পাক পবিত্র মায়েদের সম্পর্কেই এ কথাগুলো বলেছেন, যাতে করে তাদের যামানার লোকদেরকে সম্বোধন করার সময়ে তারা এসব নিয়ম-কানুন মেনে চলে। অথচ পৃথিবীর সকল যামানার মধ্যে সে যামানা ছিলো সব থেকে ভালো এ কথা সবাই জানেন ও বুঝতে পারেন, তা সত্ত্বেও যদি এ সময়ে এতো সাবধানতা অবলম্বন করা লেগে থাকে, তাহলে এখন কতটুকু সাবধান হওয়া দরকার তা সহজেই অনুমেয়। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান গ্রহণ করো।'

এ আয়াতাংশের মধ্যে 'বিক্‌রুন' শব্দটি রয়েছে-এর অর্থ হচ্ছে যা ভারী হয়ে থাকে, স্থির হয়ে থাকে। কিন্তু এর দ্বারা অবশ্যই একথা বুঝায় না ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং কোনো সময়েই নড়াচড়া করা যাবে না বা বাড়ীর বাইরে আসা যাবে না। আসলে এ কথা দ্বারা যে সূক্ষ্ম ইংগিত পাওয়া যায় তা হচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা গুরুত্ব সহকারে জানাচ্ছেন যে, তাদের জীবনের (সুখ শান্তির) জন্যে ঘরকেই মূল স্থান বলে জানতে হবে, এটাই তাদের অবস্থানক্ষেত্র আর এর বাইরে যাওয়াটা একটা ব্যতিক্রম মাত্র, অর্থাৎ বাইরে তাদের বেড়ানোটা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম। জরুরী কোনো প্রয়োজনেই তারা বাইরে যাবে। সেখানে তারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশীক্ষণ থাকবে না এবং সেখানে থাকার ব্যাপারে নিজের তরফ থেকে কোনো আকর্ষণ বোধ করবে না এবং বাইরে থাকতে নিশ্চিন্ততাও বোধ করবে না। বাইরে যাওয়াটা শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। যা সারা হলেই তারা তাদের মূল স্থান (ঘরে) ফিরে আসবে যতোক্ষণ তাদের বিশেষ সেই প্রয়োজন না মেটে, যার জন্যে তাদের উপস্থিতি একান্ত দরকার, ততোক্ষণই তারা শুধু বাইরে থাকবে।

আর ঘরই হচ্ছে মেয়েদের আসল পরিবেষ্টনী, যেখানে তার প্রাণ শান্তি পেতে পারে এবং সেই প্রধান দায়িত্ব পালন করতে পারে যার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে পয়দা করেছেন। এই পরিবেষ্টনীর বাইরে তার মন অন্য কোনো কোথাও যেন অকারণে যেতে না চায়, সে যেন ঘর-বিমুখ এবং বাইরের কলুষ কালিমায় বিজড়িত না হয়, আর যে বিশেষ দায়িত্ব পালন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে পয়দা করেছেন তার বাইরে অন্য কোনো কঠিন পরিশ্রমের কাজে তারা নিজেদেরকে যেন নিয়োজিত না করে।

যেহেতু ইসলাম তাদেরকে ঘরমুখী থাকতে বলেছে এবং তাদেরই পরিচর্যায় বাচ্চা-কাচ্চাদের লালন পালনের ব্যবস্থা করেছে, এ জন্যে ইসলাম ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষদের দিয়েছে, বরং আয় রোযগার করে পরিবারের ভরণ পোষণ করা পুরুষদের জন্যে বাধ্যতামূলক করেছে। যাতে করে মায়েদের লালন-পালনের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে আয়-রোযগারের জন্যে কষ্ট করতে না

হয়, কষ্টের সময়ে তারা যেন সাহায্য পায়, মন-দিল যেন তাদের সুস্থির থাকে এবং কচি কচি বাচ্চাদের লালন-পালনের ব্যাপারে তারা যেন নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারে, ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সুশৃংখল থাকতে পারে, ঘরের মধ্যে এক শান্তির সুবাস ও হাসিখুশীর পরিবেশ বিরাজ করতে পারে।

অপর দিকে যে মাকে আয় রোযগারের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, নানা প্রকার কঠিন কাজ করতে হয়, সে কঠিন কাজ করতে করতে তার কোমলতা হারিয়ে ফেলে, কমনীয়তা, মেযাজের ভারসাম্য, যে মা নানা প্রকার দায়িত্ব-পালনের নিগড়ে পিষ্ট হয়, যাকে শারীরিক শক্তি প্রয়োগে নানাবিধ জটিল কাজে আবদ্ধ করে রাখা হয় তার পক্ষে ঘরের পরিবেশকে মনোরম, সুবাসিত ও হাস্য-মুখর রাখা সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় না তার পক্ষে বাচ্চার হক আদায় করা এবং নিপুণভাবে বাচ্চা-কাচ্চা মানুষ করার দায়িত্ব পালন করা। কর্মক্ষেত্র অফিস আদালত কল-কারখানা যেটাই হোক না কেনো, সাধারণত তার পরিবেশ হোটেল-রেস্তোরাঁ (পানশালা) থেকে উন্নত নয়। বাড়ীতে যে শান্তি ও পবিত্রতা সহযোগিতার পরিবেশ থাকে সেসব স্থানে তা না থাকতেও পারে না। এটা সত্য কথা ঘরের শান্তি-সম্প্রীতি মেয়েরাই গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর হাস্য মুখরিত চেহারাই ঘরের বাতাসে সুরভি ছড়ায় আর স্নেহ ও মায়া মমতার পরশ বুলিয়ে দেয়। ঘরের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হচ্ছে স্নেহময়ী মা। করুণাময়ী মা তার সকল শ্রম ও শক্তি ঘরের অংগনকে সুন্দর ও সুষমাময় করার জন্যে বিলিয়ে দেয়, তার আত্মার সকল আবেগ ঢেলে দিয়ে বাড়ীর গোটা পরিমন্ডলকে সাজাতে থাকে আর ততোক্ষণ পর্যন্ত এ জিনিস পূর্ণাংগ হয় না যতোক্ষণ তার সযত্ন সকল সাধনা সফলও হয় না।

অপর দিকে এসব দায়িত্বানুভূতি-বিবর্জিত নারী যখন বাইরের জীবনকে প্রাধান্য দেয় তখন তার কাছে ঘরের বাইরের প্রয়োজনগুলো বড়োই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এভাবে, এসব গুরুত্ব এড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্তেও যখন মানুষ বাইরের কাজকে প্রাধান্য দিতে থাকে, তখনই এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নেমে আসে অবশ্যম্ভাবী এক অকল্যাণের অভিশাপ ও দুঃখ-বেদনা, যা তার আত্মা ও বিবেক বুদ্ধিকে ঘেরাও করে ফেলে। তাই তো আমরা আধুনিক সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, গোটা পারিবারিক জীবন বিগড়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে অশান্তি অধঃপতন ও সব দিক থেকে অকল্যাণ ও ভ্রান্তি নেমে আসছে।(১)

মহিলারা যখন বিনা কাজে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন তার এই বেরোনো– হয় নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রয়োজনে হবে, না হয় গান-বাজনা ও নৃত্য-কলা শিল্পকে সমৃদ্ধ করার উদগ্র লালসার জন্যে হবে, যা তাদেরকে বিভিন্ন আসরে ও বিভিন্ন সামাজিক মেলামেশায় ঠেলে দেয়। (২)

(১) এই উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে, 'আস্ সালামুল আলামীয়া ওয়াল ইসলাম' গ্রন্থের 'সালামুল বায়েত' অধ্যায় থেকে পৃঃ ৫৪-৫৫।

(২) আল্লাহ তায়ালার এ স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম ভংগ করে যে সভ্যতা-সংস্কৃতি বাজারী পণ্যের মতো নারীদের পাইকারীহারে ঘরের বের করেছে, তাদের সমাজের ভয়াল চিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন, গত বছরের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্টের যেসব মহিলার অফিস-আদালত ও কল-কারখানায় পুরুষের সাথে কাজ করছেন-তাদের ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে, শতকরা ৬৯ জন কর্মজীবি মহিলাই কর্ম জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে যৌন হয়রানীর সম্মুখীন হয়েছেন। 'দি হিডেন লাইফ অব একসিকিউটিভ ওয়েমেন' নামক গ্রন্থটিতে এ পর্যায়ে এমন সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যা পড়লে রীতিমতো আঁতকে উঠতে হয়। তাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে ধ্বস নেমেছে তা রুখতে হলে মানুষদের আবার আল্লাহ তায়ালার নিয়মের দিকেই ফিরে যেতে হবে। এছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এই স্বল্প পরিসরে বিষয়টির বিশাল তথ্য ভান্ডার পেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাফসীর ফি যিলালিল কোরআন-এর পাঠক পাঠিকাদের বিষয়টি সম্পর্কে আরো বৃহত্তর অঙ্গনে পড়া-শুনা ও চিন্তা ভাবনা করার আবেদন জানাই।–সম্পাদক

এইটিই হচ্ছে সেই অধপতন ও ধ্বংস যার পংকিলতায় পড়ে মানুষ জীব জানোয়ার ও হিংস্র পশুর বিচরণ ক্ষেত্রে পৌঁছে যায়।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানায় নামাযের জন্যে মহিলারা ঘর থেকে বের হতেন এবং এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু সে তো ছিলো এমন এক যামানা যখন সাধারণভাবে মানুষ ছিলো সৎ, সকলের অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিলো এবং সে অবস্থাতেও মহিলারা নিজেদেরকে এমনভাবে আবৃত করে বের হতো যে তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না। তাদের শরীরের যৌন অনুভূতি উদ্রেককারী অংগগুলো বাইরেও প্রকাশ পেতো না, এতদসত্তেও রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়শা (রা.) ঘরের বাইরে যাওয়াটা পছন্দ করেননি।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে হযরত আয়শা (রা.)-এর আর একটি হাদীস পাওয়া যায়, তাতে তিনি বলেছেন, মোমেন মহিলারা ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ (স.)-এর জামায়াতে শরীক হতেন। তারপর যখন তারা চাদরে আবৃত্ত অবস্থায় ফিরে আসতেন তখন অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না। এই হাদীস দু'টির আর একটি বর্ণনায় হযরত আয়শা (রা.) থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন, 'যদি রসূলুল্লাহ (স.) জানতে পারতেন (বাইরে বেরুলে) মেয়েদের কি কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে তিনি তাদের মসজিদে যাওয়া থেকে মানা করে দিতেন, যেমন বনী ইসরাঈল জাতির মহিলাদেরকে মানা করা হয়েছিলো।

বাইরে বেরুনোর সময় সাজগোজ না করার নির্দেশ

এখন বুঝা দরকার, হযরত আয়শা (রা.)-এর যামানায় মহিলাদের কি কি অসুবিধা হয়েছিলো? আর কি কি বিপদের আশংকা তিনি করেছিলেন, যার কারণে তিনি মনে করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (স.) সেগুলো জানলে অবশ্যই তাদের মসজিদে নামায পড়তে যাওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন। আমাদের ভেবে দেখা দরকার, আজকের পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে সে অসুবিধাটা কি হতে পারে! আমরা একটু আন্দাজই করে দেখতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন,

'(হে মহিলারা) 'প্রথম জাহেলী যুগের মতো তোমরা সেজেগুজে বেরিয়ো না।'

এ আয়াতাংশে বুঝা যাচ্ছে, বাড়ীতে অবস্থান গ্রহণ করার হুকুম হওয়ার পরও যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়ে, তাহলে যাওয়া যাবে, কিন্তু সে যাওয়াটা সেজেগুজে অপরের মনোরঞ্জন করার জন্যে হবে না। আসলে জাহেলী যুগের মেয়েরা বাইরে যাওয়ার সময়ে সাধারণভাবে সেজে গুজেই বের হতো। কিন্তু আদিম জাহেলী যুগে মহিলারা সাধারণভাবে অথবা সেজেগুজে যেভাবেই বের হোক না কেনো, এই নব্য যুগের সাথে তার তুলনা করলে কেউই স্বীকার করবেন যে, অতীতের সকল যামানাকেই আধুনিক জাহেলিয়াত সবদিক দিয়েই হার মানিয়েছে।

মোজাহেদ বলেন, জাহেলী যামানায় পুরুষের মাঝে মহিলাদের অবাধ চলাফেরা ছিলো এটাকেই তাবাররুজ বলা হয়েছে।

ক্বাতাদা বলেন, 'ওদের হাঁটার একটা বিশেষ ধরণ ছিলো। শীরর হেলে দুলে লাস্যময়ী ভংগীতে হাটতে এবং এতে তাদের প্রতি পুরুষরা প্রলুব্ধ হতো। এই ধরনের চলনকে আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

মোকাতেল ইবনে হাব্বান বলেন, 'তাবাররুজ' বলতে বুঝায় যে, স্ত্রীলোকরা মাথার ওপর ওড়না পরতো ঠিকই, কিন্তু মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে বাঁধতো না, বরং ওড়না এমনভাবে কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিতো যে তাদের কানের অলংকার, গলা এবং ঘাড় দেখা যেতো, এইটিই ছিলো তাদের সাজগোজ।

ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বলেন, সে সময়কার মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষদের মধ্যে এমনভাবে চলাফেরা করতো যে তাদের বক্ষ স্ফীতাবস্থায় রাখতো এবং তার ওপর কোনো আবরণী বা ওড়না থাকতো না, কখনও কখনও তাদের ঘাড়, কানের অলংকার ও গলার হার প্রদর্শন করতো (এবং এইভাবেই তারা পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো) এ জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মোমেন মেয়েদেরকে সেসব অংগ প্রত্যংগকে ঢাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের এসব জায়গাগুলোকে পুরুষদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখতে বলেছেন।

জাহেলী যুগে এসবই ছিলো সাজগোজের বিভিন্ন অবস্থা, যা মহান আল্লাহ তায়ালা কোরআনে করীমের মধ্যে মানা করেছেন, যাতে করে এসব আচরণের কুফল থেকে ইসলামী সমাজ বাঁচতে পারে এবং ফেতনা-ফাসাদ, সমাজ বিধ্বংসী আচার আচরণ, কার্যকলাপ ও বিপথগামী হওয়া থেকে মানুষ দূরে থাকতে পারে। তাদের আদব শৃংখলা ও পারস্পরিক সম্পর্ককে উন্নত করতে পারে এবং তাদের উঁচু মানের রুচিবোধ ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের পরিচয় দিতে পারে।

আমরা এখানে বলতে চাই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর রুচি তাই, যা মানুষের জন্যে উপকারী এবং সবদিক দিয়ে কল্যাণকর। কিন্তু মানুষ তো বেশী দূরের জিনিস দেখতে বা বুঝতে পারে না, এ জন্যে তার কাছে উপস্থিত ও নগদ আনন্দদায়ক যা, তাই ভালো লাগে, ভালো লাগে তার কাছে তাৎক্ষণিকভাবে যৌন উন্মাদনা সৃষ্টিকারী আচার আচরণ। এ কারণেই উত্তেজনা সৃষ্টিকারী উন্মুক্ত অংগসমূহ তারা প্রদর্শনী করতে চায়, যাতে মানুষ মোহাবিষ্ট হয়। অবশ্য এটা ঠিক যে, আত্মার উৎকর্ষ সাধনকল্পে ইসলামী ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটাতে চাওয়া হয়েছে, মুসলমানদের মধ্যে যে সুকুমারবৃত্তির চর্চা করা হয়েছে, মানবতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর যে পাক-পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পয়দা করা হয়েছে এবং যেভাবে চেতনাকে সুন্দর করে তোলা হয়েছে, তার থেকেও সে কদর্য যৌনানুভূতির উস্কানি ছিলো বেশী আকর্ষণীয়। তবে, মানবতার পূর্ণ বিকাশ-সাধনে নিয়োজিত ব্যবস্থা মানব কল্যাণকল্পে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে স্থায়ী মানদন্ড দিতে কখনও ভুল করে না। নারীদের সৌন্দর্য চর্চা ও তার বিকাশ সাধনকে ইসলাম মোটেই নিরুৎসাহিত করে না, বরং সে তার সঠিক মূল্যায়ন করে। তার সার্বিক ও স্থায়ী মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এক মহান প্রোগ্রাম পেশ করে। কিন্তু আফসোস, দুর্গন্ধময় ও জাহেলী কর্দমাক্ততা যাদের মনমগজকে আচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে তাদের নযরে ইসলামী ব্যবস্থার এ সৌন্দর্য সহজে রেখাপাত করে না। কারণ, তারা তাদের বাহ্যিক চোখ দিয়ে শুধু বিবস্ত্র মাংসপিন্ডের সৌন্দর্যটা দেখে এবং এর বাহ্যিক আবেদনটাই তারা বেশী শুনতে পায়।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের এ অবিস্মরণীয় আয়াত জাহেলী বা আদিম মূর্খ যামানার কদর্য ও ঘৃণিত রীতিনীতির দিকে ইশারা করতে গিয়ে বলছে যে, বাইরে বের হওয়ার সময় সাজগোজ করার এ অভ্যাসটি জাহেলিয়াতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। এটা অনুসরণে আধুনিক জাহেলিয়াত পুরাতন জাহেলিয়াতের ওপর আরও এক কদম এগিয়ে গেছে এবং তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতি সব প্রাচীন জাহেলিয়াত থেকেই গৃহীত।

এটাও সত্য কথা যে, জাহেলিয়াত-মূর্খতা বা অজ্ঞতা কোনো এক যামানার বৈশিষ্ট্য নয় যে, এটা নিদৃষ্ট একটি যামানায় বা কোনো এক নির্দিষ্ট দেশে বা নির্দিষ্ট সময়ে থাকবে। আসলে এটা একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থা, এর পেছনে জীবনের এক নির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা সক্রিয় রয়েছে। হতে পারে এ অবস্থা আবারও আসবে, এ চিন্তা আবারও পুনরুজ্জীবিত হবে। পূর্বের জাহেলিয়াত তখন নব্য জাহেলিয়াতের জন্যে দিশারী হিসাবে কাজ করবে, তা যখন এবং যেখানেই হোক না কেনো!

এ কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ এখন এক অন্ধ জাহেলিয়াতের দিকে এগিয়ে চলেছে, যা ভালো মন্দ কিছুই দেখতে পায় না, যা স্রোতের গতিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে স্থুল অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে, যার চিন্তাধারার মধ্যে পাশববৃত্তিই অধিক ক্রিয়াশীল। এটি মানব জাতিকে মানবতাবোধ থেকে সরিয়ে নিয়ে হীনতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করার জন্যে বদ্ধপরিকর। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি, এহেন মানবনির্মিত সভ্যতায় না আছে কোনো পবিত্রতা, না আছে কোনো স্বচ্ছতা না আছে এমন কোনো বরকত যা জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারে। এ আধুনিক ব্যবস্থা অপবিত্রতা ও কদর্যতা থেকে পবিত্রতার দিকে এগিয়ে নেয়ার মতো কোনো উপায় উপাদান সরবরাহ করার কোনো গ্যারান্টি দিতে পারেনি, পারেনি আদিম জাহেলিয়াতের ক্ষতিকারক দিক থেকে মানুষকে নাজাত দেয়ার কোনো কর্মসূচী পেশ করতে। আল্লাহ রব্বুল ইযযতের প্রেরিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই অতীতের মূর্খতা ও যুক্তিহীন অবস্থার ক্ষতি থেকে মানুষকে সত্যিকার কল্যাণের দিকে ও মানবতার বিকাশ সাধনের দিকে ডাকে। মানুষে মানুষে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনে এবং সকল দিক দিয়ে মানবতার সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনে সর্বপ্রথম এ জীবন ব্যবস্থাই এগিয়ে এসেছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের মানুষরাই এ কাজে প্রথম সাড়া দিয়েছেন, তারা এ ব্যবস্থাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে এবং সুস্পষ্ট বুঝ নিয়ে গ্রহণ করেছেন।

কোরআনুল করীম সব উপায় ও পদ্ধতির দিকে নবী (স.)-এর স্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর সাথে সম্পর্কিত করে দিচ্ছে, তাদের অন্তরগুলোকে মহা আলোকময় আকাশের দিকে তুলে উর্ধগামী দিচ্ছে, যেখানে শুধু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নূরই বিচ্ছুরিত হয়, আল্লাহর মেহেরবানীতে ধীরে ধীরে তাঁদের অন্তর নশ্বর পৃথিবীর সাময়িক চাকচিক্যকে পরিহার করে শুভ্র সমুজ্জ্বল মহাকাশ পানে এগিয়ে যেতে পারে, আর সেই পদ্ধতিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ,

'তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো।'

সামাজিক জীবনের মধ্যে বাস করার সময় যেসব বাস্তব ব্যবহার ও কার্যকলাপের সম্মুখীন হতে হয়, সেসব থেকে জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কিছু অনুষ্ঠান পালন করার নাম এবাদাত নয়; বরং গোটা জীবনে আল্লাহ পাকের সকল হুকুম পালন করার মাধ্যমে তাঁর পূর্ণাংগ আনুগত্য করাই হচ্ছে এবাদাত। এ জন্যে এই বিশেষ আনুষ্ঠানিক কাজগুলো অবশ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং এগুলো সেই আনুগত্যপূর্ণ জীবন যাপনের পথের পাথেয় হয়। সুতরাং, আনুগত্য প্রকাশক সে অনুষ্ঠানসমূহ আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে এবং তা এ পথের উপাদান হিসাবে কাজ করে, আর আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক যতো গভীর হবে ততোই মোমেনের অন্তর পবিত্র হবে ও নানাবিধ কলুষ-কালিমা থেকে তা মুক্ত হবে।

আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কের কারণেই মানুষের নযরে মানুষ সম্মানিত বলে বিবেচিত হয়, সমাজের নেতৃত্ব ও আশেপাশের পরিবেশ ও পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে এসে যায় এবং তখন সে ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, তার এসব সাফল্যের পেছনে এই জিনিসটিই সবথেকে বেশী সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এ সময়ে সে নিজেই বুঝতে পারে যে, সে হচ্ছে মানুষের মধ্যে বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং অধিক সম্মানিত, সমাজ ও আশে পাশের পরিবেশের মধ্যে মানুষের কাছে সেই বেশী মর্যাদাবান। সে আরও বুঝতে পারে যে, সে হেদায়াতের যে নূর দেখতে পাচ্ছে, তার দ্বারা

অপরকে অধিক যোগ্যতার সাথে পরিচালনা করা যায়। কেননা, মানবনির্মিত জাহেলী ব্যবস্থা আল্লাহর ব্যবস্থার বিরোধী হওয়ার কারণে তা জীবনকে চরম অধপতনের দিকে নিয়ে যায়।

ইসলাম এমন একটি একক ও তুলনাহীন জীবন ব্যবস্থা, যার মধ্যে যুক্তি বুদ্ধি ও মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার মতো কর্মসূচী, নিয়ম শৃংখলা, চরিত্র, জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী ও সঠিক আদব কায়দা মজুদ রয়েছে........ অবশ্য এসব কিছু পরিচালিত হয় তার অন্তরের গভীরে অবস্থিত দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এই আকীদার ভিত্তিতে সঠিক কাজ করার জন্যে প্রয়োজন এক বিশেষ আকাংখা। হ্যাঁ, এই সামগ্রিক ও সর্বব্যাপী জীবন ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার ওপরই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে, যার অভাবে গোটা বিশ্ব অশান্তির অংগারে পরিণত হচ্ছে। এ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে নামায কায়েম, যাকাত আদায় এবং জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে।

আহলে বায়তের অনুকরণীয় আদর্শ

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা ও খলীফা হিসাবে যে মানুষকে পয়দা করলেন, তার প্রতি এসব নির্দেশ দান করে তাকে চিন্তা-চেতনা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক যোগ্য ও আদর্শ হিসাবে দুনিয়ার সামনে দাঁড় করাতে চাইলেন এবং মহান রাব্বুল আলামীন রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘর ও তার অধিবাসীদেরকে সেখানে পেশ করলেন আদর্শের প্রতীক হিসেবে। এরা নামায-রোযা ও আল্লাহর যাবতীয় হুকুম পালন করার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। এই আহলে বায়ত বা রসূলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র গৃহবাসীরা ছিলেন পুরোপুরিই আল্লাহমুখী। আল্লাহমুখী হওয়ার জন্যে যেমন সদা-সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় হুকুম পালন করার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকা প্রয়োজন, তেমনি আনুগত্য প্রকাশক কিছু প্রতীকী কাজ নিয়মিতভাবে পালন করাও প্রয়োজন। সেই প্রতীকী কাজ (যা সকল মুসলমানের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য, তা) হচ্ছে নামায, রোযা এবং এ দুটি এবাদতের সাথে অন্যান্য যে কোনো হুকুম সামনে আসবে, তা মানার জন্যে সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকা, এ সকল ফরমাঁবরদারীর বিবেচনাতেই 'আহলে বায়ত' ছিলেন সারা দুনিয়ার সামনে মডেল বা আদর্শ। এই পরিবারটিকে মডেল বানানোর পেছনে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান, ইচ্ছা ও লক্ষ্যই প্রধানত সক্রিয় ছিলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আহলে বায়তদের থেকে সকল প্রকার কলুষ কালিমাকে দূর করতে চান এবং তাদেরকে সকল দিক থেকে পবিত্র বানাতে চান।'

এ আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেকগুলো মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়; এবং সেগুলোর প্রত্যেকটিই আকর্ষণীয় এক স্নেহ মায়ামমতায় ভরা।

আয়াতটির মধ্যে 'আহলুল বায়ত' (গৃহবাসী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন্ ঘর তা বলা হয়নি। কিন্তু 'আল বায়ত' শব্দের মধ্যে 'আল' নির্দিষ্টসূচক অব্যয় রয়েছে, যেমন, আশ-শামসু, আল ক্বামারু ও আল কাবা, অর্থাৎ এ শব্দগুলো দ্বারা যে সব জিনিসকে বুঝায় সেগুলোর প্রত্যেকটি নিজ নিজ স্থানে একক বোধক, এগুলোর কোনো দ্বিতীয় নেই। এগুলোর জন্যে ইংরেজীতে যেমন 'দি' ব্যবহার করা হয়েছে, আরবীতে তেমনি এর সম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে 'আল্'। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, আল বায়ত হচ্ছে সেই একক ও অদ্বিতীয় ঘর বা বাড়ী যার সমকক্ষ দুনিয়াতে আর কোনো ঘর নেই। বায়ত+আল্লাহ= 'বায়তুল্লাহ' এবং বায়ত+আল+হারাম= 'বায়তুল হারাম' বলে যেমন আল্লাহর মর্যাদাবান ঘর বলে অভিহিত করা হয়েছে, তেমনি আহল+আল+বায়ত='আহলুল বায়ত' বলে একমাত্র নবী (স.)-এর ঘরকে সারা পৃথিবীর বুকে মর্যাদাবান বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং এই মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই মোমেনদের জানাচ্ছেন,

'অবশ্য তিনি তোমাদের থেকে সকল কলুষ কালিমাকে দূর করে দিতে চান, হে আহলে বায়ত (বিশেষ ঘরের বাসিন্দারা) এবং তোমাদেরকে সর্বোতভাবে পবিত্র করতে (চান তিনি)।'

এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, তাদের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর স্নেহের কথা এবং এই স্নেহের কারণ বর্ণনা করে বলা হচ্ছে, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের মর্যাদা বাড়াতে চান এবং তিনি আহলে বায়তের মধ্যে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা আনতে চান, তিনি তাদেরকে পবিত্র বানাতে চান এবং তাদের মধ্য থেকে সকল কলুষ কালিমাকে দূর করতে চান। হ্যাঁ, তাদেরকে পরিচালনার জন্যে এটা আল্লাহর সরাসরি মর্যাদাপূর্ণ হস্তক্ষেপ। যখন আমরা চিন্তা করি– এ কোন মহান সত্ত্বা, যিনি এ পবিত্র বাণী উচ্চারণ করছেন, তখন দেখতে পাই, এ বাণী উচ্চারণকারী হচ্ছেন সেই মহামহিম সম্রাট, যিনি গোটা বিশ্বের প্রতিপালক, যিনি তাঁর সৃষ্টিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হয়ে যাও, ব্যস- তা অমনি হয়ে যায়।' মহা-সম্মানিত ও মহা মর্যাদাবান আল্লাহ, তিনিই সবার খবরদারী করেন, হেফাযত করেন, তিনি মহা শক্তিমান, যিনি শক্তি বলে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করেন.......... তাঁর এ শব্দগুলো সামনে রেখে যখন আমরা চিন্তা-ভাবনা করি, তখন তাঁর কথার অর্থসমূহ একে একে আমাদের বোধগম্য হতে থাকে; হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরম মর্যাদাপূর্ণ আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বের কথা শ্রদ্ধাসহকারে অনুভূত হতে থাকে।

মহান পরওয়ারদেগার এ কথাগুলো সেই পবিত্র কেতাবের মধ্যে উল্লেখ করছেন, যার তেলাওয়াত মহাকাশের সর্বোচ্চ মনযিলে এবং দুনিয়াতে সদা-সর্বদা নিশিদিন পঠিত হচ্ছে, পঠিত হচ্ছে পৃথিবীর কোণায় কোণায় প্রতি মুহূর্তে। এ পাক কালামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোটি কোটি মানুষ আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য প্রকাশ করে চলেছে। এ পাক কালামের আলোচ্য আয়াতগুলোই ঘোষণা দিচ্ছে যে, এই আকর্ষণীয় বাক্যসমূহ 'আল বায়ত'-এর মধ্য থেকে সকল আবিচলতাকে দূরীভূত করতে চায় এবং এ ঘরকে সকল পাক-পংকিলতা থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই এগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে 'তাত্বহীর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে পবিত্রকরণ। আর (আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক) অপবিত্রতা বা কলুষতা দূরীভূত করণ দ্বারা সেই সব উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হয় যেগুলোর ফলে মানুষ নিজেদেরকে নিষ্কলুষ বানানোর এরাদা করতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিজেই যখন কাউকে পবিত্র করতে চান, তখন সে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে সব উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন, আল্লাহ তায়ালা সেগুলো তার জন্যে সহজ করে দেন। এর ফলে তারা তাদের কর্মজীবনে সে সব উপায় ও পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করে। এটাই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা.........অন্তরের মধ্যে চেতনা ও তাকওয়া সৃষ্টি করা। যার প্রতিফলন ঘটবে ব্যবহার ও কাজের মধ্যে। এভাবেই পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম হবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হবে।

নবী (স.)-এর স্ত্রীদেরকে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা গড়তে চেয়েছিলেন তার বিবরণ শেষ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর স্ত্রী হওয়ার কারণে তাঁদের মর্যাদার বিবরণও এখানে শেষ হচ্ছে, সমাপ্ত হচ্ছে তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহর মেহেরবানীর বিবরণ। তারপর মহান রাব্বুল আলামীন তাঁদের ঘরগুলোকে কোরআন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা নাযিল হওয়ার উপযুক্ত স্থানে পরিণত করলেন, এ ঘরগুলোকে আলো, হেদায়াত ও ঈমানের উৎস বানালেন। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করো! (হে নবীর স্ত্রীরা) আল্লাহর সেই সব আয়াত এবং জ্ঞানগর্ভ কথাগুলোকে– যা তোমাদের ঘরসমূহে পঠিত হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত।'

অর্থাৎ, এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন মহা সৌভাগ্যের প্রতীক, উপদেশ দেয়ার জন্যে এ পাক পবিত্র কালামই যথেষ্ট। এটা এজন্যে যেন মানুষ তাঁর মহান মর্যাদা বুঝতে পারে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কীর্তিসমূহ অনুভব করে এবং আল্লাহর ভান্ডারে রক্ষিত চির নেয়ামতসমূহের প্রাচুর্য হৃদয়ংগম করতে পারে, যার সমকক্ষ অন্য কোনো নেয়ামত হতে পারে না।

আরেকটি মূল্যবান উপদেশের কথা এখানে আসছে, যা নবী (স.)-এর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে দেয়া হয়েছিলো, আর তা হচ্ছে, তারা যেন ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার সাময়িক সুখ-সৌন্দর্য্য ও সাজ-সজ্জার সাথে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের স্থায়ী যিন্দেগীর তুলনা করে দেখে এবং বুঝতে চেষ্টা করে যে, কোনটা বেশী গ্রহণযোগ্য। এতে করে তারা বুঝতে পারবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সারা দুনিয়ার নারীকূলের মধ্যে যে মর্যাদা দান করেছেন তা কতো বড়ো নেয়ামত এবং দুনিয়ার যিন্দেগীর সুখ-সম্পদ সে মহা নেয়ামতের তুলনায় কতো তুচ্ছ-কতো সামান্য।

ঈমানদারদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ইসলামী জামায়াতকে পবিত্র বানানোর ক্ষেত্রে এবং ইসলাম যে মূল্যবোধ নিয়ে এসেছে তার ভিত্তিতে জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার জন্যে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা আসলেই সমান সমান। এ বিশ্বের যা কিছু সৌন্দর্য্য ও যা কিছু সমারোহ তা তাদের উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই এসেছে......... এ জন্যে সেইসব মূল্যবোধকে আমি একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে চাই।

'অবশ্যই মুসলমান পুরুষ ও নারী, মোমেন পুরুষ ও নারী,.................. তাদের (সবার) জন্যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহা পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন।' (আয়াত ৩৪)

অর্থাৎ এই বহুসংখ্যক মূল্যবান গুণ একটি মাত্র আয়াতের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে যাতে করে এগুলোর ভিত্তিতে মুসলিম জাতিসত্ত্বার বিশাল প্রাসাদটি গড়ে ওঠে, আর সে গুণগুলো হচ্ছে ইসলাম, ঈমান, আনুগত্য, সত্যবাদিতা, সবর, বিনয়নম্রতা, দানশীলতা, রোযা, চরিত্রের হেফাযত এবং আল্লাহর বেশী বেশী স্মরণ। এসব গুনের প্রত্যেকটিই আত্মসমর্পণকারী মুসলিম জাতিসত্ত্বার বিশাল প্রাসাদের এক একটি মূল্যবান ইট।

এবারে আসুন, আমরা আরও নির্দিষ্ট করে এই সব গুণের বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝার চেষ্টা করি। ইসলাম , অর্থাৎ আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাস, এ দুটি কথার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, অথবা অন্যভাবে বলা যায়, একটি অপরটির সম্পূরক। আত্মসমর্পণ তো মানুষ তখনই করতে পারে যখন তার অন্তরে গভীর ও অবিচল বিশ্বাস পয়দা হয়, বরং বলা যায়, বিশ্বাসের অমোঘ দাবীই হচ্ছে আত্মসমর্পণ, আর সঠিক বিশ্বাসই মানুষের মধ্যে আত্মসমর্পণের প্রেরণা যোগায়।

ইসলাম (আত্মসমর্পণ) ও ঈমান (বিশ্বাস)-এর ফলশ্রুতিতে আনুগত্য, (কুনূত) সৃষ্টি হয়, অন্তরের অভ্যন্তরে সন্তুষ্টচিত্তে গঠিত এক তাগিদের কারণে, কোনো বাইরের চাপে আনুগত্যের এ মূল্যবান গুণটি পয়দা হওয়া সম্ভব নয়।

সত্যবাদিতা (সেদকুন) এ মূল্যবান গুণটি একমাত্র মুসলিম জামায়াতের মধ্যেই সুনির্দিষ্টভাবে এবং অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান থাকতে পারে, (অন্যদের মধ্যে এ গুণটির উপস্থিতি নেহাতই আপেক্ষিক)। অর্থাৎ যতোদিন অন্য কোনো জাতি তাদের স্বার্থ ও সুনামের জন্যে এ গুণটির প্রয়োজনবোধ করবে ততোদিন তারা এ গুণটির অধিকারী থাকবে, যখন তারা অনুভব করবে যে,

এ গুণটি ছাড়াই তাদের স্বার্থ বা সুনাম অর্জিত হচ্ছে, তখন তারা এ গুণটি ধরে রাখার আর কোনো পরওয়াই করবে না। এ জন্যেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন জানাচ্ছেন,

'মনগড়া মিথ্যা কথা তারাই তৈরী করে বলে– যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলোকে বিশ্বাস করে না।'

অতএব, সত্য কথা দ্বারা মিথ্যাবাদীরা ইসলামী জামায়াতের সারি থেকে বহিষ্কৃত হতে বাধ্য, বাধ্য সেই জাতির দল থেকে বাদ পড়তে– যারা পৃথিবীর বুকে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা-সততা ও সত্যবাদিতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সত্যকে তারা হৃদয়-মন দিয়ে গ্রহণ করেছে এবং এ মহান গুণটি প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।

আর সবর; হচ্ছে এমন একটা গুণ, যার অভাবে কোনো মুসলমান তার আকীদাকে ধরে রাখতে পারে না এবং তার দাবীও পূরণ করতে পারে না। অর্থাৎ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষের মধ্যে সবর-এর গুণটি থাকে। যখন মন কোনো বিপদ আপদ ও কারও বিরোধিতায় অস্থির হয় না, বরং সর্বাবস্থায় অবিচল থাকে, তখনই সে নিজের আকীদার ভিত্তিতে দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে পারে। সবর-এর গুণ দ্বারা ঝোঁক প্রবণতা, সত্যবিমুখতা এবং নানা মানসিক পরিবর্তন থেকে মানুষ বাঁচতে পারে, যে কোনো পরীক্ষায় ও ফেতনা-ফাসাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে পারে, সুখে ও দুঃখে মযবুত হয়ে থাকতে পারে। এই গুণটি ছাড়া সত্য-সঠিক পথে অবিচলভাবে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

এরপর আসছে বিনয়াবনত থাকার গুণটি। এ গুণটি হচ্ছে অন্তর ও অংগ প্রত্যংগের বৈশিষ্ট্য। এই গুণটির কারণেই অন্তরের মধ্যে আল্লাহর মেহেরবাণী ও তাঁর মর্যাদার প্রভাব পড়ে এবং তাঁর সম্পর্কে এক লজ্জানুভূতি ও ভীতি পয়দা হয়। এরপর সদকা করার বিষয়টিও আলোচ্য। এ গুণটি দ্বারা অন্তরের সংকট ও সংকীর্ণতা নিয়ন্ত্রিত হয়, মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শনের চেতনা জাগ্রত হয়, দলীয় জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়, বান্দার হক আদায়ের জন্যে হৃদয়ের মধ্যে প্রেরণা জাগে এবং উপকারীর উপকার স্বীকার করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোভাব পয়দা হয়।

তারপর রোযা রাখার তাৎপর্যটি কতো মধুর– তাও লক্ষণীয়। বৈধ ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ ও নিয়ন্ত্রিত করার এবাদাতটি একটি কষ্টের কাজ হলেও এই কষ্ট বরদাশত করাকে একটি বিশেষ গুণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি পয়দা হয় এবং জীবনে সবদিকে তার শৃংখলা ফিরে আসে। এ মহান গুণটির প্রধানতম তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষের দেহের চাহিদার ওপর মনের চাহিদার নিয়ন্ত্রণ লাভ, জীবনের প্রধান প্রধান চাহিদাকে নিজের আয়ত্তে আনার শক্তি অর্জন, ইচ্ছা শক্তিকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানবতাকে পাশববৃত্তির ওপর বিজয়ী করা।

এবারে লজ্জাস্থানগুলোকে হেফাযত করার প্রশ্নটি। এটি হচ্ছে এমন এক বিষয়ের প্রশ্ন, যার সাথে জীবনের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা, শালীনতা ও মানব সমাজের সর্বত্র পারস্পরিক সুষ্ঠু সম্পর্ক জড়িত। আসলে এ বিষয়ের ওপর ইসলাম যে নিয়ম শৃংখলা শিখিয়েছে তার মাধ্যমে পশু জীবনের হিংস্রতা ও বর্বরতা ত্যাগ করে অন্তরের গভীরে মানবতা, নম্রতা, দরদ-সহানুভূতি ও শালীনতা সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে যে সতর্কতার মানসিকতা গড়ে ওঠে, তা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয় ও তাঁর তরফ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোনোভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। এ সতর্কতা পারস্পরিক সম্পর্ককে নিরাপদ, শৃংখলাপূর্ণ ও সংহত করে। এর ফলে মানুষ সেই মহান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে

পারে, যা নারী-পুরুষের মিলনের কারণে রক্ত-মাংসের ন্যায্য দাবী পূরণ করে। আলোচ্য আয়াত মানুষের এ দাবীকে দমন করে না, বরং একে তা নিয়ন্ত্রিত করে, একে আল্লাহর বিধানের অনুগামী বানায় এবং পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার ও জীবনকে সমৃদ্ধ করার দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়।

পরিশেষে জানানো হয়েছে বেশী বেশী আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করার বিষয়টি। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্মরণ এমন একটি গুণ যা সকল মানুষের মধ্যেই সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে সাহায্য করে। সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে তা দৃঢ় বানায় এবং প্রতি মুহূর্তে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর চেতনাকে এমনভাবে জিইয়ে রাখে যার কারণে সকল অবস্থা ও সকল পরিবেশে মানুষে মানুষে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে তারা এমন এক মযবুত রশি ধরতে পারে, যা কখনও ছিড়ে না। আল্লাহ পাকের স্মরণের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের বন্ধ দুয়ার খুলে যায়, সংকীর্ণতা, হীনতা ও হিংস্র মনোভাব দূরীভূত হয় এবং খোলা মনে ও হাসিখুশীর সথে তারা পরস্পর মেলামেশা করতে পারে, এমন এক অবস্থায় তাদের মধ্যে সত্যের এমন এক মহান আলো ছড়িয়ে পড়ে যা তাদের গোটা সত্ত্বাকে আলোকিত করে এবং তাদের মধ্যে ভালবাসা ও শান্তিপূর্ণ এক জীবন স্পন্দন এনে দেয়।

যাদের জীবন আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর স্মরণে অতিবাহিত হয় তাদের মধ্যে এই গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে। এ বিষয়টি তাদের মধ্যে সেই বলিষ্ঠ গুণাবলী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, যা তাদেরকে অন্য যে কোনো মানুষের জন্যে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় বানিয়ে দেয়। এরশাদ হচ্ছে,

'তিনি তাদের জন্যে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

এইভাবে সূরাটির প্রথম অধ্যায়ে আলোচ্য আয়াতগুলো নবী (স.)-এর স্ত্রীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করার পর এবার সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও নারীর মধ্যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্যেও ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এসব আয়াতে নারীদেরকে স্মরণ করানো হয়েছে যে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় এবং ইসলামের নির্দেশগুলো পালন করার মাধ্যমে নারীদেরকে পুরুষদের সাথে সমভাবে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষ ও নারী সমান অধিকার ও সুযোগ রয়েছে। আকীদার বাস্তবায়নের ব্যাপারে, পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে এবং জীবনের সকল কাজ, কথা, চিন্তা ও আনুষ্ঠানিক এবাদতের নিরীখে যদি চিন্তা করা হয় তাহলেও দেখা যাবে, সর্বক্ষেত্রেই নারী পুরুষের পাশে সমান মর্যাদা ও কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম। তারা উভয়েই পবিত্রতা অর্জন করার মাধ্যমে, আনুষ্ঠানিক এবাদত বন্দেগী ও জীবনের সকল কাজে আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা একইভাবে তাঁর প্রিয়পাত্র হতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ

الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ

أَحَقُّ أَنْ تَخْشٰهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ

وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ

لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ﴿٣٨﴾

৩৬. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যখন কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোনো মোমেন পুরুষ ও কোনো মোমেন নারীর তাদের সে ব্যাপারে নিজেদের কোনো রকম এখতিয়ার থাকবে না– (যে তারা তাতে কোনো রদবদল করবে); যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে, সে নিসন্দেহে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে; ৩৭. (হে নবী, তুমি স্মরণ করো), যখন তুমি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলছিলে– যার ওপর আল্লাহ তায়ালা বিরাট অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও (নিজের পুত্র বানিয়ে) যার ওপর অনুগ্রহ করেছো (তুমি তাকে বলেছিলে)– তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিয়ের বন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, (কিন্তু এ পর্যায়ে) তোমার মনের ভেতরে যে কথা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে আল্লাহ তায়ালা পরে তা প্রকাশ করে দিলেন, (আসলে তোমার পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে) তুমি মানুষদের (কথাকেই) ভয় করছিলে, অথচ (তুমি জানো) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার বেশী হকদার; অতপর (এক সময়) যখন যায়দ তার (স্ত্রীর) কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন শেষ করে (তাকে তালাক দিয়ে) দিলো, তখন আমি তোমার সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন করে দিলাম, যাতে করে (ভবিষ্যতে) মোমেনদের ওপর তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ের মাঝে (আর) কোনো সংকীর্ণতা (অবশিষ্ট) না থাকে, (বিশেষ করে) তারা যখন তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজন শেষ করে (তাদের তালাক দিয়ে) দেয়, (আর সর্বশেষে) আল্লাহ তায়ালার আদেশই কার্যকর হবে। ৩৮. আল্লাহ তায়ালা নবীর জন্যে যে ফয়সালা করে দিয়েছেন, সে (ব্যাপারে) নবীর ওপর কোনো বিধি নিষেধ নেই; আগের (নবীদের) ক্ষেত্রেও এ ছিলো আল্লাহ তায়ালার বিধান; আর আল্লাহ তায়ালার বিধান তো (আগে থেকেই) নির্ধারিত হয়ে আছে,

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٣٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤١﴾ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚۖ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾

৩৯. যারা (মানুষদের কাছে) আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌঁছে দিতো, তারা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করতো, তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকেই ভয় করতো না; (কেননা মানুষের) হিসাব নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। ৪০. হে মানুষ (তোমরা জেনে রেখো), মোহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে তো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার রসূল এবং নবীদের সিলমোহর (শেষনবী), আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে অবগত রয়েছেন।

রুকু ৬

৪১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করো, ৪২. এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমরা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো। ৪৩. তিনিই (মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি) তোমাদের ওপর অনুগ্রহ (বর্ষণ) করেন, তাঁর ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা চেয়ে তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন), যাতে করে (আল্লাহ) তোমাদের অন্ধকার থেকে (ইসলামের) আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মোমেনদের জন্যে পরম দয়ালু। ৪৪. যেদিন তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন মহান আল্লাহর দরবারে তাদের সালাম দ্বারা অভিবাদন করা হবে, তিনি তাদের জন্যে (এক) সম্মানজনক পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ৪৫. হে নবী, আমি তোমাকে (হেদায়াতের) সাক্ষী (বানিয়ে) পাঠিয়েছি, (তোমাকে) বানিয়েছি (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী, ৪৬. আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে তুমি হচ্ছো আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও (হেদায়াতের) এক সুস্পষ্ট প্রদীপ। ৪৭. (অতএব) তুমি মোমেনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক মহাঅনুগ্রহ রয়েছে।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

৪৮. কখনো কাফের ও মোনাফেকদের কথা শোনো না, তাদের যাবতীয় নির্যাতন উপেক্ষা করে চলো, আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করো; (কেননা) কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

তাফসীর

আয়াত ৩৬-৪৮

ইসলামী চিন্তাধারার ভিত্তিতে মুসলমানদের গড়ে তোলার জন্যে বর্তমান আলোচনাটি একটি নতুন অধ্যায় পেশ করেছে। বিশেষ করে মুখে বলা সম্পর্ক বা ধর্ম-আত্মীয়তার যে প্রচলন সে সমাজে বিদ্যমান ছিলো (এবং এখনও আছে,) যার কারণে ধর্মপুত্রকে আপন পুত্রের সমকক্ষ মনে করা হতো এবং আপন পুত্রবধূকে বিয়ে করার মতোই সে বিয়েকে সমাজে আপত্তিকর মনে করা হতো- সে প্রচলনকে ভুল প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে সূরাটির শুরুতেই এ আলোচনা এসেছে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা যায়েদের সাথে যায়নাবের বিয়ে, পরবর্তীতে তালাক, তালাকের গ্লানি দূর করার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করে এ ধরনের সম্পর্ক যে সত্যিকারে রক্তের সম্পর্ক হয়ে যায় না- একথাটাই প্রমাণ করেছেন। এতে দীর্ঘদিন ধরে যে কৃত্রিম পদ্ধতি আরব সমাজে প্রচলিত ছিলো তা যে শুধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় বা অন্য কারও মাধ্যমে এ পদ্ধতি উৎখাত করা সম্ভব ছিলো না, অন্য কোনোভাবে মানুষ এটা মেনেও নিতে পারতো না। এই জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজ নবীর মাধ্যমে এই ভুলের অপনোদন করতে চেয়েছিলেন। রসূলুল্লাহর প্রতি মুসলমানদের অবিচল বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ ও তাঁর চরিত্রবলের প্রতি সবার সুগভীর আস্থা এবং তাঁর আজীবন সত্যবাদিতার এক নযিরবিহীন ইতিহাস, সবকিছু মিলে তাঁর এ কাজ আপামর জনসাধরণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আল্লাহ তায়ালা জানতেন। এ জন্যে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর দ্বারাই এ পরিবর্তনটি সাধন করলেন। ফলে পরবর্তীতে এ ধরনের বিয়ে শাদীকে আর কোনো মুসলমানই আপত্তিকর মনে করেনি। কিন্তু এখনও যে সকল এলাকায় মোশরেকদের রসম রেওয়াজের প্রাধান্য চালু রয়েছে, সেসব এলাকায় এ কাজকে মানুষ যথেষ্ট ঘৃণার চোখে দেখে। ইসলাম মানুষকে প্রকৃতিসংগত ব্যবস্থা দিয়েছে। ইসলাম রক্তের সম্পর্কে যাদের সাথে বিয়ে শাদী হারাম বলে ঘোষণা করেছে- তারা হচ্ছেন এমন সব ব্যক্তি, যাদের সাথে প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সে ধরনের আকর্ষণ অনুভব করে না। কিন্তু এর বাইরে কৃত্রিমভাবে কোনো হারামের বলয় সৃষ্টি করা হলে সে বলয়ের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে (প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে) অনেক সময়েই সেখানে নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয় না, যার ফলে দুনিয়ায় বিভিন্ন সময়ে বহু অঘটন ঘটেছে, আল্লাহর ইচ্ছায় রসূলুল্লাহ (স.)-এর এ কাজকে মুসলমান সমাজ, যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সবই সন্তুষ্টচিত্তে ও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলো।

আল্লাহর ও রসূলের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কারোই মত খাটানো যায় না

এখানে কোরআনের আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলই হচ্ছেন সকল ফায়সালা দেয়ার মালিক। 'আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা দিয়ে দেন তখন সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার কোনো অধিকার কোনো মোমেন পুরুষ বা কোনো স্ত্রীলোকের নেই।' এ কথাটা এ জন্যেই উচ্চারিত হয়েছিলো যে, আলোচ্য

ফায়সালাটি দান করা হয়েছিলো আরবদের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে, যা পালন করা তাদের কাছে বড়োই কঠিন লাগছিলো।

'যখন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে কোনো ফায়সালা দান করেন, সেই বিষয়ে এখতিয়ার খাটানোর কোনো অধিকার কোনো মোমেন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করাকে অস্বীকার করবে, অবশ্যই সে সুস্পষ্ট ভুলপথে ধাবিত হবে।'

বর্ণিত আছে যে, যায়নাব বিনতে জাহশ (রা.) সম্পর্কেই ওপরের আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিলো। জাহেলী জমানা থেকে চলে আসা মুসলমানদের মধ্যে বংশ গরিমার বদ্ধমূল ভুল ধারণা নবী (স.) ভেংগে দিতে চেয়েছিলেন ইসলাম ঘোষণা দিলো যে, তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ছাড়া একের ওপর অন্যের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা(১) হচ্ছে তারা, যারা বন্দীদশা বা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে এরা সমাজে মনিবদের শ্রেণী থেকে কম সম্মানিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতো। এমনই এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো রসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে যায়েদ ইবনে হারেসার। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ (স.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত এক দাস। তাকে রসূলুল্লাহ (স.) আপন পালক ছেলে বানিয়ে নিয়েছিলেন। অতপর যে কোনো একজন স্বাধীন মানুষের পূর্ণ ও সমমর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (স.) তার নিকটাত্মীয় বনু হাশেম গোত্রের যায়নাব বিনতে জাহশ-এর সাথে তার বিয়ে দেন, যাতে করে শ্রেণীগত ভেদাভেদ চিরদিনের জন্যে ও পরিপূর্ণভাবে দূরীভূত হয় এবং এ জন্যে তাঁর পরিবারের মধ্য থেকেই তিনি এ পার্থক্য দূর করার উদ্যোগ শুরু করেন। আসলে সে সময়ে শ্রেণীবৈষম্যের শেকড় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত ছিলো, যা নবী (স.)-এর বাস্তব পদক্ষেপ ছাড়া দূর হওয়া সম্ভব ছিলো না। এই ঘটনার ফলে গোটা মুসলিম জামায়াত এ নতুন আদর্শ গ্রহণ করে এবং সমগ্র মানবমন্ডলী পুরাতন সম্পর্ককে অসার মনে করতে থাকে।

ইবনে কাসীর তাঁর রচিত তাফসীরে বর্ণনা করেন, আওফী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার শানে নুযুল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান যে, রসূলাল্লাহ (স.) তাঁর খাদেম যায়েদ ইবনে হারেসার বিয়ে পড়ানোর জন্যে রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে চিন্তা করলেন, বনু আসাদ গোত্রের জাহশ এর কন্যা যায়নাবের সাথে একটু কথা বলা যাক। তিনি তার কাছে গেলেন এবং তার সামনে যায়েদ (রা.) সাথে তার বিয়ের কথা পাড়লেন। যায়নাব বললেন, 'না, আমি তাকে বিয়ে করতে রাযী নই।' তখন রসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে একটু হুকুমের সুরে বললেন, অবশ্যই তাকে তুমি বিয়ে করবে। যায়নাব বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার ব্যাপারে আপনি কি এই নির্দেশ দিচ্ছেন?' তাঁরা দুজন যখন কথাবার্তা বলছিলেন সে সময়ে এই আয়াতটি রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর নাযিল হল, 'যখন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে কোনো ফায়সালা দান করেন তখন সেই ব্যাপারে মোমেন কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোকের এখতিয়ার খাটানোর কোনো অধিকার থাকে না।' এ আয়াতটি শোনার সাথে সাথে যায়নাব (রা.) বললেন, 'আমি কি এই বিয়ের ব্যাপারে আমার সম্মতির কথা জানাবো?' রসূলুল্লাহ

(১) এখানে উপরোক্ত শ্রেণী ছাড়া অন্যদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে। আসলে পুরাকালে অনেক সময়ে দেখা যেতো এক কাবীলা আর এক কাবীলার মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের মুক্তি, রক্তপণ ও কোনো কিছু বিনিময় দান করার ব্যাপারে সাহায্য করতো। এ সাহায্য করার অর্থ দাসত্ব মুক্তি ছাড়া আরও অন্য কিছু ছিলো, যার দ্বারা তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হতো।

(স.) বললেন, হ্যাঁ। যায়নাব বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবো না। এ প্রস্তাব আমি কবুল করলাম।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আর একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন, 'রসূলুল্লাহ (স.) যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে যায়নাবের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু যায়নাব তার প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখালেন ও বললেন, 'আত্মমর্যাদার দিক দিয়ে আমি ওর থেকে উত্তম'। অবশ্য এটা সত্য কথা যে, যায়নাব আসলেই ছিলেন উত্তম, তিনি কারো সাথে তেমন মেলামেশা করতেন না, বরং একাকী থাকতেই ভালোবাসতেন। তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতটি নাযিল করলেন। এমনি করে মোজাহেদ, কাতাদা ও মোকাতেল ইবনে হায়্যান বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন এ আয়াতটি যায়নাব বিনতে জাহশ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। তিনি রাজি হননি, কিন্তু পরে রাজি হয়েছিলেন।

ইবনে কাসীর আর একটি রেওয়ায়াতে এইভাবে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, এ আয়াতটি উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবা ইবনে আবী মুঈত (রা.) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি মহিলাদের মধ্যে প্রথম হিজরত করেন। অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাতে কোনো মোহরের দাবী ছাড়াই নিজেকে সোপর্দ করেন। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমি কবুল করলাম।

এরপর যায়নাব-এর সাথে রসূলুল্লাহ (স.) যায়েদ ইবনে হারেসার বিয়ে দেন। এতে তিনি ও তাঁর ভাই অসন্তুষ্ট হলেন ও বললেন, 'আমরা তো চেয়েছিলোম, রসূলুল্লাহ (স.) নিজেই বিয়ে করবেন; কিন্তু তিনি তাঁর একজন দাসের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।' রেওয়ায়াতে কারী আব্দুর রহমান বলেন, এই ঘটনার পরই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এই বর্ণনাকারী আরও বলেন, এর থেকে আরও ব্যাপক অর্থের আয়াত নাযিল হলো, 'নবী মোমেনদের কাছে তাদের নিজেদের জীবন থেকেও বেশী প্রিয়।' তিনি বলেন, প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো খাস যায়নাব-এর সম্পর্কে এবং শেষের আয়াতটি নাযিল হয়েছে সকল মুসলমানদের জন্যে।

তৃতীয় আর একটি রেওয়াতে ইমাম আহমাদ বলেন, 'আমাদেরকে আব্দুর রাযযাক একটি হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, নবী (স.) যায়েদের সাথে জুলাইবীব নামক আনসারের একটি মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্যে তার বাপের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। সে ব্যক্তি বলল, আমি তার মায়ের সাথে পরামর্শ না করে বলতে পারছি না। নবী (স.) বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, শুনে দেখো।' তারপর লোকটি তার বিবির কাছে গিয়ে কথাটি পাড়লো। শুনেই সেই মহিলাটি বলে উঠলো, না না এ হতে পারে না। এ দাসটির সাথে বিয়ে দেয়ার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.) জুলাইবীব ছাড়া আর কোনো মেয়ে পেলেন না। আমরা অমুক অমুক-এর কাছ থেকে আসা মূল্যবান প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছি।' এ সময়ে জুলাইবীব নামের সে মেয়েটি আড়াল থেকে এ সব কথাবার্তা শুনছিলো। সে লোকটি (মেয়েটির বাপ) যখন রসূলুল্লাহ (স.)-কে এই না সূচক খবরটি পৌঁছানোর জন্যে রওয়ানা হলো, অমনি মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা কি রসূলুল্লাহ (স.)-এর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করতে চান? তিনি যদি আপনাদের জন্যে তাকে (যায়েদকে) এ প্রস্তাবে রাযি করিয়েছেন বলে আপনারা জেনে থাকেন তাহলে (বিনা দ্বিধায়) তার সাথে আমার এ বিয়ে পড়িয়ে দিন।' বর্ণনাকারী আনাস (রা.) বলেন, তাকে যেন তার পিতামাতা থেকে অনেক বেশী বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী বলে মনে হলো। এ কথা শুনে তার বাপ-মা বলে উঠলেন, 'সত্যই বলেছো তুমি', তারপর তার মাতাপিতা রসূলুল্লাহ

(স.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনি এ বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকলে আমরাও সন্তুষ্ট আছি। রসূলুল্লাহ (স.)-এর মতের গুরুত্ব একটি মুসলিম মেয়ের অন্তরে কতো অধিক; তা লক্ষণীয় যখন আল্লাহর রসূল কথা বলেছেন, তখন আর নিজের কোনো মত নেই, থাকতে পারে না। এই কথাটিই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে কোনো ফায়সালা এসে যাওয়ার পর সেই বিষয়ে পুনরায় চিন্তা ভাবনা করার কোনো এখতিয়ার কোনো মুসলিম পুরুষ বা স্ত্রীলোকের থাকতে পারে না।'

এর নামই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের কাছে আত্মসমর্পণ।

এসময় রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হ্যাঁ আমি তার জন্যে এ বিয়েকে মনযুর করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স.) সে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এক সময়ে মদীনায় প্রচন্ড ভয় ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হলো। তখন জুলাইবীব উটে চড়ে স্বামীর সন্ধানে রওয়ানা হয়ে অকুস্থলে পৌঁছুলেন এবং দেখলেন স্বামী (যায়েদ) শহীদ হয়েছেন। দেখলেন তার (নিহত স্বামীর) চতুর্দিকে মোশরেকদের বেশ কিছু মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, যাদেরকে তিনি হত্যা করেছেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি তাকে (মেয়েটিকে) দেখেছি, তিনি মদীনায় সব থেকে বেশী দানশীলা ছিলেন। (এটা যায়নাবের সাথে যায়েদের বিয়ে ভেংগে যাবার পরের কথা)

এখানে তৃতীয় রেওয়াতেটিকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, সেই রেওয়ায়েতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জুলাইবীবের ঘটনাটিও এই প্রসংগে বর্ণিত সেই প্রথার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এই প্রথাকে রহিত করাই ছিলো ইসলামের লক্ষ্য। রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কাজ এবং রেসালাতের যিন্দেগীতে তাঁর প্রবর্তিত নিয়মের মাধ্যমেই তাকে রহিত করতে চেয়েছিলেন। ইসলামী দেশ ও পরিবেশে রসূলুল্লাহ (স.) যে নতুনত্ব আনতে চেয়েছিলেন এ প্রথার পরিবর্তন ছিলো তারই অংশ। ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (স.) যে স্বাধীন ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন তার জন্যে এ কৃত্রিম, প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও অবাস্তব রীতির উৎখাত সাধন প্রয়োজন ছিলো। ইসলাম চায় সেই প্রাণবন্তু সমাজ কায়েম করতো,যা মানুষের স্বভাবসংগত মনে করে গ্রহণ করে।

সাহাবারা যেভাবে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন

আয়াতটি বিশেষ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হলেও এর হুকুম কিন্তু সর্বসাধারণ মুসলমানদের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। আল কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রথা রহিত করা সত্তেও মুখে বলা সম্পর্ক, ধর্ম ছেলে মেয়ে বা পালক সন্তানের প্রথা পরবর্তি সকল সমাজে কিছু না কিছু রয়েই গেছে। পালক ছেলের তালাকপ্রাপ্তা বিবিকে বিয়ে করা হালাল হওয়ার হুকুম হওয়া নাযিল হওয়া এবং রসূলুল্লাহ (স.) নিজে যায়েদ নামের পালক ছেলের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যায়নাবকে বিয়ে করে নযির স্থাপন করা সত্তেও এ প্রথা সমাজ থেকে একেবারে দূরীভূত হয়ে যায়নি। অবশ্য এটা ঠিক যে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর যায়নাবকে বিয়ে করার এ ঘটনাটি চিরদিনই মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছে। পালক ছেলে ও ছেলে বউ মনে করে মুসলমানরা পূর্বের মতো বেপরওয়াভাবে তাদের সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত থেকেছে। এরপর থেকে মুসলিম সমাজের সবাই একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্যেই এ ঘটনাটি খাস ছিলো না, বরং ইসালামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই সাধারণভাবে এ ঘটনাটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তারা একথাও বুঝেছে যে, রসূলুল্লাহ-এর জীবনে এ ঘটনাটি ঘটিয়ে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন মুসলমান জনসাধারণ এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিক। যেমন বলা হয়েছে,

'অবশ্যই তোমাদের জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের মধ্যে এক উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে। (আয়াত-২১)

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে হোক অথবা যায়নাবকে রসূলুল্লাহ (স.) বিয়ে করার কারণেই হোক, মুসলমানদের সমাজ থেকে এ প্রথাকে তুলে দেয়াই ছিলো এ আয়াতটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। একারণেই পরবর্তীকালে এ আয়াতের প্রভাবে সাধারণ মুসলমানরা সঠিক শিক্ষাই গ্রহণ করতে পেরেছে এবং এই কৃত্রিম প্রথাকে আর কোনোদিন তারা চালু হতে দেয়নি, যদিও প্রথম প্রথম রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় এ প্রথা রহিত করা নিয়ে বেশ কিছু চেঁচামেচি হয়েছে এবং ইসলামের দুশমনরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে নানা কথা বলে দোষারোপ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি এবং আজও তারা একইভাবে দোষারোপ করে চলেছে। শুধু তাই নয়, আজও মুসলমানদের দুশমনরা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের কথা বলার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে যেসব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আলোচ্য ঘটনাটি চিরদিনের জন্যে নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে এক অত্যুজ্জ্বল নযির হয়ে রয়েছে। প্রথম যুগের মুসলমানরা এ বিষয়টিকে তাদের আকীদা বিশ্বাসের এক অপরিহার্য অংগ হিসাবে গ্রহণ করেছে, এ ঘটনার অবতারণায় তাদের মন নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। সঠিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে তারা এ আয়াতটিকে যথেষ্ট বলে মেনে নিয়েছে .... এ ঘটনা তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, আসলে তাদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই এবং কোনো বিষয়েই তারা নিজেরা কোনো ফায়সালা করতে পারে না। তারা ও তাদের অধীনস্থ যারা আছে তাদের সবার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনিই তাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে পরিচালনা করেন এবং তাদের জন্যে তিনি তাই পছন্দ করেন যা তিনি চান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি জগতকে যে নিয়মে সৃষ্টি করেছেন তারা সবাই তারই অধীনে পরিচালিত হতে বাধ্য। তারা তো সৃষ্টি মাত্র এবং একমাত্র তিনিই এ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, তিনিই সবার পরিচালক। অন্যান্য সবাইকে যে প্রক্রিয়ায় তিনি সঞ্চালন করেন ওদেরকেও সেই একই নিয়মে সঞ্চালন করেন। এ বিশাল সৃষ্টিজগতের দৃশ্যপটে তাদের ভূমিকাকে তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই মহাবিশ্বের বুকে তাদের কি দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন, তা তিনিই স্থির করে দিয়েছেন। সৃষ্টির-বুকে তাদের কি ভূমিকা রাখতে হবে, মানুষ নিজেরা তা স্থির করে নিতে পারে না, কারণ, তারা এ বিশাল জগতকে দেখেও না জানেও না। এ জন্যে কোথায় এবং কোন প্রয়োজনে তাদের কি ভূমিকা রাখতে হবে তা বুঝা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। এটাও সত্য কথা, তাদের পছন্দমতো কোনো কাজ করা বা তাদের জন্যে কল্যাণকর কোনো পথ বের করে নেয়ার এখতিয়ার বা ক্ষমতা তাদের নেই। সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তা জানেন এবং সেই কাজের জন্যে তিনিই তাদেরকে পরিচালনা করেন। এ বিশ্বে তাদের নিজেদেরকে নিজেদের নায়ক বানিয়ে দেয়া হয়নি, এ জন্যে তারা নিজেরা যা পছন্দ করে তা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে এবং কোনো কিছুকেই তাদের ইচ্ছামতো কোনো বিশেষ পরিণতিতে পৌঁছে দেয়ার ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়নি।

এইভাবে তাদের জীবনকে তারা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করেছে, সমর্পণ করেছে তাদের জীবনের সমস্ত বিষয়কে। একবার আত্মসমর্পণ করার পর তারা আর কখনও আল্লাহর নাফরমানী করেনি এবং নিজেদের ইচ্ছামতো চলার চিন্তা করেনি। তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত

সকল নিয়মের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং এইভাবে দুনিয়ার বুকে তারা নিজেদের সঠিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

তারা তাদের জীবনের আকাশেও সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলেছে– যেমন করে, গ্রহ নক্ষত্র তাদের নিজ নিজ কক্ষ পথে চলে। তাদের এ সব পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই, নেই তাদের চলার গতিকে দ্রুততর বা মন্থর করার কোনো এখতিয়ার, তারা সদা সর্বদা সৃষ্টিকর্তার হুকুমে অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তাল মিলিয়ে চলে।

মুসলমানরা যখন আল্লাহর বিধানকে পুরাপুরি মেনে নেয় এবং কোনো ব্যাপারেই নিজেদের ইচ্ছা খাটায় না তখন তারা এভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে নিজেদেরকে একাত্ম করে ফেলে। অন্তরের গভীরে, চিন্তা-চেতনায়, অনুভূতিতে ও সকল কাজে কর্মে আল্লাহ তায়ালার মর্জির কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে। এভাবেই তারা জেনে বুঝে সজ্ঞানে সচেতনভাবে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। তারা পরিপূর্ণ আস্থা ও নিশ্চিন্ততা সহকারে আনন্দ ও তৃপ্তির সাথে আল্লাহর বিধানের কাছে মাথা নত করে পরম শান্তির অধিকারী হয়।

অতপর দেখা গেছে, তারা ধীরে ধীরে এমনভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে নিয়েছে যে, তাঁর পথে টিকে থাকতে গিয়ে এবং তাঁর হুকুম পালন করতে গিয়ে যখন কোনো বিপদ মুসিবত এসেছে তখন তারা নিশ্চিন্ত মনে ও পরম দৃঢ়তা সহকারে সে পথে টিকে থেকেছে। কোনো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তারা নতি স্বীকার করেনি, তারা সকল বাধা-বিঘ্ন, দুঃখ-বেদনা ও সকল প্রকার বিপদ-আপদের ঝড় তুফানকে জয় করেছে। তারা জেনে বুঝে ও সম্পূর্ণ সচেতনভাবে আল্লাহর নির্ধারিত সকল পরিণতিকে মেনে নিয়েছে। তাদের হৃদয়ের গভীরে ও অনুভূতির সকল পর্যায়ে এবং বিবেকের মধ্যে তারা সজ্ঞানে আল্লাহ তায়ালার দেয়া সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং কোনো বিপদ আপদ বা দুর্ঘটনায় তারা মোটেই বিচলিত বোধ করেনি, অস্থিরও হয়ে যায়নি অথবা কোনো আকস্মিক বিপদকে অনির্বচনীয় বা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাও মনে করেননি।

এই কারণে তারা নিজেদের অবস্থান থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। এ দুনিয়ায় তাদের সঠিক ভূমিকা রাখার প্রশ্নে তারা ব্যস্তও হয়ে পড়েননি বরং তারা নিজেদের মালিকের ইচ্ছার কাছেই তাঁর ইচ্ছা ও ফায়সালাকে পূরণ করার জন্যে বদ্ধপরিকর থেকেছেন।

এইভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করার পর আর কখনও তারা সে অবস্থান থেকে ফিরে আসেননি। অথচ প্রকৃতিগতভাবে তাদেরও তো কিছু স্বাধীন ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর ফায়সালা বাস্তবায়নে কখনও বিলম্বিত করেননি, যদিও তাদের সেই ইচ্ছা তাদের দাবী পূরণ ও নিজেদের জীবনকে নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হতে চাইতো। সর্বান্তঃকরণে তারা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে এবং তাঁর মেহেরবানীপূর্ণ ফায়সালা বা তকদীরের কাছে নিজেদেরকে সোপর্দ করে তাঁরই পথে চলাকে নিজেদের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলেন, যেখানে তাদের থেমে যাওয়াকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেছেন, সেখানেই তারা থেমে গিয়েছেন, যেখানে তাঁদের চলাকে মহান রাব্বুল আলামীন পছন্দ করেছেন, তারা নির্দিধায় ও পরম খুশী মনে সেই দিকেই চলেছেন। তারা কোনো ব্যস্ততা না দেখিয়ে ও মনকে কোনোভাবে সংকীর্ণ না করে তাদের জীবন-যৌবন, ধন সম্পদ ও তাঁদের সকল স্বাধীন ইচ্ছা ও রুচিকে আল্লাহর রেযামন্দি হাসিল করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছেন। এ ব্যাপারে তারা কারো ওপর এহসান প্রদর্শন করেননি বা কোনো অহংকারও দেখাননি। মেহেরবান

মালিকের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে ঠকেছেন মনে করে কখনও আক্ষেপ করেননি বা কোনো দিন আফসোসও করেননি। সদা-সর্বদা তারা দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছেন যে তারা তাই করছেন যা আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের ভাগ্যে পূর্ব থেকেই লিখে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা যা চান তাকে তো হতেই হবে। কারণ প্রত্যেকটি কাজ তার নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব থেকেই সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ কখন কোথায় কি কি কাজ হবে তা অনেক আগেই আল্লাহর ইচ্ছাতে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, নির্ধারিত হয়ে রয়েছে কোনো নিয়মে কোনো কাজ চলবে-তাও।

এইটিই হচ্ছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, অর্থাৎ তারা মেনে নিয়েছে যে তাদের পা কোন দিকে ফেলতে হবে তা তো আল্লাহরই হাতে, তিনিই তাদের গতিবিধির পরিচালক, যে হাত তাদেরকে পরিচালনা করছে সেই হাতের কাছে নিজেদেরকে সোপর্দ করে তারা পরম পরিতৃপ্ত। এই তৃপ্তির পেছনে তাদের সঠিক বুঝশক্তি নিরাপত্তাবোধ, গভীর আস্থা ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। এই জন্যেই তারা সুপ্রশস্ত মন নিয়ে, সহজে ও গভীর আবেগ ভরে সেই পথে চলতে পেরেছেন।

তাঁরা এসব আনুগত্যসহ যথাসাধ্য আল্লাহর হুকুম পালন করে চলেছেন। যে সব বিষয় সম্পদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে সেগুলো থেকে তারা যথাসম্ভব খরচ করেন, কখনও অপচয় করেন না বা তাদের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থও হন না। এ ব্যাপারে কোনো মাধ্যমকে কাজে লাগাতে তারা দ্বিধা বোধ করেন না। এরপর এটা আশা করা যায় না যে, তাদের সাধ্যের বাইরে তাদেরকে কোনো কষ্ট দেয়া হবে, আশা করা যায় যে, তাদের মানবতা ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে কখনও তাদের বিচ্যুত করা হবে না। তাদের দুর্বলতা ও শক্তি কোনোটা থেকেও তারা মুক্ত হবেন না। তাদের চেতনা ও শক্তি সামর্থ্যের যে কমতি তাদের মধ্যে রয়েছে সে বিষয়ে তাদেরকে ডেকে এমন কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে না, যা তারা করতে পারেননি। সেসব বিষয়ে তাদের আবার দুনিয়ার বুকে প্রশংসা করা হোক-এটাও তারা চান না এবং তারা এমন কথা বলেন না– যা তারা করেন না।

এইভাবে তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে তকদীর নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তাদের শক্তিসামর্থ অনুযায়ী প্রচেষ্টা তারা অব্যাহত রাখেন। প্রথম যুগের ইসলামী জামায়াতের মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত সুসামঞ্জস্যভাবে এই গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিলো, যার কারণে তারা এই আকীদা বিশ্বাসের পাহাড়সম বিরাট আমানতের বোঝা বহন করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রথম যুগে আল্লাহর সেসব নেক বান্দাদের কৃতিত্বসমূহ এমনভাবে সমসাময়িক লোকদের হৃদয়ের মধ্যে রেখাপাত করেছিলো যে, তার ফলে তারা এ মহান গুণে গুণান্বিত একটি জামায়াত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং পৃথিবীর সামনে তা ছিলো একটি অলৌকিক দৃষ্টান্ত। এ জীবনাদর্শ বিশ্বব্যাপী এক সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছিলো, মানুষকে এমন আচরণ শিখিয়েছিলো যা সহজে মুছে ফেলার মতো নয়। এটা ছিলো সাহাবায়ে কেরামের সংগ্রাম ও ত্যাগের ফল, কিন্তু মানুষ তার মাধুর্য স্বল্পকালের জন্যেই ভোগ করতে পেরেছে।

এরপর মানুষের অন্তরের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, অন্যদের সংস্পর্শে এসে তাদের আচার ব্যবহার অনেকাংশে বিগড়ে গেছে। তারা পূর্বের মতো তাদের একতা, সততা, সত্যবাদিতা, সত্যনিষ্ঠা ও আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের গুণাবলী ধরে রাখতে পারেনি। আরব জাহেলিয়াতের মধ্য থেকে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহচর্যের কারণে এককালে যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে চারিত্রিক মহাবিপ্লব এসেছিলো, তা আর এই মানুষরা দেখাতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে তা আগে সম্ভব হয়েছিলো আল্লাহরই সরাসরি ইচ্ছা ও মদদের ফলেই। ভবিষ্যতে সে

গুণাবলী আবার যদি কোথাও পূর্ণতা লাভ করে, তা করবে সেই মহান সত্তার সরাসরি ইচ্ছায়, যিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের পদক্ষেপ ও বিশ্বভূবনে তাদের প্রকৃত ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবেন।

আল কোরআনের বহু আয়াত এই সত্যের দিকে ইংগিত করেছে, যেখানে আল্লাহ তাবারক ওয়া তায়ালা বলছেন, 'তুমি যাকে চাইবে তাকে তুমি হেদায়াত করতে পারবে না, বরং আল্লাহ তায়ালা যাকে চাইবেন তাকে তিনি হেদায়াত করবেন ..... অথবা বলছেন, 'ওদের হেদায়াতের দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি, বরং আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করবেন।' অথবা বলছেন, 'আল্লাহর হেদায়াতই হচ্ছে আসল হেদায়াত।'

মহাসত্যের সন্ধান এবং হেদায়াতের ব্যাপক অর্থ বলতে গেলে ওপরের এই কথাটিই এখানে প্রযোজ্য। এই বিশাল সৃষ্টির বুকে মানুষকে পথ দেখানোর ক্ষমতা আর কারও নেই, থাকতে পারে না। কেউ জানে না, কোন পথে পা বাড়ালে তার সার্বিক সাফল্য আসবে। এক মহান সত্ত্বা রয়েছেন, অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করে তাই তার কাছেই হেদায়াত চাইতে হবে। যতোদিন সৃষ্টিজগত টিকে আছে ততোদিন এই প্রক্রিয়াতেই মানুষ সাফল্য লাভ করার আশা করতে পারবে। মহান আল্লাহ থেকে বেপরওয়া হয়ে মানুষ যখন নিজেদের কল্যাণের পথ নিজেরাই রচনা করে নিতে চেয়েছে, তখনই তারা পদে পদে ঠোকর খেয়েছে এবং কল্যাণের পরিবর্তে তাদের জীবনে সবদিক থেকে অশান্তি ও সর্বনাশা পরিণতি নেমে এসেছে!

কোনো ব্যক্তির চূড়ান্ত প্রচেষ্টায়ই পরিপূর্ণ সাফল্যের মনযিলে উপনীত হতে পারে না, যতোক্ষণ না তার অন্তর আল্লাহর হেদায়াতের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়। ব্যক্তির সকল তৎপরতা তখনই সঠিকভাবে দৃঢ়তা লাভ করতে পারে, মানব প্রকৃতি তখনই প্রকৃত স্বস্তি লাভ করতে পারে, যখন সে এ বিশ্ব প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত তকদির ও তার মর্জির ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহর ইচ্ছাশক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। কোরআনে হাকীমের এ সুস্পষ্ট বর্ণনা লক্ষণীয়,

'কোনো মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের কোনো নির্দেশ প্রদানের পর তা অমান্য করার কোনো এখতিয়ার নেই, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।' (আয়াত ৩৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অবাধ্য ও নাফরমানরা সত্যপথ ও হেদায়াত থেকে অনেক দূর-দূরান্তে অবস্থান করে। আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের নির্দেশ যে কোনো ব্যাপারেই হোক না কেনো? (এমনকি তা যদি যয়নব এর সাথে রাসূলের বিয়ের নির্দেশের ব্যাপারও হয় তবুও) তা অমান্য করা যাবে না। তাই উল্লেখিত আয়াত নাযিলের পর যয়নব এবং তার ভাই রসূলের পালকপুত্র যায়েদের তালাকের পর রসূলের সাথে বিয়েতে অসম্মত হননি।

এ ঘটনা প্রসংগেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াত দ্বারা ইসলামের এ চিরন্তন মূলনীতি স্ব- প্রমাণিত হয় যে, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূল প্রদত্ত নির্দেশকে অমান্য করা যায় না। ইসলামী জীবন পদ্ধতির এ হচ্ছে চিরন্তন শাশ্বত বিধান। এ প্রসংগে যায়দ ইবনে হারেসের স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহশের কথা উল্লেখিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে তার উল্লেখ রয়েছে। আয়াত নাযিল হওয়ার পর যয়নব ও তার ভাই তাদের আপত্তিকে পরিহার করে এ বিয়েতে স্বতস্ফূর্তভাবে সম্মতি প্রদান করেন। এসব ঘটনা, এর বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

দত্তক প্রথার মূল উৎপাটন

'যে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন, আর তুমিও যার ওপর অনুকম্পা প্রদান করেছো............. আর আল্লাহ তায়ালা সব ব্যাপারেই সম্যকভাবে জ্ঞাত।' (আয়াত ৩৮)

পূর্ববর্তী সূরায় পোষ্যপুত্রকে স্বীয় পুত্ররূপে সম্বোধন করা ও তাকে নিজ বংশের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত সামাজিক পদ্ধতিকে সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের বংশধারা ও পরিচিতি এখন থেকে তাদের প্রকৃত জন্মদাতা পিতার সাথেই সম্পৃক্ত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তাদের পারিবারিক সম্পকর্কে প্রকৃতিগত মূল সূত্রের সাথে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কোরআনে হাকীমে এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের মুখবলা ডাকা সন্তান (পোষ্যপুত্ররা) প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সন্তান নয়। .... তোমরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যা করো তাতে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।'

তদানীন্তন আরবদের জীবনে পোষ্যপুত্র প্রথা ঐতিহ্যগতভাবেই সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো। এ ছিলো আবহমান কাল থেকে এক স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত প্রথা। সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত এ পদ্ধতিকে বিলুপ্ত করা কোনো সহজ কথা ছিলো না। এ প্রথাকে রাতারাতি পরিবর্তন সাধন করাও সহজ ছিলো না। কেননা এ প্রথা সমাজে গভীরভাবে শেকড় গেড়ে বসেছিলো। এ পুরাতন প্রথা সমাজের জন্যে অবশ্যই ক্ষতিকর ছিলো। এ প্রাচীন ও ব্যাপক প্রচলিত প্রথার মোকাবেলা করা ও এটিকে অস্বীকার করা মূলত খুবই কঠিন ব্যাপার ছিলো। কারণ সমাজের বিপুলসংখ্যক লোকের কাছে এটিই ছিলো গ্রহণযোগ্য একটি সাধারণ ঘটনা।

এর আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল নিজেই যায়েদ ইবনে হারেসাকে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাকে যায়েদ ইবনে মোহাম্মদ নামেই ডাকা হতো। এ পরিচয়েই সমাজে তার পরিচিতি হয়ে গিয়েছিলো। একারণেই রসূলুল্লাহ (স.) স্ব-গোত্রীয় ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহশকে যায়েদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিয়ে ছিলো আরবদের বংশ অহংকার, গোত্রীয় ভেদাভেদ ও বিদ্বেষকে দূরীভূত করার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যায়দ ক্রীতদাস হওয়ার কারণে এ অসম গোত্রীয় দাম্পত্য বন্ধন ছিলো আরবদের মাঝে আল কোরআনের সাম্যের ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার পথে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বাধিক সম্মানিত যারা তাকওয়ার গুণে ভূষিত।'

এ দাম্পত্য বন্ধনের মাধ্যমে ইসলামের সাম্য ব্যবস্থা ও গোত্রীয় ভেদাভেদ বিলুপ্ত করার বাস্তব ও বৈপ্লবিক নীতির বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছিলো। যায়েদের স্ত্রী যয়নবকে যায়েদের দাম্পত্য বন্ধন থেকে মুক্ত করে আল্লাহরই নির্দেশে স্বয়ং নবী করীম (স.) কর্তৃক বিয়ে করার মাধ্যমে ভ্রান্ত প্রথা ও কুসংস্কার থেকে সমাজকে চিরতরে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আবহমান কাল থেকে সমাজে প্রচলিত এই প্রথাটির বিলুপ্তির ব্যাপারটি ছিলো সত্যিই এক বিস্ময়কর ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা বিশেষ ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে যায়েদ ইবন হারেসা কর্তৃক যয়নাবকে তালাক প্রদান, যায়েদের সাথে যয়নাবের অশান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন, যয়নাবের সাথে যায়েদের দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখার ব্যাপারে অক্ষমতার ব্যাপারগুলো আগে ভাগেই জানিয়ে দিয়েছেন। এমনকি যায়েদের তালাক প্রদানের পর শরীয়াতের নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহর রসূল কর্তৃক যয়নাবের বিয়ে সম্পাদনের ব্যাপার এবং সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এ বৈপ্লবিক পদক্ষেপের কল্যাণকারিতা ও কৌশলগত দিক সম্পর্কেও আল্লাহ তায়ালা তাকে ওহী

মারফত অবগত করিয়েছেন। যায়েদ ও যয়নাবের অস্থিতিশীল দাম্পত্য সম্পর্ক আর বেশীদিন যে অব্যাহত থাকার নয়– এ পরিস্থিতি তিনি ওহীর মাধ্যমেই অবগত হয়েছিলেন।

যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) যয়নাবের সাথে তার দাম্পত্য সম্পকের্র তিক্ততা, অস্বস্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন ও তাদের দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখার ব্যাপারে বারবার নিজের অক্ষমতার অভিযোগ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে উত্থাপন করেন। আল্লাহর রাসূল (স.) নির্ভীক চিত্তে তার সাথীর দৃষ্টিভংগীর মোকাবেলা করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু মনে মনে আল্লাহর ওহীর এ নির্দেশকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমাজের আবহমানকালের এ প্রথার বিলুপ্তি এবং সমাজের অন্ধ কুসংস্কার বর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিলো। তাই যায়েদের উত্থাপিত অভিযোগের ব্যাপারে তিনি যায়েদকে সান্ত্বনা ও উপদেশ প্রদান করেন। আল্লাহ তায়ালা যায়েদের প্রতি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ, রসূলের নৈকট্য লাভ, তার প্রতি রসূল (স.) -এর অগাধ স্নেহ মমতা ও মোহব্বতের কথা তাকে মনে করিয়ে দেন, তার প্রতি সমধিক ভালোবাসা সর্বোপরি তাকে ক্রীতদাসত্বের শৃংখলমুক্ত করে স্বাধীন মানুষ এবং তাকে নবী পরিবারের সদস্যরূপে গ্রহণের মর্যাদা প্রদানের অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রসূল তাকে বললেন,

'তুমি তোমার দাম্পত্য বন্ধনকে অটুট রাখো, আর আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো।'

এখানে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে সামাজিক কুসংস্কারের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে তার অন্তরের ইতস্তভাবের প্রতি ইংগিত প্রদান করেছেন,

'তুমি মনের এমন কোনো বিষয়কে গোপন করে রেখেছিলে, যা আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করে দেবেন। তুমি লোকনিন্দার ভয় করেছিলে, অথচ আল্লাহ তায়ালাকেই অধিকতর ভয় করা দরকার।'

আয়াতে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, লোক নিন্দার আশংকায় পরবর্তী পর্যায়ে ওহীর নির্দেশক্রমে যায়েদ কর্তৃক যয়নাবকে তালাক প্রদানের পর আল্লাহর রসূল তাকে বিয়ে করবেন, এ ব্যাপারটি গোপন রেখে আল্লাহর রসূল যায়েদকে যয়নাবের সাথে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখার পরামর্শ প্রদান করেছিলেন। অথচ তাঁর এটা জানা ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশ করে দেবেন। যদিও প্রকাশ্য নির্দেশ ছিলো না, তবুও আল্লাহ তায়ালা এলহামের মাধ্যমে যায়েদের তালাক প্রদান, অতপর যয়নাবের সাথে রসূলের বিয়ের নির্দেশ যে আল্লাহর রসূল কর্তৃক কার্যকর করা হবে– তাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। অদূর ভবিষ্যতে এ সবই পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে, কোনো তাড়াহুড়া ছাড়া তা ধীরে সুস্থেই কার্যকর হবে, এ সবই রসূলের জানা ছিলো। সমাজের এ চিরাচরিত পন্থার অবসান ঘটিয়ে এ বিয়ের পর যে হৈ, চৈ ও লোক নিন্দার যে আশংকা রসূল করেছেন, তা সবই ছিলো ঠিক।

আল্লাহ তায়ালা যখন ঘটনা পরম্পরার রসূলকে যয়নাবের সাথে দাম্পত্য বন্ধন সৃষ্টির নির্দেশ প্রদান করলেন, তখন যায়েদের তালাক প্রদানের পরই চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর রসূল যয়নাবকে বিয়ে করলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ও যয়নাব কেউ কোনো ইতস্ততায় নিমজ্জিত হননি। তারা এমন দুশ্চিন্তায়ও পতিত হননি যে, সমাজের আবহমানকাল থেকে প্রচলিত এ কুসংস্কারকে বর্জনের পর পরিস্থিতি কী হবে? কারণ সমাজের বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে, যয়নাব হচ্ছে মোহাম্মদ (স.)-এর পোষ্যপুত্র যায়েদের স্ত্রী, তাই তার জন্যে পুত্রবধূকে বিয়ে করা কোনোমতেই হালাল নয়।

এমনিভাবে এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ও কথিত পালক পুত্রের বধূকে তালাক প্রদানের পর বিয়ে করার বৈধতা প্রসংগে আয়াত নাযিল করলেন। নতুন আয়াত

দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পোষ্যপুত্র গ্রহণের এ পন্থাকে চিরতরে রহিত করে দিলেন। এ ঘটনা নবী করীম (স.)-এর বিয়ে নীতির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছে, আর এ পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে সমাজে আকস্মিকভাবে এক প্রলয়ংকরী ঝড়ের সৃষ্টি হলো। কানাঘুষা এবং অপবাদের তুফান প্রবাহিত হতে লাগলো। এ ঘটনা সমাজের প্রচলিত ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করলো। এতে সমাজের সকল কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করা হলো। এমনি ধরনের একটি কু-প্রথার মূলোৎপাটন করার কারণে ইসলামবিরোধী শক্তিরা ব্যংগ বিদ্রূপ তিরস্কার, অপবাদ ও মনগড়া কেসসা কাহিনী রটনা করতে শুরু করলো।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন পরিস্থিতিতে সকল অপবাদ ঘুচিয়ে সকল কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে আয়াতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী এই নির্দেশ প্রদান করলেন,

'অতপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলো।'

তখন আমিই তোমার সাথে তাকে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন করলাম। যাতে করে মোমেনের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করলে, তাদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে আর কোনো অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা না থাকে। রসূলকর্তৃক আল্লাহ তায়ালা এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা ছিলো মূলত কুফরী সমাজের কুপ্রথা অপনোদনকল্পে বড়ো ধরনের একটি আঘাত। এ আঘাত তিনি যখন হেনেছিলেন, তখন সমস্ত জনগোষ্ঠী প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। সকল শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টি এর প্রতি নিবদ্ধ হলো। সকল শক্তি দিয়ে এর প্রতি ঘৃণা ও বিরোধিতা শুরু করলো। গোটা সমাজে প্রচন্ড কম্পন সৃষ্টি হলো। তাদের মনগড়া মাবুদ ও বাপ দাদাদের প্রচলিত কুপ্রথার সাথে এর ভীষণ দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটলো। কিন্তু তা তাওহীদি আকীদার সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির পরিবর্তে তার প্রতি দৃঢ়তার প্রমাণই উত্থাপিত করলো। আয়াতের শেষাংশে বলা হলো,

'মূলত আল্লাহর নির্দেশনাই কার্যকর হয়ে থাকে।'

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশকে পরিত্যাগ করা, তাঁর নির্দেশকে অমান্য করা, তাঁর নির্দেশ থেকে পলায়ন করা কিংবা তার বিরোধিতার কোনো পথই অবশিষ্ট থাকে না। চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশই কার্যকর হয়ে থাকে। তার নির্দেশকে অমান্য করার কোনো পথই আর উন্মুক্ত থাকে না। বস্তুত যয়নাব (রা.) তালাকের ইদ্দত শেষ হবার পরেই তার সাথে রসূলের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। যয়নাব (রা.)-এর পূর্ব স্বামী যায়েদ (রা.)-কে তার কাছে সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব, রাসূল (স.)-এর বিয়ের পয়গাম নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিলো। বিষয়টি হাদীসে এভাবে উল্লেখ রয়েছে,

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যয়নাব (রা.)-এর বিবাহ বিচ্ছেদের পর যখন তিনি ইদ্দত পূর্ণ করলেন, তখন মহানবী (স.) যায়েদ ইবন হারেসা (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি যাও এবং যয়নাবের কাছে আমার পয়গামের কথা উল্লেখ করো। হযরত যায়েদ (রা.) যখন যয়নাবের কাছে গেলেন, তখন তার মুখমন্ডল ওড়না দ্বারা আবৃত ছিলো। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, তার সাথে আমার সাক্ষাতের পর আমি হতচকিত হয়ে গেলাম, আমার অন্তরে এক অকল্পনীয় ভীতির সৃষ্টি হলো। আমি যেন তার প্রতি তাকাবার শক্তিই হারিয়ে ফেললাম। রসূলের পয়গামের কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে আমার বাকশক্তি যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। যয়নাব আমার দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ালো, আমিও তাকে পশ্চাতে রেখে দাঁড়িয়ে বললাম, হে যয়নাব! আমি তোমাকে একটি শুভ সংবাদ দিচ্ছি; আমাকে আল্লাহর রসূল বিয়ের পয়গামসহ তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন। এ কথা শুনে যয়নাব বললেন, আমি এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছি না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে আমাকে কোনো নির্দেশ প্রদান না করেন।

এ বলে তিনি মসজিদে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠিক এই মুহূর্তেই আল্লাহ তায়ালা এই নির্দেশনামূলক আয়াত নাযিল করলেন।

পরক্ষণেই রাসূলুল্লাহ (স.) তার কাছে গমন করলেন। (এবং তাকে আল্লাহর আয়াত শুনালেন) [মোসনাদে আহমদ (র.) মুসলিম ও নাসায়ী হাদীসটি সোলায়মান ইবনে মুগীরার সনদে সংকলিত করেছেন]

ইমাম বোখারী (র.) হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর সনদে একটি হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, যয়নাব বিনতে জাহশ (রা.) রসূলের জীবন সংগীনীর মর্যাদাপ্রাপ্তির পর অন্যসব উম্মুল মোমেনীনের সাথে গর্ব প্রকাশ করে বলতেন, তোমাদেরকে তোমাদের অভিভাবকরা ও তোমাদের পরিবারের লোকেরা রসূলের কাছে বিয়ে দিয়েছে, আর আমাকে বিয়ে দিয়েছেন সপ্তাকাশের উর্ধে অবস্থানকারী স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

তারপরও ঘটনাটি এমনি এমনি শেষ হয়ে যায়নি। চিরাচরিত প্রথা ও অতীত ঐতিহ্য বিরোধী এ ঘটনা সমগ্র সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। মোনাফেক ও মোশরেকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুসলিম নামধারী কতিপয় ব্যক্তিও এ প্রচারণায় শরীক হলো যে, 'মোহাম্মদ (স.) তার পুত্রবধূকে বিয়ে করেছে।'

এমনিভাবে এ সমস্যা যখন জটিল আকার ধারণ করলো, আর আবহমানকালের ঐতিহ্যের বিপরীত এ পদ্ধতিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হলো; তখন কোরআনুল করীম এ যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করে এর অস্পষ্টতাকে দূরীভূত করেছিলো, এর মৌলিক ও ঐতিহাসিক ধারায় সকল অপপ্রচার ও অপবাদকে অপসারিত করার যুক্তিসংগত প্রমাণ উত্থাপন করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলো,

'নবী (স.)-এর জন্যে আল্লাহ তায়ালা যা ফরয করে দিয়েছেন, তা কার্যকর করার মধ্যে কোনো ক্ষতি (প্রতিবন্ধকতা) নেই।'

অর্থাৎ আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট এ ঘোষণা দেয়া হলো যে, যয়নাবকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজেই তাঁর ওপর ফরয করে দিয়েছেন। আসলে আরব সমাজে পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে না করার এ ভ্রান্ত প্রথা বাতিল করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা নবীর ওপর এ বিধান ফরয করেছেন। তাই আল্লাহর এ নির্দেশকে বাস্তবায়ন করার মধ্যে কোনো প্রকার ক্ষতি নিহিত নেই এবং আল্লাহর নির্ধারিত বিধান কার্যকর করা তাঁর জন্যে কোনো দোষণীয়ও নয়। পূর্ববর্তী নবী ও রসূলদের যুগেও এ ধরনের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বত্রই আল্লাহর নির্ধারিত বিধান কার্যকর হয়েছে। মোহাম্মদ (স.) নিজেও নবী ও রসূলদের সে ধারাকেই অব্যাহত রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো অভিনব পন্থা অবলম্বন করেননি। তিনি যে পূর্ববর্তী নবী ও রসূলদেরই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন, তার প্রমাণ উপস্থাপন করে আল কোরআনে বলা হয়েছে,

'মোহাম্মদ (স.)-এর আগে যে সকল নবী ও রসূল চলে গেছে, তাদের যুগেও আল্লাহর বিধান অনুরূপই ছিলো।'

বস্তুত এ ব্যাপারটিও আল্লাহর চিরন্তন অপরিবর্তনীয় নীতির ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা প্রত্যেক বিষয়ের অন্তর্নিহিত গভীর উপলব্ধি ও তাৎপর্যের সাথেই সম্পৃক্ত ও সমন্বিত। এটি ঘুণেধরা সমাজ জীবনে আবর্তিত ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা, অন্ধ আবেগ ও অভিশপ্ত কুসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়নি। সকল ব্যাপারই আল্লাহর এলম ও পরিকল্পনার মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত ছিলো। এ স্থায়ী সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই কোরআনে হাকীমে এরশাদ হচ্ছে,

'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নির্দেশই নির্ধারিত ও অবধারিত।'

আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশই তো কার্যকর হবে। আল্লাহর নির্দেশের সামনে কোনো কিছুই বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে ও টিকে থাকতে পারে না। কেননা তা পূর্ব নির্ধারিত, দার্শনিক ও কৌশলগত দিক থেকেও একান্ত তাৎপর্যবহ। আল্লাহর কাংখিত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায়ও তা পূর্ব অনুমোদিত ব্যাপার। সে অসীম জ্ঞানময় একমাত্র মহান সত্ত্বাই এর প্রয়োজনীয়তা, এর মূল্যমান নির্ধারণ করেন। এর যুগ ও কাল সম্পর্কে সম্যকভাবে তিনিই ওয়াকেফহাল। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের প্রতি সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত পদ্ধতিকে বাতিল করা এবং তার সকল নিদর্শনকে কার্যকরভাবে বিলুপ্ত করার হুকুম দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাই পূর্ববর্তী নবী ও রসূলদের অনুসৃত নীতির উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তাঁর নির্দেশের বাস্তবতা, অপরিহার্যতা যৌক্তিকতা ও কল্যাণকামিতাকে স্বপ্রমাণিত করেন। কারও পক্ষেই আল্লাহর এসব নির্দেশকে কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার কোনো অবকাশ থাকে না।

নবীদের সাথে উম্মতদের সম্পর্কের ধরণ

আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরও উল্লেখ করেছেন যে, এ সবই হচ্ছে, আল্লাহর চিরন্তন রীতি ও পদ্ধতি। রসূলে করীম (স.)-এর আগেও এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রেরিত অগণিত ও অসংখ্য নবী ও রসূলরা এ একই পদ্ধতি ও বিধানের অনুসরণ করেছেন। আল্লাহর চিরন্তন বিধানকেই তারা কার্যকর করেছেন। পূর্ববর্তী নবী ও রসূলকর্তৃক আল্লাহপ্রদত্ত বিধান ও পদ্ধতিকে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে কার্যকর করার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন,

'সে সকল নবী ও রসূল যারা আল্লাহ প্রদত্ত রেসালাতের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে তাবলীগ ও দাওয়াতের কার্য সম্পাদন করতেন তারা আল্লাহকেই ভয় করতেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকেই তারা ভয় করতেন না।' (আয়াত ৩৯)

আল্লাহ তায়ালা নবী ও রসূলদেরকে রেসালাতের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো সৃষ্টির প্রতি জবাবদিহিতার চিন্তা তারা করতেন না। আল্লাহর পয়গামের প্রচার-প্রসার, দাওয়াত তাবলীগ ও তাকে কার্যকর করার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও তারা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তির ভয় ও পরোয়া করতেন না। আয়াতে এরশাদ হচ্ছে,

'হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।'

আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সার্বভৌম শক্তিমান সত্ত্বা, হিসাব গ্রহণ ও জবাব দেয়ার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। নবী ও রসূলদের আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত পয়গামের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানুষের কাছে হিসাব প্রদান ও জবাব দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। এবার এ ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রেখেই বলা হচ্ছে,

'মোহাম্মদ (স.) তোমাদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষের পিতা নয়।'

মোহাম্মদ (স.) তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন। তার যে কয়টি ছেলে সন্তান হয়েছে তারা সবাই পুরুষের স্তরে উপনীত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। আরবী পরিভাষায় 'রাজুল' (অর্থাৎ পুরুষ) শব্দটি আঠার থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে বলা হয়। মোহাম্মদ (স.)-এর সকল ছেলে সন্তান যেহেতু আঠার বছর বয়স হবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন, তাই মোহাম্মদ (স.) এ জগতের কোনো পুরুষের পিতা নন। তাই যয়নাবও (রা.) তার পুত্রবধূ নন। যায়েদ ইবনে হারেস তার পুত্র নন বরং তিনি হচ্ছেন হারেসার পুত্র। প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

ও বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ সত্যই এখানে উদ্ভাসিত হয়। অতএব, যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহশ (রা.)-কে বিয়ে করাটা কোনো অপরাধ নয়। এর মধ্যে কোনো ক্ষতি ও প্রতিবন্ধকতাও বিদ্যমান নেই।

হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে মুসলিম উম্মাহর সম্পর্কের বুনিয়াদ হচ্ছে, রসূল ও উম্মাতের সম্পর্ক। তিনি কোনো অবস্থায়ই কোনো সাহাবী এবং তার প্রতি ঈমান আনয়নকারী কোনো উম্মাতের পিতা নন। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে,

'বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী।' (আয়াত ৪০)

যেহেতু তিনি আল্লাহর সর্বশেষ রসূল, তাই তাঁর মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় বিধানসমূহকে পরিপূর্ণতা লাভ করতে হবে, যাতে করে মানবকূলের জন্যে আল্লাহর পরিপূর্ণ বিধান অনুসারে জীবনযাত্রা পালন করা সহজ হয়। সর্বশেষ আসমানী রেসালাতের বিধান মোতাবেক যমীনের অধিবাসীদের জীবন প্রবাহ সুষ্ঠু ও কল্যাণময় ধারায় প্রবাহিত হবে। সর্বশেষ নবীর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সর্বশেষ পূর্ণাংগ জীবন বিধানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও লংঘন করা যাবে না। বলা হচ্ছে,

'আর আল্লাহ তায়ালাই তো সকল বিষয় পরিজ্ঞাত।' (আয়াত ৪০)

আল্লাহ তায়ালাই যেহেতু সকল বিষয়ে ভালভাবে পরিজ্ঞাত, তাই সৃষ্টিকূলের কিসে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা তিনিই ভালোভাবে জানেন। তিনিই নবী করীম (স.)-এর জন্যে যা অবধারিতভাবে নির্ধারণ করার তা নির্ধারণ করেন, যা পছন্দ করার তা পছন্দ করে দেন। তিনি পালক পুত্রের স্ত্রীকে স্বামীর তালাক দেয়া ও তার যথার্থ ইদ্দত পূরণের পর বিয়ে করাকে কল্যাণকর বিবেচনা করেই তিনি তা বৈধ ঘোষণা করেন।

তিনি তার সীমাহীন জ্ঞানের আলোকেই সকল সিদ্ধান্ত ও বিধান প্রদান করেন। তিনি তাঁর অপার অনুগ্রহ ও অসীম জ্ঞানের ভিত্তিতে মানব কল্যাণের নিমিত্তেই মানুষের জন্যে সকল নিয়ম-শৃংখলা, নীতিমালা ও বিধি নির্ধারিত করেন।

আল্লাহর যেকেরের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

'হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো আল্লাহকে অতি বেশী বেশী করে স্মরণ করো.... তিনি তাদের জন্যে আরও সম্মানজনক প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন।' (আয়াত ৪১-৪৪)

আয়াতে হৃদয়ের গভীর আকুতি দিয়ে বেশী বেশী পরিমাণে আল্লাহর যেকের, গভীর মনোনিবেশ সহকারে মোহব্বত ও বিনয়ের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করার হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে। শুধু তোতা পাখীর মতো 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' শব্দের উচ্চারণ ও আবৃত্তির কথা বলা হয়নি। কণ্ঠ ও ঠোঁট নাড়া চাড়ার কথাই বলা হয়নি; বরং অন্তরের গভীর অনুরাগ ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর যেকেরের উপদেশ দেয়া হয়েছে। শুধু নামায কায়েমের মধ্যেই এই যেকের সীমাবদ্ধ নয়। নামায পড়া ও কোরআনুল করীম তেলাওয়াতের পর হাদীসে বর্ণীত দিবস ও রজনীতে সকাল ও সন্ধ্যায় নামাযের পর বেশী বেশী করে আল্লাহর যেকেরের হেদায়াত দেয়া হয়েছে। তেলাওয়াতে কোরআন অবশ্যই উত্তম যেকের।

আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবন মাজাহ হাদীস গ্রন্থসমূহে আবু সাঈদ খুদরী, ও আবু হোরায়রা সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রসূল বলেন, স্বামী ও স্ত্রী রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং তারা যদি দু'রাকাত নামায আদায় করে তবে সে রাতে তারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যেকেরকারী পুরুষ ও রমণীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নামায আল্লাহর যেকেরের অন্তর্ভুক্ত। বান্দার যে কোনো প্রক্রিয়া বা পন্থায়ই আল্লাহকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করাটাই আল্লাহর যেকেরের মধ্যে শামিল হবে। বান্দা যদি হৃদয়ের আকুতি, নিষ্ঠা, একাগ্রচিত্ততা নিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তবে মুখে প্রকাশ্য উচ্চারণ করুক আর নাই করুক তা আল্লাহর যেকের পরিগণিত হবে। মূলত যে কোনো অবস্থায় হৃদয়ের গভীর অনুভূতি, আল্লাহর সাথে একনিষ্ঠ সম্পর্কই হচ্ছে যেকেরের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

প্রকৃতপক্ষে মানব হৃদয় নীরবে নির্জনে ব্যাকুল চিত্তে পরম প্রিয় আল্লাহর সান্নিধ্যে তাঁরই ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহর সাথে তার গভীর একটা সম্পর্ক গড়ে তোলে। আল্লাহর প্রেমে তাঁর যেকেরে লিপ্ত হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহর মোহব্বত ও মারেফাতের সকল পদ্ধতির পরিচয় সে লাভ করে। এখানে সে আত্মপরিচিতিরও সন্ধান পায়। কোথা থেকে তার জীবনের সূত্রপাত, কোথা থেকে তার আগমন এবং কোথায় তার প্রত্যাবর্তন, জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি কোথায়– তার সঠিক উপলব্ধিও সে এর মাধ্যমে লাভ করে।

আল্লাহর যেকের, তাঁর গভীর সান্নিধ্য ও তার সাথে নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোরআনুল কারীম ও সুন্নাতে রসূল অসংখ্যবার মানব হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। কোরআন ও সুন্নাহ আল্লাহর যেকের ও মারেফাতের সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়, মানব জীবনের গতিধারায় যেকেরের সুনির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারিত করে। জীবনের কর্ম প্রবাহ ও সময়ের আবর্তে আল্লাহর বান্দা কখন কোন যেকের ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভ করবে, কখন কোন যেকের ও দোয়ার ভিত্তিত্বে নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক পয়দা করবে আয়াতটি তারও শিক্ষা প্রদান করে। দিন ও রাতের সকল সময়ে কর্ম জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহ নির্ধারিত এ সকল যেকের ও দোয়া আল্লাহর ব্যাপারে গাফেল হওয়া থেকে মানুষের সামষ্টিক জীবন ধারাকে রক্ষা করে। এ পর্যায়ে কোরআনে হাকীমে এরশাদ হচ্ছে,

(হে মোমেনরা!) 'তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা বর্ণনা কর, তার তাসবীহ ও পবিত্র বর্ণনায় লিপ্ত থাকো।'

সকাল ও সন্ধ্যায় বেশী বেশী করে আল্লাহর যেকের ও তাসবীহতে লিপ্ত থাকার নির্দেশে এ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, সময়ের বিবর্তনকালে মানুষের মন আল্লাহর চিরন্তন পরিবর্তনহীনতার প্রতি গভীরভাবে নিবদ্ধ ও আকৃষ্ট হয়। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক এ সময় সুদৃঢ় ও নিবিড় হয়। মানব হৃদয়ে এ অনুভূতি ও চেতনার উদ্রেক হয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিতে সময় ও পরিবেশ সবসময়ই পরিবর্তন হয়, কালের পরিবর্তন ঘটে। দিবস ও রজনীর আগমন ও প্রত্যাবর্তনে চন্দ্র ও সূর্য উদিত অস্তমিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা, চিরন্তন, চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয়, তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি এমন মনিব যার সহায় আশ্রয় ও ছায়ার কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না। তিনি আবর্তিত হন না, অস্তমিতও হয় না। একমাত্র আল্লাহর সত্ত্বা ব্যতীত অপর সকল কিছুরই পরিবর্তন, আবর্তন, উদয়, অস্তগমন, ধ্বংস ও বিলুপ্তি ঘটে থাকে।

আল্লাহর যেকের ও তাসবীহ-এর মধ্যে মানুষের জিহ্বা ও হৃদয় সকাল-সন্ধ্যা তথা সর্বদা আর্দ্র ও লিপ্ত থাকার কারণেই আল্লাহর অফুরন্ত রহমত, অনুদান ও অনুগ্রহের চেতনা মানুষের মনে জাগ্রত থাকে। আল্লাহ তায়ালা যে সব সময়ই তার সৃষ্টির জন্যে, করুণা ও রহমত বিতরণ করেন, সৃষ্টির সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন, সকল সময় মানুষের কল্যাণই আল্লাহর একমাত্র কাম্য, মানব অন্তরে একথাটা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের চেতনা ও বিশ্বাসে এ মনোভাব জেগে উঠে যে, একমাত্র আল্লাহর সত্তাই কারও মুখাপেক্ষী নন, অন্য সকল সৃষ্টিই তাঁরই করুণার

মুখাপেক্ষী, তার দরবারে সকলেই ভিক্ষুক, করুণা ও আশ্রয়প্রার্থী। সকলেই তার সাহায্য ও অনুগ্রহের প্রত্যাশী। এরশাদ হচ্ছে,

আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র মহান সত্ত্বা। তিনি তোমাদের প্রতি তার করুণা বর্ষণ করেন, তাঁর ফেরেশতাকূলও তোমাদের জন্যে তাঁর রহমতের দোয়া করে, যাতে করে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকারের কুহেলিকা থেকে টেনে আলোকজ্জ্বল পথে বের করে নিয়ে আসেন। তিনি মোমেনদের প্রতি অত্যধিক মেহেরবান।' (আয়াত ৪৩)

আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সেই মহান সত্ত্বা, তাঁরই অনন্ত অনুগ্রহসমূহ সর্বত্র ব্যাপৃত ও উদ্ভাসিত। তাঁরই মহান অনুগ্রহ ও বখশীশ সকল স্থানে ও সকল সময়ই প্রতিভাত। তার অনুদান সর্বদা বহুগুণে বর্ধিত হয়। তিনিই দুর্বল অসহায় সর্বহারা, নশ্বর, ধ্বংসশীল, মোহতাজ বান্দাদেরকে রহমতের দৃষ্টি দিয়ে স্মরণ করেন, তাদের আশ্রয় ও ছায়া দান করেন। তিনি ব্যতীত কোনো আশ্রয়দাতা নেই। তিনি ছাড়া কোনো চূড়ান্ত ক্ষমতা ও নিরংকুশ শক্তির উৎস কেউ নেই। তিনি ব্যতীত কোনো শক্তিই মানুষের প্রয়োজন ও সাহায্য করার ক্ষেত্রে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী নয়। বান্দার প্রতি তাঁর দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখেন। একমাত্র তিনিই তাদের প্রয়োজন পূরণ, অভাব দূরীকরণ ও সাহায্য প্রদানের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন। তার ফেরেশতারাও বান্দাদের প্রতি রহমতের দোয়া করেন। বান্দা ও সৃষ্টিকূল তাঁর যেকের ও তাসবীহ হাতে সদাসর্বদা লিপ্ত থাকলে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের যেকের ও দোয়াকে কবুল করেন। নবী করীম (স.) হাদীসে কুদসীতে বলেছেন,

'যে একাকী আমার যেকের করে আমি আল্লাহ তায়ালা একাকী তাকে স্মরণ করি, আর যারা সমাবেশ করে সম্মিলিতভাবে আমার যেকের করে, আমি ফেরেশতাদের নিয়ে এর চেয়ে অনেক বড় সমাবেশ করে তাদেরকে স্মরণ করি (বোখারী)।

জান্নাতে মোমেনদের সম্বর্ধনা

জেনে রাখা আবশ্যক যে, সে সমাবেশ হবে বিশাল ও মহান। মানুষের কল্পনা ও অনুভূতি দ্বারা তার যথার্থ উপলব্ধি করা খুবই কঠিন, বরং বলা যেতে পারে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আল্লাহর এটি জানা আছে যে, এ সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি, সকল প্রাণী আর এতে অবস্থিত সকল বস্তু সামগ্রী আল্লাহর অসীম সৃষ্টির পরিমাপে সীমাহীন মহাশূন্যের তুলনায় একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুসমও নয়। মহাশূন্যের অগণিত গ্রহ নক্ষত্র ও আকাশের বিভিন্ন স্তরসমূহ তাতে অবস্থিত সকল দ্রব্য পদার্থ ও এতে বসবাসকারী প্রাণীকূল আল্লাহর অগণিত রাজত্বের একটি অংশ মাত্র। তিনি যখন বলেছেন, 'কুন' হয়ে যাও তখন তা হয়ে যায়। আল্লাহর নির্দেশেই তা অস্তিত্ব লাভ করে। আয়াতে করীমায় বলা হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা সে মহান সত্ত্বা, যিনি তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে নিয়ে আসার ফেরেশতারা তোমাদের জন্যে রহমতের দোয়া করে।'

আল্লাহর জ্যোতি একক, ও অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। এর বিপরীত যা তা হচ্ছে বহুধাবিভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন অন্ধকারের সমষ্টি। মানুষ আল্লাহর এই একক জ্যোতি থেকে বের হতে অন্ধকারের মধ্য হতে যে কোনো একটি অন্ধকারের মধ্যেই অতপর সে জীবন অতিবাহিত করে। আর এ অন্ধকার থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুক্তি পায় না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয়ে আল্লাহর

জ্যোতি পুনরায় উদিত ও উদ্ভাসিত না হয়। আল্লাহর নূর তার হৃদয়রাজ্যে প্রবেশের ফলেই অন্ধকারের আবরণমুক্ত হয়ে তার আত্মা বিকশিত ও প্রভাদীপ্ত হয়। এ সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি, সকল প্রাণীকূল আর এতে অবস্থিত সকল সামগ্রী ও বস্তু আল্লাহর অসীম সৃষ্টির পরিমাপে সীমাহীন মহাশূন্যের তুলনায় একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুসম। মহাকাশের অগণিত গ্রহ নক্ষত্র, তার বিভিন্ন স্তরসমূহ ও তাতে অবস্থিত সকল দ্রব্য, পদার্থ ও বসবাসকারী প্রাণীকূল আল্লাহর অগণিত রাজত্বের একটি অংশ বিশেষ মাত্র। তারা সবাই স্বভাবজাত হেদায়াতের পথের সন্ধান লাভ করে। ফেতরাত বা প্রকৃতির তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও বিশ্ব প্রকৃতিতে তারই প্রদত্ত চিরন্তন জ্যোতির্ময় দ্বীন যে ইসলাম সে কথার প্রমাণ পেশ করা। আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে হেদায়াতের জ্যোতিকে বিকশিত করে তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। ফেরেশতারা হেদায়াতের পথে মানুষের সুদৃঢ় অবস্থান কল্পে, অন্ধকার থেকে তাদের আলোর পথে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর রহমতের জন্যে দোয়ায় লিপ্ত থাকেন। এমনিভাবে আল্লাহর রহমত বর্ষণ ও ফেরেশতাদের দোয়ার ফলে তাদের অন্তর কুফরীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঈমান গ্রহণের জন্যে আবার উন্মুক্ত ও বিকশিত হয়। বলা হচ্ছে,

'তিনি মোমেনদের প্রতি পরম দয়াবান।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার পরম মেহেরবাণীর বদৌলতে কর্মের জগতে তারা সত্য ও স্বভাবজাত দ্বীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে সৎকর্মশীল জীবন যাপন করে। ফলাফলের জগত আখেরাতে তারা আল্লাহর পুরস্কার ও প্রতিদান রূপ রহমত লাভ করে। আল্লাহর রহমত থেকে দুনিয়া ও আখেরাত কোনো জগতেই তারা বঞ্চিত থাকে না। অনন্ত আখেরাতে তারা মহান রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত সম্মান, মর্যাদা ও মহান অনুগ্রহ লাভ করে। আয়াতে এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর দিদার লাভের দিবসে, তাদেরকে সালামের মাধ্যমে খোশ আমদেদ জানিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তাদের জন্যে সেখানে সম্মানজনক পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।' (আয়াত ৪৪)

তারা তখন সকল ভীতি ও আশংকা থেকে সুনিশ্চিতভাবে নিরাপত্তা লাভ করবে। সকল অবসাদ ক্লান্তি ও কষ্ট থেকে তারা মুক্তি পাবে। আল্লাহর দিদার লাভের মহান মর্যাদা লাভ করার সময় তাদের প্রতি সালাম জানিয়ে শুভেচ্ছা ও সম্মান জানানো হবে। ফেরেশতারা দলে দলে জান্নাতের বিভিন্ন তোরণ দিয়ে আগমন করে তাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন ও সম্বর্ধনা জানাবে। তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত মহান পুরস্কার সুসংবাদ সম্পর্কে অবগত করানো হবে। মোমেনরা সেখানে অভাবিত অকল্পনীয় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে। তারা শীর্ষস্থানীয় সম্মানপ্রাপ্ত হবে। মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এ সম্মানের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের জন্যে এ মর্যাদাকে তিনি পছন্দ ও নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহর এ পছন্দকে অস্বীকার ও অপছন্দ করার মতো কেউ কি আছে?

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের জন্যে যে ব্যবস্থা নির্ধারিত করেছেন, নবী করীম (স.) তারই দাওয়াত তাবলীগের মহান দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্যে যে বিধানের প্রবর্তন করেছেন রসূল তাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বান্দার জন্যে অহরহ যে কর্মসূচী নির্ধারিত করেছেন তাঁর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের কর্মধারা বাস্তবায়ন এবং সে সকল কার্য পালনের ফযীলত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি......তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।'

এ আয়াত থেকে এটি স্বতসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর তরফ থেকে নবী করীম (স.)-এর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বের সাক্ষী হিসেবে উত্তমভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবেন, সে দায়িত্বকে তিনি মিথ্যা প্রমাণিত করবেন না, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ও সংকোচন করবেন না। যারা মনে-প্রাণে এ মহান দাওয়াত ও পয়গামকে কবুল করবেন বাস্তব জীবনে এ সত্যের অনুসরণকারী সৎকর্মশীল মোমেনদেরকে তিনি আল্লাহর রহমত মাগফেরাত, নেয়ামত, অনুগ্রহ ও সম্মান ও মর্যাদাপ্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদান করবেন। অচেতন গাফেল, এ দাওয়াতের অস্বীকারকারী, দুষ্কৃতকারী কাফের মোরতাদদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করবেন। আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ইংগিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের অজ্ঞাত অসতর্ক রেখে শাস্তি প্রদান করা হবে না; বরং তাদেরকে আগেই সাবধান ও ভীতি প্রদর্শন করার পরই আযাব দেয়া হবে।

নবী করীম (স.)-এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে যে, তিনি দায়ী ইলাল্লাহর কর্তব্য আঞ্জাম দেবেন।

বলা হচ্ছে, 'তুমি হচ্ছো দায়ী ইলাল্লাহ।'

আল্লাহর পথে আহ্বানকারী অর্থাৎ নবী মানব মন্ডলীকে তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবেন। নশ্বর দুনিয়ার দিকে ডাকবেন না।

পার্থিব স্বার্থের প্রতি কোনোরকম আহ্বান জানাবে না। কায়েমী স্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তির আহ্বানও করবেন না। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের পথে, ধন সম্পদের লোভ ও লালসার পথে, রাজত্ব, ক্ষমতা ও স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে নবীর দাওয়াত পরিচালিত হবে না। আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে তোমাকে একমাত্র আল্লাহর পথের 'দায়ী' তথা আহব্বানকারীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহর সাথে মানুষের সংযোগ সম্পর্ক সৃষ্টির প্রতিই তোমার দাওয়াত নিবদ্ধ হবে। আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা আল্লাহর সান্নিধ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তোমার দাওয়াত পরিচালিত হবে। তা হবে একটিমাত্র পথের প্রতি দাওয়াত, যে পথে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

অতপর আয়াতে বলা হয়েছে,

'আল্লাহর নির্দেশেই।'

আল্লাহর হুকুমে ও তার অনুমোদনক্রমেই নবী (স.) এ দাওয়াত উপস্থাপন করেন। আয়াতে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হলো, শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর পেশ করা দাওয়াত কোনো অভিনব দাওয়াত নয়, এ দাওয়াত ধর্মের নামে কোনো ভন্ডামীর দাওয়াত নয়, এ দাওয়াত তাঁর নিজস্ব চিন্তা-প্রসূত কোনো মনগড়া দাওয়াত নয়, এটি খালেসভাবে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা, নিরংকুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, অসীম জ্ঞানময় আল্লাহর নির্দেশিত ও অনুমোদিত দাওয়াত। আল্লাহর হুকুমেই এ দাওয়াত নিয়ে তার আগমন ঘটেছে, এ দাওয়াতের দায়িত্ব সম্পাদনের মাধ্যমে নবী নির্দেশই পালন করেছেন, কেননা তার নির্দেশ কখনো অমান্য করা যায় না, লংঘন করা যায় না। অতপর আয়াতে বলা হয়েছে এ নবী হচ্ছেন উজ্জ্বল চেরাগ, আলোকিত প্রদীপ। এর মর্ম হচ্ছে, নবী করীম (স.) হচ্ছেন আল্লাহর পথে আহবানকারী উজ্জ্বল প্রদীপের সমতুল্য, পথ চলার সময় যে প্রদীপ অন্ধকারকে দূরীভূত করে। পথের সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ থেকে পথচারীকে মুক্ত রাখে। চলার পথকে আলোকিত করে তোলে। এমন উজ্জ্বল আলোর প্রদীপ-যা পথচারীকে অন্ধকার থেকে আলোর দিশা প্রদান করে নির্বিঘ্নে পথ চলতে সাহায্য করে।

রসূল (স.) ছিলেন জ্যোতির্ময় প্রদীপ। তিনি আলোকবর্তিকা নিয়েই আগমন করেছিলেন। এ সৃষ্টিজগত ও বিশ্ব প্রকৃতির জন্যে তিনি উজ্জ্বল জ্যোতির ধারণা প্রদান করেছেন, তার মাধ্যমেই জীবন পথের আলো বিকশিত হয়েছে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সংযোগ স্থাপনের জ্যোতির্ময় পথের

দিশা তিনিই প্রদান করেছেন। সৃষ্টির অবস্থান থেকে স্রষ্টার মনযিল পর্যন্ত পৌছার প্রদীপ একমাত্র তিনি। বিশ্বপ্রকৃতির ও মানব সত্ত্বার অস্তিত্ব এ জ্যোতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এ জ্যোতিই মানবকূলকে তাদের মনযিলে পৌঁছে দেয়। এটিই হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী কথা, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ, অস্পষ্টতা ও রহস্য নেই। এভাবেই এই আয়াতে বিশ্ব প্রকৃতির সামনে রসূলকে প্রদীপ, সাক্ষী ও সুসংবাদদাতারূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তুমি মোমেনদেরকে এ সুসংবাদ দাও যে, অবশ্যই তাদের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে সুবিশাল অনুগ্রহ ও বখশীশ রয়েছে।'

কোরআনুল কারীমে অতি সুন্দরভাবে নিম্নোক্ত এই বক্তটির পরে এই বাক্যটির উল্লেখ রয়েছে, 'হে নবী নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ভীতি প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি।' (আয়াত ৪৫)

তাকে সাক্ষী সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করাটা মোমেনদের প্রতি আল্লাহর অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও মেহেরবানী। কেননা নবী তাদের জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রকৃত পন্থা প্রবর্তন করেছেন। নবী করীম (স.)-এর প্রদর্শিত ও প্রবর্তিত শরীয়তের আনুগত্য ও অনুসরণই তাদের জন্যে আল্লাহর সুসংবাদটি বিশাল অনুগ্রহ ও অনুদানপ্রাপ্তি এনে দিয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে নবী করীম (স.)-কে কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকা ও মোমেনদের প্রতি কাফের ও মোনাফেকদের নির্যাতনকে উপেক্ষা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে একমাত্র আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি ভরসা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহায্যকারী হিসাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। বলা হয়েছে,

'তুমি কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ করো না। তাদের নির্যাতন যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করো। আল্লাহর ওপর ভরসা করো, আর ভরসা করার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।' (আয়াত ৪৮)

সূরার প্রথমদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শরীয়াতের সামাজিক বিধানসমূহ ঘোষণার আগেই কাফের ও মোনাফেকদের সম্পূর্ণ যুলুম নির্যাতন ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরোয়া না করার জন্যে রসূলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। সাথে সাথে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার তাগিদ করেছেন।

মোনাফেকদের ভয় না করা, কোনো ক্ষেত্রেই তাদের ওপর আস্থা পোষণ না করা ও তাদেরকে উপেক্ষ করার সাথে সাথে এখানে এক আল্লাহর ওপর ভরসা করার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'নির্ভর করার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।'

এমনিভাবে এখানে পূর্বাপর ঘটনাসমূহ যয়নাব বিনতে জাহশ (রা.) ও যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-এর ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। পোষ্যপুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিবাহের বৈধতার ব্যাপারে রসূল (স.) যে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তারও উল্লেখ রয়েছে।

এভাবে প্রচলিত সমাজের আবহমানকাল থেকে প্রচলিত ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে এ নতুন ব্যবস্থা প্রচলন করা যে কতোটা কঠিন কাজ তার বিবরণও রয়েছে। আল্লাহর বিধানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, তার ওপর দৃঢ়তা অবলম্বন ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে করে এ বিষয়গুলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ

تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ

سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ

اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ

عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَامْرَاَةً

مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ

اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾ تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۗ وَمَنِ

ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ

৪৯. হে মোমেনরা, যখন তোমরা মোমেন রমণীদের বিয়ে করো, অতপর (কোনো রকম) স্পর্শ করার আগেই তাদের তালাক দাও, তাহলে (এমতাবস্থায়) তাদের ওপর কোনো ইদ্দত (বাধ্যতামূলক) নয় যে, তোমরা তা গুনতে শুরু করবে, তবু তোমরা তাদের কিছু দিয়ে দেবে এবং (সৌজন্যের সাথেই) তাদের বিদায় করে দেবে। ৫০. হে নবী, আমি তোমার জন্যে সেসব স্ত্রীদের হালাল করেছি, যাদের তুমি (যথার্থ) মোহর আদায় করে দিয়েছো (সেসব মহিলাও তোমার জন্যে আমি হালাল করেছি), যারা তোমার অধিকারভুক্ত, যাদের আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দান করেছেন– এবং তোমার চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে, (তা ছাড়া রয়েছে) সে মোমেন নারী, যে (কোনো কিছু ছাড়াই) নিজেকে নবীর জন্যে নিবেদন করবে এবং নবী চাইলে তাকে বিয়ে করবে, এ বিশেষ (অনুমতি শুধু) তোমার জন্যে, অন্য মোমেনদের জন্যে নয়; (সাধারণ) মোমেনদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে আমি তাদের ওপর যে বিধি বিধান নির্ধারণ করেছি, তা অবশ্য আমি (ভালো করেই) জানি, (তোমার ব্যাপারে এ সুবিধা আমি এ জন্যেই দিয়েছি) যেন তোমার ওপর কোনো ধরনের সংকীর্ণতা না থাকে; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৫১. (তোমার জন্যে আরেকটি অতিরিক্ত সুবিধা হচ্ছে,) তুমি ইচ্ছা করলে তাদের মধ্য থেকে কাউকে (নিজের কাছ থেকে) দূরে রাখতে পারো, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের কাছেও রাখতে পারো; যাকে তুমি দূরে রেখেছো তাকে যদি (পুনরায়) তুমি (নিজের কাছে) রাখতে চাও, তাতেও তোমার ওপর কোনো গুনাহ নেই; এ (বিশেষ সুযোগ তোমাকে) এ জন্যেই দেয়া হয়েছে যেন এতে

وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ۚ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ
بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۚ وَكَانَ
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ
النَّبِىِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا
دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۚ اِنَّ
ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ۡ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ
الْحَقِّ ۚ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ
اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ

করে ওদের চক্ষু শীতল থাকে, তারা (অযথা) দুঃখ না পায় এবং তুমি ওদের যা দেবে তাতেই যেন ওরা সবাই সন্তুষ্ট থাকতে পারে; তোমাদের মনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা (ভালো করেই) জানেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও পরম সহনশীল। ৫২. (হে নবী, এর বাইরে) তোমার জন্যে বৈধ নয় যে, তুমি তোমার (বর্তমান) স্ত্রীদের বদলে (অন্য নারীদের স্ত্রীরূপে) নেবে, যদিও সেসব নারীর সৌন্দর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে, অবশ্য তোমার অধিকারভুক্ত দাসীরা (এ বিধি নিষেধের) ব্যতিক্রম, স্মরণ রাখবে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।

রুকু ৭

৫৩. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না, অবশ্য যখন তোমাদের খাওয়ার জন্যে (আসার) অনুমতি দেয়া হয় (তাহলে) সে অবস্থায় এমন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রবেশ করো, যাতে তোমাদের (খাওয়ার জন্যে) অপেক্ষা করতে না হয়, কিন্তু কখনো যদি তোমাদের ডাকা হয় তাহলে (সময়মতোই) প্রবেশ করো, অতপর যখন খাবার (গ্রহণ) শেষ করে ফেলবে তখন সাথে সাথে (সেখান থেকে) চলে যেয়ো এবং (সেখানে কোনো অর্থহীন) কথাবার্তায় নিমগ্ন হয়ো না; তোমাদের এ বিষয়টি নবীকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের (এ কথা বলতে) লজ্জাবোধ করে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সত্য বলতে মোটেই লজ্জাবোধ করেন না; (হ্যাঁ,) তোমাদের যদি নবীপত্নীদের কাছ থেকে কোনো জিনিসপত্র চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিয়ো, এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরকে পাক সাফ রাখার জন্যে অধিকতর উপযোগী; তোমাদের কারো জন্যেই এটা বৈধ নয় যে, তোমরা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেবে (না এটা তোমাদের জন্যে বৈধ

تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝٥٣ اِنْ

تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝٥٤ لَا جُنَاحَ

عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ

وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ

اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝٥٥ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ

عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝٥٦ اِنَّ

الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ

لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝٥٧ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ

مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝٥٨ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ

যে), তোমরা তাঁর পরে কখনো তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করবে, এটা আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি বড়ো (অপরাধের) বিষয়। ৫৪. তোমরা কোনো জিনিস প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো– আল্লাহ তায়ালা (তা) সবই জানেন, তিনি অবশ্যই সর্বজ্ঞ। ৫৫. (যারা নবীপত্নী), তাদের ওপর তাদের পিতা, ছেলে, ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে, (সব সময়ে আসা যাওয়া করা) মহিলারা এবং নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসীদের (সামনে আসা ও তাদের কাছ থেকে পর্দা না করার) ব্যাপারে কোনো অপরাধ নেই, (হে নবীপত্নীরা), তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন। ৫৬. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরূদ পাঠান; (অতএব) হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরাও নবীর ওপর দরূদ পাঠাতে থাকো এবং (তাঁকে) উত্তম অভিবাদন (পেশ) করো। ৫৭. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের ওপর দুনিয়া আখেরাত (উভয় জায়গায়ই) আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেন, (কেয়ামতের দিন) তিনি তাদের জন্যে অপমানজনক আযাব ঠিক করে রেখেছেন। ৫৮. যারা মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের কষ্ট দেয় তেমন ধরনের কিছু (দোষ) তারা না করা সত্ত্বেও, (যারা এমনটি করে) তারা তো (মূলত) মিথ্যা ও স্পষ্ট অপবাদের বোঝাই বহন করে চলে।

রুকু ৮

৫৯. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রী, মেয়ে ও সাধারণ মোমেন নারীদের বলো, তারা যেন

لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

তাদের চাদর (থেকে কিয়দংশ) নিজেদের ওপর টেনে দেয়, এতে করে তাদের চেনা (অনেকটা) সহজ হবে এবং তাদের কোনোরকম উত্যক্ত করা হবে না, (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৬০. মোনাফেক দল, (তাদের সাথে) যাদের অন্তরে কুফরীর ব্যাধি রয়েছে ও যারা মদীনায় (তোমার বিরুদ্ধে) গুজব রটনা করে বেড়ায়, তারা যদি (তাদের নোংরা কার্যকলাপ থেকে) বিরত না হয়, তাহলে (হে নবী), আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাদের ওপর প্রবল করে (বসিয়ে) দেবো, অতপর এরা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হিসেবে সামান্য কিছু দিনই থাকতে পারবে, ৬১. (এরপরও এখানে যারা থেকে যাবে তারা) থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, অতপর তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং (বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে) তাদের মৃতু দন্ডে দন্ডিত করা হবে। ৬২. (তোমার) আগে (বিদ্রোহী হিসেবে) যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারেও এ ছিলো আল্লাহ তায়ালার নীতি, আল্লাহ তায়ালার এ নিয়মে তুমি কখনো কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না।

তাফসীর
আয়াত ৪৯-৬২

সূরার এই অধ্যায়টাতে পরিবার গঠন সংক্রান্ত কোরআনী বিধানের একটা সাধারণ বিধি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বিধিটা সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এরপরে আসছে স্বয়ং রসূল (স.)-এর দাম্পত্য জীবন, তাঁর স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক, অন্যান্য পুরুষদের সাথে নবীপত্নীদের সম্পর্ক, নবী পরিবারের সাথে সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্ক এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতাদের কাছে রসূল (স.)-এর সম্মান ও মর্যাদা সংক্রান্ত আলোচনা ও বিধিমালা। সবার শেষে রয়েছে একটা সাধারণ বিধি, যা নবী পত্নীরা, নবী কন্যারা ও অন্যান্য মুসলমানদের স্ত্রী কন্যা ভগ্নিদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এই বিধিতে সকল মুসলিম নারীকে জরুরী কাজে বাইরে বেরুতে হলে সমস্ত শরীর একটা চাদরে ঢেকে বেরুতে বলা হয়েছে। সর্বাংগ আচ্ছাদনকারী এই বিশেষ পোশাকের কল্যাণে তারা একদিকে যেমন অন্যান্য মহিলাদের মধ্য থেকে স্বাতন্ত্র ও বিশিষ্টতা লাভ করবেন, তেমনি সবার কাছে তারা পরিচিতিও হবেন। ফলে খারাপ চরিত্রের অধিকারী মোনাফেক, পাপাচারী ও অপবাদ রটনাকারীরা তাদের কাছে ঘেঁষতে সাহস করবে না। উপসংহারে এসব মোনাফেক ও অপবাদ রটনাকারী মুসলিম নারীদের মান সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, তাদেরকে উত্যক্ত করা ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে বিরত না হলে তাদেরকে অবিলম্বে মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এ সমস্ত আইনগত বিধি ও নির্দেশনাবলী হচ্ছে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থারই অংশ বিশেষ। এ ক্ষেত্রে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচিত হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা এই পুন্যময় গৃহের জীবনধারাকে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর সামনে উন্মুক্ত করে দিতে চান। এ জন্যেই পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালে যে কোরআন চিরদিন পঠিত হতে থাকবে, নবী জীবনের এই একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়কেও তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা শুধু যে এই পরিবারের তত্ত্বাবধান নিজেই করেন তা নয়, বরং এ পরিবারটাকে তিনি এতো শ্রদ্ধার চোখে দেখেন যে, তাঁর চিরস্থায়ী গ্রন্থ কোরআনে সমগ্র মানব জাতির জ্ঞাতার্থে এ পরিবার সংক্রান্ত আলোচনা সংরক্ষণও করেছেন।

সহবাসপূর্ব তালাক ও তার বিধান

'হে মোমেনরা! তোমরা যখন মোমেনা নারীদের বিয়ে করবে এবং তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দেবে, তখন তাদের কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না'...... (আয়াত ৪৯)

ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ২৩৬ ও ২৩৭ নং আয়াতেও সহবাসের আগে তালাক দেয়া স্ত্রীদের পালনীয় বিধি বর্ণনা করা হয়েছে।

বিধিটা হলো, সহবাসের আগে যে স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়, তার জন্যে যদি বিয়ের সময় মোহরানা নির্ধারিত করা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সেই নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি কোনো মোহরানা নির্ধারণ না করা হয়ে থাকে, তাহলে তালাকদাতার সামর্থ অনুযায়ী সে কিছু জিনিসপত্র পাবে। এখানে সূরা আহযাবের এ আয়াতে এই তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত সংক্রান্ত বিধানটাও বাড়তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সূরা বাকারার আয়াত দুটোতে নেই। এখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তার আর কোনো ইদ্দত পালন করার দরকার নেই। কেননা তার সাথে সহবাস করা হয়নি। ইদ্দত পালন করা হয় কেবল জরায়ূকে সম্ভাব্য গর্ভ থেকে মুক্ত করার জন্যে এবং সাবেক বিয়ের প্রভাব থেকে সে মুক্ত এ কথা নিশ্চিত করার জন্যে। সন্তানের বংশ পরিচয় যাতে একাকার হয়ে না যায় গর্ভের সন্তান যে পুরুষের ঔরষজাত সন্তান নয়, তাকে তার সন্তান বলে পরিচয় দেয়া এবং যে পুরুষের ঔরষজাত সন্তান তার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়া যাতে না হয়; সে জন্যেই ইদ্দত পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু যে তালাকপ্রাপ্তার সাথে সহবাস করা হয়নি, তার জরায়ূ গর্ভমুক্ত। সুতরাং কোনো ইদ্দত পালন বা অন্য কিছুর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। 'তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিয়ে দাও।'

অর্থাৎ মোহরানা নির্ধারিত থেকে থাকলে তার অর্ধেক, নচেত স্বামীর আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী যে কোনো জিনিস দিতে হবে।

'এবং তাদেরকে শোভনীয় পন্থায় বিদায় দাও।'

অর্থাৎ কোনোরকম কষ্ট দিও না, বাধা বিপত্তি ও জটিলতার সৃষ্টি করো না এবং তাদের নতুন দাম্পত্য জীবন পুনরারম্ভ করাকে বাধাগ্রস্ত করার কোনো ইচ্ছা বা আগ্রহ পোষণ করো না।

এ হচ্ছে মুসলিম সমাজের জীবন পুনর্গঠন সংক্রান্ত সাধারণ বিধি যা এ সূরায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এরপর রসূল (স.)-কে জানানো হয়েছে তাকে ক'জন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিসত্ত্বার ও পরিবারের বিশেষত্ব কতখানি তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে সূরা নেসার ৩ নং আয়াতে স্ত্রীর সর্বোচ্চ সংখ্যা চারের মধ্যে সীমিত করা হয়েছে।

এ সময়ে রসূল (স.)-এর স্ত্রীর সংখ্যা ছিলো নয় জন। তিনি এদের প্রত্যেককে কোনো না কোনো বিশেষ কারণে বিয়ে করেছিলেন। ১. হযরত আয়েশা ছিলেন রসূল (স.)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর হযরত আবু বকরের কন্যা ২. হযরত হাফসা ছিলেন তাঁর অপর ঘনিষ্ঠ সহচর হযরত ওমরের কন্যা। ৩. আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবা, ৪. উম্মে সালমা, ৫. সওদা বিনতে যময়া ও ৬. যয়নব বিনতে খুযায়মা-এরা সবাই ছিলেন স্বামী হারানো মোহাজের (স.) এদের কোনো রূপ যৌবন ছিলো না, নিছক তাদেরকে সম্মানিত করাই ছিলো এই বিয়ের উদ্দেশ্য। ৭. যয়নব বিনতে জাহশের বিয়ের কাহিনী আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি। রসূল (স.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো যায়েদের কাছ থেকে তালাক পাওয়ার পর। যায়দের সাথে যয়নাবের এই বিয়েটা রসূল (স.)-ই দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিয়ে সফল হয়নি। সফল না হওয়ার পেছনে আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালাই ছিলো প্রধান কারণ। এ বিষয়টা আমরা তার কাহিনীতে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। ৮. এরপর বনু মোসতালিক গোত্রের জুয়াইরিয়া বিনতে হারেছ এবং ৯. বনু নযীর গোত্রের সুফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতার। এরা দুজনেই ছিলে যুদ্ধবন্দী। পরে রসূল (স.) তাদের উভয়কে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন মানুষে পরিণত করেন এবং তারপর তাদেরকে একের পর এক বিয়ে করেন। এই দুটো বিয়েরও উদ্দেশ্য ছিলো গোত্রগুলোর সাথে রসূল (স.)-এর সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং মহিলাদ্বয়কে সসম্মানে পুনর্বাসিত করা। উভয়ের গোত্রের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবার পর তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই মহিলারাই উম্মুল মোমেনীনে পরিণত হন, রসূল (স.)-এর নৈকট্য লাভ করে ধন্য হন এবং তাদেরকে দুনিয়ার সুখ ও আখেরাতের সুখ এই দুটোর যে কোনো একটা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা প্রদান সংক্রান্ত দুটো আয়াত নাযিল হবার পর তারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সুখ বেছে নেন। স্ত্রীর সংখ্যা চারজনে সীমিতকরণ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হবার পর রসূল (স.) তাদেরকে পরিত্যাগ করলে সেটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়তো। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং রসূল (স.)-কে চারজনে সীমাবদ্ধতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে ব্যতিক্রমী বিধান জারী করলেন। তাঁর এ যাবত বিয়ে করা সকল স্ত্রীকে তার জন্যে হালাল ও বৈধ করে দিলেন। তারপর একটা আয়াত নাযিল হয়ে তাকে আর কোনো স্ত্রী গ্রহণ না করার কিংবা তাদের কাউকে অন্য কোনো স্ত্রী দ্বারা বদলানো থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হলো। কেননা এই ব্যতিক্রমধর্মী বিধান কেবল মাত্র এই ক'জন মহিলার জন্যেই দেয়া হয়েছে, যাতে তারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সুখ বেছে নেয়ার পর তাদেরকে রসূল (স.) এর সাথে সম্পর্কের সম্মান থেকে বঞ্চিত করা না হয়। সূরা ৫০ নং থেকে ৫২ নং পর্যন্ত তিনটি আয়াতে এ বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

এখানে রসূল (স.)-এর জন্যে যেসব মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যদিও তাদের সংখ্যা চারজনের বেশী। অথচ এরূপ করা তিনি ছাড়া আর সবার জন্যে হারাম। এই সকল মহিলার শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে এভাবে, যাদেরকে তিনি যথারীতি মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছেন, যারা যুদ্ধবন্দীনী হিসাবে তাঁর দাসীতে পরিণত হয়েছিলেন, তাঁর সাথে মক্কা থেকে হিজরত করে আসা চাচাতো, খালাতো, মামাতো ও ফুফাতো বোনেরা-মোহাজের হিসাবে সম্মানের প্রতীক স্বরূপ, যে কোনো মহিলা কোনোরূপ মোহরানা ও অভিভাবক ছাড়া তাঁর স্ত্রী হবার জন্যে নিজেকে পেশ করলে এবং রসূল (স.) তাঁকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হলে তা হবে আরেক শ্রেণী। (সর্বশেষ শ্রেণীর মধ্য থেকে রসূল (স.) কাউকে বিয়ে

করেছেন কিনা, সে ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। বেশীর ভাগ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে সকল মহিলা এভাবে তাঁর স্ত্রী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তাদেরকে তিনি অন্য সাহাবীর সাথে বিয়ে দিয়েছেন।) আল্লাহ তায়ালা এ অধিকারটা একমাত্র রসূল (স.)-এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কেননা তিনি সকল মুসলিম নর-নারীর অভিভাবক। অন্যান্য পুরুষদের কথা আলাদা। তারা তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দিষ্ট বিধান মেনে চলতে বাধ্য। রসূল (স.)-এর জন্যে ব্যতিক্রমী বিধান দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তার স্ত্রীদেরকে যেন স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখতে বাধার সম্মুখীন না হন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে সৃষ্ট বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অসুবিধায় না পড়েন।

এরপর রসূল (স.)-কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, যে সকল মহিলা তাঁর স্ত্রী হবার জন্যে নিজেদেরকে পেশ করেছে। তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তিনি বিয়ে করতে পারেন। সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করতে পারেন কিংবা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন। যাকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তার কাছে আবার তিনি ফিরেও যেতে পারেন। আর স্ত্রীদের মধ্য থেকে যার সাথে তিনি ইচ্ছা করেন সহবাস করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন। আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও করতে পারেন।

'এতে অধিক আশা করা যায় যে, তাদের চোখ জুড়াবে, তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে না এবং তুমি তাদেরকে যা দাও তাতে তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে।'

এভাবে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে যে পরিস্থিতি ও পরিবেশ গড়ে উঠেছে, তার সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার যে আকাংখা তৈরী হয়েছে, তার সাথে সংগতি ও সমন্বয় বিধানের জন্যেই তাঁকে এ ধরনের বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

আর আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমাদের অন্তরে কী আছে এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও সহনশীল।'

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বর্তমান স্ত্রীদের ছাড়া আর কোনো স্ত্রী গ্রহণ করাকে তাঁর জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন। সংখ্যার দিক থেকে নয়, বরং তাদের জায়গায় অন্য কোনো স্ত্রী গ্রহণ করাও চলবে না। এই নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ার আগে রসূল (স.) অতিরিক্ত আর কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেছেন কিনা জানা যায় না। ৫২ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের প্রাক্কালে বাতিল করা হয়েছিলো এবং তাকে বিয়ে করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু রসূল (স.) এই অনুমতি পাওয়ার পরও আর বিয়ে করেননি। তাই উল্লেখিত নয় জনই উম্মুল মোমেনীন হিসাবে বহাল থাকেন।

পর্দার বিধান ও সামাজিক সভ্যতা

এরপর কোরআন নবী গৃহের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অনুরূপভাবে তাঁর স্ত্রী তথা উম্মুল মোমেনীনদের সাথেও তাদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করেছে। এভাবে কোরআন একটা বাস্তব সমস্যার সমাধান করেছে। কেননা সে সময়ে মোনাফেকরা ও বিকারগ্রস্ত লোকেরা রসূল (স.)-কে তাঁর বাড়ীতে ও তাঁর স্ত্রীদের সামনে নানাভাবে উত্যক্ত ও বিব্রত করতো। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। (আয়াত ৫৩ ও ৫৪)।

বোখারী শরীফে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত একটা হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূল (স.) গোশত ও রুটির ভোজের আয়োজন করে আমাকে অন্যান্যদের দাওয়াত দেয়ার জন্যে আমাকে দাওয়াতকারী নিয়োগ করেন। খাওয়া দাওয়া শুরু হলে একটা দল আসে, খাওয়া

দাওয়া করে ও চলে যায়। তারপর আবার অন্য একটা দল আসে, খায়-দায় ও চলে যায়। এরপর ডাকার মতো কাউকে পেলাম না। আমি রসূল (স.)-কে বললাম! ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি এখন আর দাওয়াত দেয়ার মতো কাউকে পাচ্ছি না। রসূল (স.) বললেন, 'তোমরা তোমাদের খাবার তুলে রাখো।' এরপর তিন ব্যক্তি নবীগৃহে বসে গল্পগুজব করতে লাগলো। রসূল (স.) ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আয়েশার কক্ষে গেলেন এবং বললেন, হে গৃহবাসী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু। হযরত আয়েশা বললেন, ওয়ালাইকুমুস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ। ইয়া রসূলাল্লাহ। নতুন স্ত্রীকে আপনার কেমন লাগলো? আল্লাহ তায়ালা আপনার কল্যাণ করুণ। এভাবে তার প্রত্যেক স্ত্রীর কক্ষে দরজায় করাঘাত করলেন, হযরত আয়েশাকে যা বলেছিলেন, প্রত্যেক স্ত্রীকে সে রূপ জবাব দিতে লাগলেন। এরপর রসূল (স.) নিজ গৃহে ফিরে এসে দেখলেন, তখনো সেই তিন ব্যক্তি গল্প-গুজবে মশগুল। রসূল (স.) ছিলেন অতিশয় লাজুক। তিনি আবার হযরত আয়েশার কক্ষে চলে গেলেন। এরপর আমি জানি না হযরত আয়েশা না অন্য কেউ তাকে জানালো যে, যারা আহার সেরে গল্প-গুজবে মশগুল ছিলো তারা চলে গেছে। অতপর রসূল (স.) স্বগৃহে ফিরে এলেন। তিনি যখন তার এক পা দরজার ভেতরে রেখেছেন এবং অপর পা বাইরে-তখনই আমার ও তার মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন। আর তৎক্ষণাত পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল হলো।

এ আয়াতে অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ সংক্রান্ত এমন কিছু নিয়ম-বিধি বর্ণিত হয়েছে, যা জাহেলী যুগের মানুষ জানতো না! এমনকি রসূল (স.)-এর গৃহে প্রবেশেও কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করা হতো না। মালিকের অনুমতি ছাড়াই অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ করতে লোকেরা অভ্যস্ত ছিলো। অনুমতি গ্রহণপূর্বক গৃহে প্রবেশ সংক্রান্ত সূরা নূরের আয়াতের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্ক বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু রসূল (স.)-এর বাড়ী ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিলো, সেহেতু এই অননুমোদিত প্রবেশ নবীগৃহেই বেশী সংঘটিত হতো। ব্যাপারটা শুধু অনুমতি ছাড়া প্রবেশেই সীমিত থাকতো না, বরং কেউ নবীগৃহে প্রবেশের পর যখন দেখতো যে, কোনো খাবার দাবারের আয়োজন চলছে তখন রান্না সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতো, যাতে বিনা দাওয়াতেই ভোজন করা যায়। এভাবে দাওয়াতেই অথবা বিনা দাওয়াতে-খাওয়া দাওয়া সেরেও কেউ কেউ ঠায় বসে থাকতো এবং গল্প গুজবে মশগুল হয়ে যেতো। এতে রসূল (স.) ও তাঁর পরিবার পরিজনের যে অসুবিধা হচ্ছে, সেটা সে একটুও অনুভব করতো না। কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সেই তিন ব্যক্তি যখন খাওয়া-দাওয়ার পর বসে গল্প গুজব করছিলো, তখন রসূল (স.)-এর নব পরিণীতা বধূ হযরত যয়নব বিনতে জাহশ দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। অথচ রসূল (স.) লজ্জায় তাদেরকে বলতে পারছিলেন না যে, তাদের উপস্থিতি তাঁর জন্যে বিব্রতকর হয়ে উঠেছে। তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থীরা অপমানবোধ করে এমন কোনো কথা বলতে তিনি কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে সত্য কথা বললেন। কেননা 'আল্লাহ তায়ালা সত্য বলতে লজ্জা বোধ করেন না।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) স্বীয় স্পর্শকাতর অনুভূতির কারণে রসূল (স.)-কে পর্দার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দিতেন এবং মনে মনে আকাংখা করতেন যে, আল্লাহ তায়ালা পর্দার বিধান নাযিল করলে ভালো হতো। অবশেষে তাঁর এ মানসিকতা ও স্পর্শকাতরতার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল করলেন।

বোখারীর বর্ণনা মতে হযরত আনাস ইবনে মালেক জানান যে, হযরত ওমর (রা.) রসূল (স.)-কে বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কাছে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকারের লোক এসে

থাকে। সুতরাং আপনি যদি উম্মুল মোমেনীনদেরকে পর্দা পালন করার আদেশ দিতেন, তবে ভালো হতো, এর অব্যবহিত পরই পর্দার আয়াত নাযিল হয় ....'

আলোচ্য (৫৩) আয়াতটা মানুষকে শিক্ষা দিতে এসেছে যে, তারা যেন বিনা অনুমতিতে রসূল (স.)-এর বাড়ীতে প্রবেশ না করে। তাদেরকে যদি খাওয়া দাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তারা প্রবেশ করবে। দাওয়াত না দেয়া হলে সেখানে প্রবেশ করে রান্না শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকা উচিত নয়। আর খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেলেই বিদায় হওয়া উচিত। খাওয়ার পর গল্প গুজব করার জন্যে বসে থাকা অনুচিত। আজকের যুগে এ সব নিয়ম-কানুন মেনে চলা মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। আজকাল তারা এসব নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না। ভোজনের দাওয়াতে এসে ভোজন পর্ব শেষ করেও অনেকে বসে গল্প-গুজব ও আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। বাড়ীর লোকেরা যারা কিছু পর্দার বিধান মেনে চলতে চায়, তারা এ অবস্থায় খুবই বিব্রত বোধ করে। অথচ অতিথিরা সেটা অনুভব করে না। ইসলামী সংস্কৃতিতে সব অবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় আচরণ পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। আল্লাহর রচিত এই আচরণবিধি মেনে চললে আমরা ঘরে-বাইরে সব রকমের শান্তি লাভ করতে পারি।

আয়াতের আরেকটা বাক্যে রসূল (স.)-এর স্ত্রীরা ও মুসলিম পুরুষদের মাঝে পর্দা মেনে চলার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

'যখন তোমরা মহিলাদের কাছে কোনো জিনিস চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।' পরে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এই পর্দার বিধানটা নারী পুরুষ সবার জন্যেই অপেক্ষাকৃত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা।

'এ ব্যবস্থাটা তোমাদের মন ও তাদের মনের জন্যে অপেক্ষাকৃত পবিত্র।'

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন, তার উল্টোটা কারো বলা উচিত নয়, কিছু আধুনিক মানুষের মতো কারো বলা উচিত নয় যে, অবাধ মেলামেশা, পর্দা তুলে দেয়া এবং নারী পুরুষের মধ্যে বাক্য বিনিময়, সাক্ষাত বিনিময়, এক সাথে ওঠাবসা ও চলাফেরা করায় মন অপেক্ষাকৃত পবিত্র থাকে, চেপে রাখা যৌন আবেগকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা সহজতর হয় এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে তাদের আবেগ-অনুভূতি হালকা করা ও চাল চলন পরিচ্ছন্ন রাখা সহজতর হয়। একশ্রেণীর অজ্ঞ মূর্খরা এ ধরনের আরো অনেক কথা বলে থাকে।

এ ধরনের কোনো কথাই কারো বলা উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'যখন তোমরা মহিলাদের কাছে কোনো জিনিস চাইবে। তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের মন ও তাদের মনের জন্যে অধিকতর পবিত্র ব্যবস্থা।'

এ কথাটা আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর পবিত্র স্ত্রীর তথা 'উম্মুল মোমেনীনদের' সম্পর্কে বলেছেন। আর বলেছেন প্রথম যুগের সাহাবীদের সম্পর্কে, যাদের বিরুদ্ধে কোনো অশোভন কথা বলার ধৃষ্টতা কেউ দেখাতে পারে না। যখন আল্লাহ তায়ালা এক কথা বলেন এবং আল্লাহর কোনো বান্দা অন্য কথা বলে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং অন্যসব কথা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহর কথার ওপর দিয়ে সেই সব বান্দার কথা বড় করে তুলে ধরার ধৃষ্টতা কেবল তারাই দেখাতে পারে, যারা বলতে পারে যে, মরণশীল বান্দারা মানুষের মন সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর চেয়েও বেশী জ্ঞান রাখে, অথচ তিনি হচ্ছেন সেই চিরঞ্জীব স্রষ্টা। যিনি তাঁর সকল বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন।

উম্মতের জন্যে নবীপত্নীদের হারাম ঘোষণা করা

বাস্তব ঘটনা আল্লাহর বক্তব্যকেই অকাট্য সত্য বলে প্রমাণ করছে এবং আল্লাহর বক্তব্যের বিপরীত যারা দাবী করে তাদের মিথ্যুক সাব্যস্ত করছে। এ যুগের এবং এ দুনিয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা যা বলছি, সেটাকেই মিথ্যা প্রমাণ করে। বিশেষত যেসব দেশে অবাধ মেলামেশা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, সেখানকার অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে অকাট্য কিছু প্রমাণ বহন করে।(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিনা দাওয়াতে তাদের আগমন, খাদ্য তৈরী হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকা এবং খাওয়ার পর গল্প গুজবে মত্ত হওয়া রসূল (স.)-এর জন্যে কষ্টদায়ক ও বিব্রতকর। অথচ তিনি তাদেরকে সেখান থেকে চলে যেতে বলতেও লজ্জা পান। আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়ার কোনো অধিকার মুসলমানদের নেই, অনুরূপভাবে তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করার অধিকারও কারো নেই। কেননা তারা তাদের মায়ের সমান। রসূল (স.)-এর কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে এবং তার পরিবারের বিশেষ সম্মানের কারণে রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর তাদেরকে বিয়ে করা চিরতরে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার স্ত্রীকে তার পরে বিয়ে করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই।'

কথিত আছে যে, কোনো কোনো মোনাফেক নাকি হযরত আয়েশাকে বিয়ে করার অপেক্ষায় ছিলো,

'নিশ্চয় এটা আল্লাহর তায়ালার কাছে একটা গুরুতর ব্যাপার।'

বস্তুত আল্লাহর কাছে যা গুরুতর, তার চেয়ে ভয়ংকর জিনিস আর কিছু হতে পারে না। আয়াতে শুধু এই হুমকি দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকা হয়নি বরং আরো একটা কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে,

'তোমরা যদি তা গোপন করো বা প্রকাশ করো, তবে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই সবকিছুর নিয়ন্তা। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুর খবর তিনি জানেন। সকল চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কেই তিনি অবগত। রসূল (স.)-কে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারটা তাঁর কাছে অবশ্যই গুরুতর। যদি কেউ এরপরও কষ্ট দিতে চায় তবে দিক, সে আল্লাহর ভয়াবহ ও সর্বনাশা আযাব ভোগ করতে বাধ্য হবে।

এই হুমকি ও হুশিয়ারীর পর সেই সব বিবাহ-নিষিদ্ধ পুরুষের বিবরণ দেয়া হচ্ছে, যাদের সামনে পর্দা করা রসূলের (স.) স্ত্রীদের জন্যে জরুরী নয়।

৫৫ নং আয়াতে বর্ণিত এইসব পুরুষের সাথে বিয়ে চিরতরে নিষিদ্ধ বিধায় তাদের সামনে বের হওয়া সাধারণভাবে সকল মুসলমান নারীর জন্যে বৈধ। এ ব্যাপারে কোরআনে দুটো আয়াত রয়েছে। একটা এখানে এবং তা বিশেষভাবে রসূলের (স.) স্ত্রীদের জন্যে। অপরটা সূরা 'নূর'-এ এবং সেটা সকল মুসলিম নারীর জন্যে। এই দুটো আয়াতের কোনটা প্রথমে নাযিল হয়েছে আমি সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তবে ব্যাপারটা যে প্রথমে রসূলের স্ত্রীদের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিলো এবং পরে সকল মুসলিম নারীর ওপর প্রযোজ্য হয়েছে, সেটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কেননা শরীয়তের কোনো বিধান প্রবর্তন বা প্রচলনে এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত ব্যবস্থার।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ ও আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে অবগত আছেন বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কেননা এ ধরনের ক্ষেত্রে আল্লাহকে

---

(১) আমার লেখা 'ইসলাম ও বিশ্বশান্তির 'পারিবারিক শান্তি' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন।

ভয় করা ও আল্লাহর উপস্থিতির কথা স্মরণ রাখা অত্যন্ত জরুরী। কারণ আল্লাহর ভয়ই সবকিছুর ব্যাপারে প্রথম ও শেষ গ্যারান্টি এবং এটাই মানুষের মনের ওপর একমাত্র সদাজাগ্রত প্রহরী।

যারা রসূল (স.) ও তার পরিবার-পরিজনকে নানাভাবে কষ্ট দেয় ও উত্যক্ত করে, তাদেরকে পরবর্তী দুটো আয়াতেও সতর্ক করা তাদের এই নিন্দনীয় কাজকে একটা ভয়ংকর কাজ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এ জন্যে প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর উচ্চতর পারিষদবর্গের সামনে রসূল (স.) এর জন্যে অত্যন্ত উচ্চমর্যাদা ও সম্মানিত স্থান রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলকে উত্যক্ত করা স্বয়ং আল্লাহকে উত্যক্ত করার শামিল এবং আল্লাহর কাছে তার শাস্তি হলো দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং লাঞ্ছনাকর আযাব।

৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রসূল (স.)-এর ওপর দরূদ পাঠের উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো তার উচ্চতর পারিষদবর্গের সামনে তিনি তাঁর প্রশংসা করেন। আর তাঁর ফেরেশতাদের দরূদ পাঠ করার যে উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ হলো, তারা তাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। ভাবতে অবাক লাগে, রসূল (স.)-এর মর্যাদা কত উঁচু যে, স্বয়ং মহান আল্লাহ তাঁর নবীর যে প্রশংসা করেন, তা-ই সমগ্র সৃষ্টিজগত কর্তৃক প্রতিধ্বনিত হয় এবং তা সমগ্র সৃষ্টিজগতে চিরদিনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর পর সম্মান ও অনুগ্রহের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এরপর মানুষ যা কিছু দরূদ ও সালাম পাঠায়, তা আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাদের দরূদ ও সালামের পর নিতান্তই গৌণ হয়ে যায়। এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা এটাই চান যে, মোমেনরা তাদের দরূদ ও সালামকে আল্লাহর দরূদ ও সালামের সাথে যুক্ত করে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করুক এবং এভাবে তারা মহান আল্লাহর শাশ্বত, চিরন্তন ও উচ্চ মার্গের সাথে যুক্ত হোক।

স্বয়ং মহান আল্লাহ যখন জাঁকজমকের সাথে রসূল (স.)-এর প্রশংসা করেন, তখন একশ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে রসূল (স.)-কে কষ্ট দেয়া ও উত্যক্ত করা যে কত ঘৃণ্য, ধিক্কারযোগ্য, নিন্দনীয় ও অভিশাপযোগ্য কাজ তা বর্ণনা করা হয়েছে ৫৭ নং আয়াতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে উত্যক্ত করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিসম্পাত দেবেন ......।'

রসূলকে (স.) উত্যক্ত করার কাজটা আরো বেশী ঘৃণীত ও ধিকৃত হয় এ জন্যে যে, তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেই তাঁর বান্দা ও সৃষ্টির পক্ষ থেকে উত্যক্ত করার শামিল। মানুষ যদিও আল্লাহ তায়ালাকে উত্যক্ত করতে সক্ষম হয় না, কিন্তু এ কথা দ্বারা রসূলকে উত্যক্তকরণ কতো স্পর্শকাতর, সেটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেন এটা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেই উত্যক্ত করার শামিল। তাহলে ভেবে দেখা দরকার যে, কাজটা কত ভয়াবহ, কত জঘন্য ও কত নিকৃষ্ট!

এরপর সাধারণভাবে মুসলিম নর-নারীকে উত্যক্তকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাদেরকে এমন দোষের জন্যে দায়ী করা হয়, যা তারা করে না। ৫৮ নং আয়াত দেখুন।

এই কঠোর সমালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে মদীনায় একশ্রেণীর লোক মুসলিম নরনারীর বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। তাদের সম্পর্কে কুৎসা ও অপবাদ রটাতো এবং নানা রকম ফন্দি আঁটতো। এ ব্যাপারটা সকল যুগে ও সকল স্থানেই ঘটে থাকে। বিকৃত ও গর্হিত রুচি সম্পন্ন মোনাফেক ও দুষ্কৃতকারীদের এসব দুরভিসন্ধীর কবলে পড়ে মুসলিম নর-নারী সর্বত্রই হেস্তনেস্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদের দুরভিসন্ধীর জবাব দেন এবং তাদের অপবাদ খন্ডন করেন। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী।

সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীদের পরিচয়

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁর স্ত্রী-কন্যাদেরকে প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে যাওয়ার সময় সমস্ত শরীর, মাথা ও বুকের খোলা অংশ আচ্ছাদিত করার আদেশ দেন। সর্বাংগ আচ্ছাদনকারী একটা 'জিলবাব' বা চাদর দ্বারা শরীরটাকে ঢেকে নিতে হবে। এ পোশাক তাদেরকে অন্যান্য নারীদের মধ্য থেকে আলাদা বৈশিষ্ট এনে দেবে এবং দুষ্কৃতকারী ও বখাটে লোকদের উত্যক্তি থেকে রক্ষা করবে। কোনো মহিলাদেরকে উত্যক্তকারী বখাটেরা আপাদমস্তক আবৃত মহিলাদেরকে দেখে তাদেরকে আল্লাহভীরু নারী হিসাবে চিনতে পেরে লজ্জা ও সংকোচ বোধ করে ও সংযত আচরণ করে। ৫৯ নং আয়াতে জিলবাব পরিধানের এ আদেশটা লক্ষণীয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী বলেছেন, মদীনার কিছু পাপাচারী বখাটে লোক রাতের আঁধার নেমে এলেই মদীনার অলি গলিতে বেরিয়ে পড়তো এবং মেয়েদের খোঁজ করতো। মদীনা ছিলো ঘন বসতিপূর্ণ। তাই রাত হলে মহিলারা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে বেরুতো। আর পাপাচারী বখাটে এই সুযোগেরই অপেক্ষায় থাকতো। তবে কোনো মহিলাকে চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত দেখলে তারা বলতো যে, 'এতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা।' কাজেই তার ব্যাপারে সংযত থাকতো। আর যখন দেখতো কেউ চাদর দিয়ে শরীর না ঢেকেই বেরিয়েছে, তখন তারা বলতো যে, এতো দাসী বাঁদী বা নিম্নস্তরের মহিলা।' এই বলেই তার ওপর আক্রমণ চালাতো।

মোজাহেদ বলেছেন, জিলবাব বা চাদর পরিধানের আদেশ দেয়া হয়েছে এ জন্যে যেন বুঝা যায় তারা স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। ফলে কোনো অপরাধপ্রবণ লোক তাদের কোনোভাবে উত্যক্ত করতে চেষ্টা করবে না। আর 'আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু' এ কথার অর্থ হলো, অজ্ঞতাবশত জাহেলী যুগে যেসব অন্যায় কাজ করা হয়েছে, তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন।'

এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আরবের সামাজিক পরিবেশকে পবিত্র করার জন্যে যে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, ফেতনা ফাসাদ ও নৈরাজ্য দূর করার জন্যে যে ক্রমাগত বিধি-নিষেধ জারী করা হচ্ছিলো এবং যাবতীয় বিশৃংখলা ও দুর্নীতিকে সংকীর্ণতম গন্ডীতে সীমিত করার জন্যে যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছিলো, এ সবকিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো গোটা মুসলিম সমাজের ওপর ইসলামী নিয়ম বিধি ও ঐতিহ্যের নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে মোনাফেক, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও বিকৃত রুচিসম্পন্ন সেইসব লোকের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যারা মুসলিম সমাজে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নানারকম গুজব রটাতো। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি দেয়া হয়েছে যে, তারা যদি তাদের যাবতীয় অপতৎপরতা থেকে এবং মুসলিম নরনারীকে ও সমগ্র মুসলিম সমাজকে উৎপীড়ন ও উত্যক্ত করা থেকে বিরত না হয়, তা হলে ইহুদীদের মতো তাদেরকেও মদীনা থেকে উচ্ছেদ করা হবে এবং তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, হত্যা করা হবে। কেননা ইতিপূর্বে রসূল (স.)-এর হাতে ইহুদীদেরকে এবং পূর্ববর্তীকালে অন্যান্য অপরাধী ও দুষ্কৃতকারীদেরকে সমাজ থেকে উৎখাত করা আল্লাহর স্থায়ী রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। ৬০, ৬১ ও ৬২ নং আয়াতে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

এ তিনটি আয়াতের কঠোর হুমকি থেকে আমরা বুঝতে পারি, বনু কোরায়যার উচ্ছেদের পর মদীনায় মুসলিম শক্তি কতো জোরদার এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কতো প্রবল হয়ে উঠেছিলো। এ থেকে আমরা এটাও বুঝতে পারি যে, গোপন ষড়যন্ত্র করা ছাড়া মোনাফেকদের আর কোনো কার্যকর ক্ষমতা ছিলো না। তারা নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষের মতো ছাড়া প্রকাশ্যে মুসলমানদের সামনেও আসতে সাহস পেতো না।

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ، قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ، وَمَا يُدْرِيْكَ

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ، لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ

فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوْا رَبَّنَآ

اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ

الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا

كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ، وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ

৬৩. মানুষরা তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি (তাদের) বলো, তার জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে; (হে নবী,) তুমি এ বিষয়টি কি করে জানবে? সম্ভবত কেয়ামত খুব নিকটেই (এসে গেছে)! ৬৪. তবে (কেয়ামত যখনই আসুক) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের ওপর (আগেই) অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের শাস্তির জন্যে প্রজ্বলিত আগুনের শিখাও প্রস্তুত করে রেখেছেন, ৬৫. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, (সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে) তারা কোনো রকম অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না, ৬৬. সেদিন তাদের (চেহারাসমূহ) ওলট পালট করে (প্রজ্বলিত) আগুনে রাখা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়, (কতো ভালো হতো) যদি আমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করে আসতাম। ৬৭. তারা (সেদিন আরো) বলবে, হে আমাদের মালিক, (দুনিয়ার জীবনে) আমরা আমাদের নেতা ও বড়োদের কথাই মেনে চলেছি, তারাই আমাদের তোমার পথ থেকে গোমরাহ করেছে। ৬৮. হে আমাদের মালিক, ওদের তুমি (আজ) দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর বড়ো রকমের অভিশাপ পাঠাও।

রুকু ৯

৬৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (অর্থহীন অপবাদ দিয়ে) মূসাকে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সেসব কিছু থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন, যা তারা (তার বিরুদ্ধে) রটনা করেছে, সে ছিলো আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে বড়ো মর্যাদাবান ব্যক্তি; ৭০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (সর্বদা) সত্য কথা বলো, ৭১. (তাহলে) তিনি তোমাদের জীবনের কর্মকান্ড শুধরে দেবেন এবং

أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য লাভ করবে। ৭২. অবশ্যই আমি (কোরআনের এ) আমানত (এক সময়) আসমানসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম, তারা একে বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, সবাই এতে ভীত হয়ে গেলো, অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিলো; নিসন্দেহে সে (মানুষ) একান্ত যালেম ও (এ আমানত বহন করার পরিণাম সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ। ৭৩. আল্লাহ তায়ালা মোনাফেক পুরুষ, মোনাফেক নারী, মোশরেক পুরুষ, মোশরেক নারীদের (এ আমানতের দায়িত্বে অবহেলার জন্যে) কঠোর শাস্তি দেবেন এবং মোমেন পুরুষ মোমেন নারীদের ওপর (আমানতের দায়িত্ব পালনে ভুল ক্রটির জন্যে) ক্ষমাপরবশ হবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

তাফসীর
আয়াত ৬৩-৭৩

সূরার এই সর্বশেষ অধ্যায়টাতে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে, তার ভেতরে রয়েছে একশ্রেণীর লোকের 'কেয়ামত কবে হবে' এই প্রশ্ন, কেয়ামতকে তাড়াতাড়ি সংঘটিত করার আবদার এবং কেয়ামত আদৌ হবে কিনা, সে ব্যাপারে তাদের সংশয় প্রকাশ। এসব প্রশ্নের জবাব এখানে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ ধরনের প্রশ্ন তোলা থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে এবং যে কোনো সময় আকস্মিকভাবে কেয়ামতের আগমন ঘটতে পারে বলে সাবধান করা হয়েছে। এরপর কেয়ামতের কিছু কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। কেয়ামতের জন্যে যারা তাড়াহুড়া করে, তাদের জন্যে এ দৃশ্য আনন্দদায়ক নয়। সেদিন তাদের মুখ দোযখের ভেতরে উল্টে দেয়া হবে। সেদিন তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য না করার জন্যে অনুশোচনা করবে। সেদিন তারা তাদের নেতা ও মুরব্বীদের জন্যে দ্বিগুণ আযাবের দাবী জানাবে। এসব দৃশ্য আতংক ও ত্রাস সৃষ্টি করে। এ সব দৃশ্য দেখার পর কেউ কেয়ামতের জন্যে তাড়াহুড়ো করতে পারে না। আখেরাতের এই দৃশ্য বর্ণনার পর পুনরায় দুনিয়ার দৃশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানরা যেন হযরত মূসার জাতির মতো না হয়, যারা তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিলো। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের অপবাদ খন্ডন করলেন। মনে হয়, এটা একটা বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিলো। সম্ভবত, আরবের প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করে রসূল (স.) কর্তৃক যয়নবকে বিয়ে করা নিয়ে কিছু কিছু লোক কানাঘুষা করেছিলো। সেই কানাঘুষা প্রত্যাখ্যান করে মুসলমানদেরকে কোনো অপবাদ ও অপপ্রচারে লিপ্ত না হয়ে সহজ সরল ও সাদাসিধে কথা বলার

আদেশ দেয়া হয়েছে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৎ কাজগুলোকে পরিশুদ্ধ করে কবুল করে নেবেন, তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম পালনকে তাদের কাছে প্রিয় করে দেবেন এবং সে জন্যে তাদেরকে বিপুল সাফল্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অতপর একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে সূরার উপসংহার টানা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষ এমন একটা আমানত বহন করেছে, যা বহন করতে আকাশ পৃথিবী ও পাহাড় পর্বত সাহস পায়নি। এটা একটা বিরাট, ভয়াবহ ও ঝুঁকিপূর্ণ আমানত। এর উদ্দেশ্য ছিলো যে, কর্ম অনুযায়ী কর্মফল দানে এবং মানুষ নিজের জন্যে স্বেচ্ছায় যা গ্রহণ করে, সে অনুসারে তার হিসাব গ্রহণে আল্লাহ তায়ালা বিধিব্যবস্থা যেন কার্যকরী হয়। (আয়াত ৭৩)

কাফেরদের ধৃষ্টতা ও তাদের অনুসরণের পরিণতি

'লোকেরা তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ......' (আয়াত ৬৩)

কেয়ামত সম্পর্কে রসূল (স.) মোশরেকদের অনেক আগেই বিশদভাবে জানিয়েছেন, তাদেরকে অনেক সতর্ক করেছেন এবং কোরআনে তার বিভিন্ন দৃশ্য এমনভাবে বর্ণনা করেছে যে, তার পাঠকদের কাছে মনে হয় যেন তারা তাকে চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছে। তাই মোশরেকেরা কেয়ামত সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করতো না। জিজ্ঞেস করতো কেয়ামত কবে হবে এবং আবদার করতো যে সেটা তাড়াতাড়ি ঘটানো হোক। এই তাড়াতাড়ি ঘটানোর আবদার থেকে তারা প্রকারান্তরে বুঝাতো, তারা কেয়ামত নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে,তা অবিশ্বাস করে অথবা তা নিয়ে উপহাস করে। যারা প্রশ্ন করতো, তাদের ঈমান থেকে দূরত্ব, বা নৈকট্যের অনুপাত অনুসারেই এগুলো হতো।

কেয়ামত আসলে একটা অদৃশ্য বা গায়েবী বিষয়, যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই রাখেন। এ সংক্রান্ত জ্ঞান তিনি তার সৃষ্টি জগতের কাউকেই দিতে চাননি। এমনকি নবী রসূল ও ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাদেরকেও নয়। ঈমান ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ সম্পর্কে এক হাদীসে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব বলেন, 'একবার আমরা রসূল (স.)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা আমাদের কাছে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলো। তার পোশাক একেবারে ধবধবে সাদা এবং তার চুল কুচকুচে কালো। তার ভেতরে সফরের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না। অথচ আমাদের কেউ তাকে চিনেও না। লোকটি রসূল (স.)-এর কাছে এসে বসলো। রসূল (স.)-এর হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগিয়ে এবং নিজের দুই উরুর ওপর হাত রেখে সে বসলো। তারপর বললো, হে মোহাম্মদ! আমাকে বলুন, ইসলাম কী' রসূল (স.) বললেন, ইসলাম হচ্ছে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল, আর নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা ও হজ্জের পথ খরচ সংকুলান হলে হজ্ব করা। আগন্তুক বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন।' আমরা অবাক হলাম যে, আগন্তুক তাঁকে জিজ্ঞেসও করছে, আবার তাঁর কথার বিশুদ্ধতারও সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সে বললো, বেশ, এবার আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে? রসূল (স.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরশতাকুলের, তাঁর কেতাবসমূহ, তাঁর সকল রসূল, আখেরাত এবং ভাগ্য ভালো মন্দ যাই হোক-এগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আগন্তুক বললো, আপনি ঠিক বলেছেন। তারপর বললো, এখন আমাকে বলুন, এহসান কী? রসূল (স.) বললেন, এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করা যেন এবাদতকারী তাকে দেখতে পাচ্ছে। আর যদি সে তাকে দেখতে নাও পায়, তবে অন্তত

এতোটুকু অনুভব করা যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই দেখতে পান। সে বললো, তাহলে আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রসূল (স.) বললেন, এ কথা যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না।.......' এরপর রসূল (স.) বললেন, এই ব্যক্তি ছিলো জিবরাঈল। তোমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।' (মুসলিম , আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

এখানে প্রশ্নকারী জিবরাঈল (আ.)-এবং যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি রসূল (স.)। দু'জনের কেউই কেয়ামত কবে হবে তা জানেন না। 'তুমি বলো, তার জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই আছে।' অর্থাৎ আল্লাহর কোনো বান্দাই এ সম্পর্কে অবহিত নয়।

যে মহৎ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থা করেছেন তা শুধু তিনিই জানেন। আমরা কেবল এর অংশ বিশেষ অনুমান করতে পারি। যেমন, মানুষকে সব সময় কেয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত ও সতর্ক রাখা এবং যে কোনো সময় তা ঘটে যেতে পারে ভেবে সে যাতে তার জন্যে প্রস্তুত থাকে, তার পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা। অবশ্য মহান আল্লাহ যার মংগল কামনা করেন এবং যার অন্তরে আল্লাহভীতি সঞ্চিত রেখেছেন, একমাত্র তারাই এ ব্যবস্থা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। পক্ষান্তরে যারা কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন থাকে এবং প্রতি মুহূর্তে কেয়ামতের মুখোমুখী হবার জন্যে প্রস্তুত থাকে না, তারা নিজেদের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কেয়ামত সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করেছেন এবং কেয়ামতকে এমন একটা অজানা ঘটনা হিসেবে সংরক্ষণ করেছেন, যা দিন ও রাতের যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এ জন্যে বলেছেন,

'তুমি জানো না যে, কেয়ামত হয়তো নিকটবর্তী এসে গেছে।' (আয়াত ৬৩)

'নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের ওপর অভিসম্পাত দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন' .... (আয়াত ৬৪-৬৮)

কাফেররা কেয়ামত সম্পর্কে যে বিবিধ প্রশ্ন করে, তার জবাবে বলা হচ্ছে যে, কেয়ামতের কিছু কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে,

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন জ্বলন্ত দাউ দাউ করা আগুন। সেই জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত ও উপস্থিত রাখা হয়েছে।

'ওরা সেখানে চিরদিন থাকবে।'

অর্থাৎ দীর্ঘকাল অবস্থান করবে। কতো দীর্ঘ, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তার শেষ কোথায় তা শুধু আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং তাঁর ইচ্ছা দ্বারাই তা নিয়ন্ত্রিত। তারা সকল সাহায্য ও সাহায্যকারী থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন। কাজেই এই জ্বলন্ত আগুন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোনো আশা নেই। বলা হয়েছে,

'তারা কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না।'

এরপর আসছে সেই জ্বলন্ত আগুনে কিভাবে আযাব দেয়া হবে তার মর্মান্তিক বিবরণ,

'যেদিন আগুনের মধ্যে তাদের মুখ উল্টো করে রাখা হবে।'

অর্থাৎ আগুন তাকে সর্বদিক থেকে ঘিরে ধরবে, এই বাচনভংগী দ্বারা আগুনের ভেতরে আযাবের পন্থা ও প্রক্রিয়ার ছবি অংকন করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্যে আগুন যেনো তাদের মুখমন্ডলের সকল পাশ দিয়ে দগ্ধীভূত করতে চাইবে।

'তারা তখন বলতে থাকবে, হায় আক্ষেপ, আমরা যদি দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্য ও রসূলের আনুগত্য করতাম।'

এটা অবশ্য ব্যর্থ অনুশোচনা! তখন এর আর কোনো অর্থ থাকবে না এবং কেউ তা গ্রহণও করবে না। কেননা অনুশোচনার সময় ফুরিয়ে গেছে। এটা হবে শুধু অতীত নিয়ে আক্ষেপ মাত্র!

এরপর তাদের ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটবে তাদের নেতাদের ও সমাজপতিদের ওপর যারা তাদেরকে বিপথগামী করেছে, তখন তারা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হবে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না।

'তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তো আমাদের নেতা ও সমাজপতিদের আনুগত্য করতাম, তারা আমাদেরকে বিপথগামী করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে দ্বিগুন আযাব দাও এবং তাদের ওপর মহা অভিশাপ বর্ষণ করো।'

এই হচ্ছে কেয়ামত। এটা নিয়ে কিসের এতো প্রশ্ন? সেখানে এ ধরনের অভিশপ্ত পরিণতি থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে সেইটে নিয়েই ভাবা উচিত। হাঁ, এই উদ্ধার পাওয়া যাবে একমাত্র সৎ কাজ দ্বারা।

যদিও যায়নব বিনতে জাহশের সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ে করা দ্বারা ইসলাম জাহেলী যুগের প্রচলিত প্রথাকে বাতিল করতে চেয়েছিলো, কিন্তু মনে হয় এই বিয়েটা সে সমাজে সহজে মেনে নেয়া হয়নি। বহু সংখ্যক মোনাফেক, মনোব্যাধিগ্রস্ত ও নড়চড়ে ঈমানধারী যাদের কাছে ইসলামের সহজ সরল আইনগত বিধান স্বচ্ছ ও বোধগম্য ছিলো না, তারা নানারকম গোপন ও প্রকাশ্য অপপ্রচার, বাদ-প্রতিবাদ, কানাঘুষা ও জঘন্য ধরনের অপবাদ রটানোর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো।

মোনাফেকদের কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার নির্দেশ

মোনাফেক ও সুযোগ সন্ধানীরা কখনো চুপ থাকতো না। তারা তাদের বিষাক্ত অপপ্রচারের বিস্তার ঘটানোর কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতো না। খন্দকের যুদ্ধে, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনায়, দখলীকৃত ভূ-সম্পত্তি বন্টনে এবং অন্যান্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, তারা রসূল (স.)-কে কষ্ট দেয়া ও উত্যক্ত করার প্রতিটা সুযোগই গ্রহণ করেছে।

এ সময় বনু কোরায়যাসহ সমুদয় ইহুদী গোষ্ঠীকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। তাই মদীনায় এমন কেউ অবশিষ্ট ছিলো না যে, প্রকাশ্যে কুফরিতে লিপ্ত ছিলো। মদীনার সকল অধিবাসীই তখন মুসলমান হয়ে গেছে। কেউবা একনিষ্ঠ মুসলিম, কেউবা বর্ণচোরা ও ভন্ড মুসলমান তথা মোনাফেক। মোনাফেকরাই গুজব রটাতো ও মিথ্যে প্রচারণায় লিপ্ত হতো। কিন্তু কোনো কোনো মুসলমান তাদের চাতুর্যপূর্ণ অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের গুজবে বিশ্বাস করতো। কোরআন তাদেরকে সতর্ক করে বললো যে, বনী ইসরাঈল যেমন তাদের নবী হযরত মূসাকে উত্যক্ত করতো, তোমরা তেমনি রসূল (স.)-কে উত্যক্ত করো না। বরং সহজ সরল ও সত্য কথা বলো এবং কোনোরকম অপবাদ আরোপ করো না। সব সময় আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে থাকো, এতেই চূড়ান্ত সাফল্য নিহিত রয়েছে। (আয়াত ৬৯, ৭০ ও ৭১)

হযরত মূসাকে উত্যক্ত করার ধরণ কী ছিলো, সেটা কোরআন ব্যাখ্যা করেনি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে কোরআন যে বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছে, আমি তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আল্লাহ তায়ালা যা বুঝাতে চেয়েছেন

তা শুধু এতটুকুই যে, রসূল (স.) যেসব ব্যবহারে কষ্ট পান, তার সবকিছু থেকেই যেনো মুসলমানরা দূরে থাকে ও সাবধান থাকে। কোরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈল জাতির বিপথগামিতা ও বিকৃতিকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। কাজেই তাদের নবীদেরকে তারা যে উত্যক্ত করেছে, সে ব্যাপারে শুধু ইশারা দেয়া এবং তাদের অনুকরণ থেকে মুসলমানদের সতর্ক করাই যথেষ্ট। এতেই প্রত্যেক মুসলমানের চেতনা ও অনুভূতিতে এই পথভ্রষ্টদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে দেয়া সম্ভব, যাদেরকে কোরআন বিভ্রান্তি ও বিকৃতির উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে!

'হযরত মূসার বিরুদ্ধে তার জাতি যে অপবাদ রটিয়েছিলো, তা থেকে আল্লাহ তায়ালা তাকে মুক্ত করেছিলেন।

'তিনি আল্লাহর কাছে সম্মানিত ছিলেন।'

আল্লাহ তায়ালা তার সকল নবীকেই মিথ্যা অপবাদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে থাকেন। আর মোহাম্মদ (স.) তো শ্রেষ্ঠ রসূল। কাজেই তাকে যে, আল্লাহ তায়ালা অপবাদ থেকে অব্যাহতি দেবেন, এটা অবধারিত।

কোরআন মুসলমানদেরকে সহজ সরল, ভালো ও সঠিক কথা বলা এবং কথার উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও তাৎপর্য বুঝার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে তারা মোনাফেক ও পথভ্রষ্টদের ছড়ানো গুজবে কান দিয়ে আপন নবী, পথ প্রদর্শক ও নেতা সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত না হয়। কোরআন তাদেরকে ভালো কথা বলার নির্দেশ দিয়েছে, যা ভালো কাজের দিকে চালিত করে। কেননা যারা ভালো ও সত্য কথা বলে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কার্যকলাপকে সংশোধন করে তার প্রতিদান দেন। আর যারা ভালো কথা বলে ও ভালো কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সেই সব গুনাহ মাফ করে দেন, যা থেকে সাধারণভাবে কোনো মানুষই রক্ষা পায় না এবং একমাত্র ক্ষমা ছাড়া তা থেকে রেহাই পায় না।

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে বিরাট সাফল্য লাভ করে।'

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য মূলত একটা বিরাট সাফল্য। কেননা আল্লাহর বিধান মেনে চলার ওপর দৃঢ়তা দেখানোর নামই আনুগত্য। এই দৃঢ়তা হৃদয়ে শান্তি ও পরিতৃপ্তি আনে। আল্লাহর সোজা ও সঠিক পথে চলা মূলতই একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার, এর জন্যে কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান পাওয়া যাক বা না যাক। যে ব্যক্তি আল্লাহর সরল সঠিক ও আলোকিত পথে চলে, তার আশপাশে বিরাজমান আল্লাহর সকল সৃষ্টি তার সাথে সহযোগিতা করে। আর যে ব্যক্তি বক্রপথে ও অন্ধকার পথে চলে, তার চারপাশে বিরাজমান সকল সৃষ্টি তার শত্রু হয়ে যায়, তার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয় ও তার বিরোধিতা করে। সুতরাং এ দুটো সমান নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য নিজেই নিজের পুরস্কার। তাই কেয়ামতের পূর্বে ও বেহেশতের নেয়ামত লাভের আগে এটাই একটা বিরাট সাফল্য। আখেরাতের পুরস্কার হচ্ছে আনুগত্যের একটা বাড়তি প্রতিদান। ওটা আল্লাহর এক পরম দান, যা কোনো কিছুর বিনিময়ে দেয়া হয় না। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন বিনা হিসাবে দান করেন।

মানুষ যে মহান দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছে

সম্ভবত মানুষের সহজাত দুর্বলতা, তদুপরি তার সেই গুরুদায়িত্ব, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বত পর্যন্ত সাহস করেনি, যা সে নিজের হাজারো রকমের আবেগ, অনুভূতি, রিপু ও প্রবৃত্তির তাড়না, জ্ঞানের স্বল্পতা, আয়ুষ্কালের স্বল্পতা, স্থানগত ও কালগত বাধা-বিপত্তি এবং এই সব বাধা-বিপত্তির ওপারে কী আছে, তা সম্পূর্ণরূপে না জেনেই নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে। এসব দেখেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি এতোবড় অনুগ্রহ করেছেন ও এতোবড় সাফল্য দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতের সামনে আমানত বা গুরুদায়িত্ব রেখেছিলাম। তারা সবাই এ গুরুদায়িত্ব বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং মানুষ তা বহন করেছে।..' (আয়াত ৭১)

আল কোরআন অন্যান্য সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বত এই কটা সৃষ্টিকে বাছাই করার কথা উল্লেখ করেছে। কারণ এগুলো এতো বড়ো যে, মানুষ এগুলোর ভেতরে বা আশেপাশে বাস করে এবং এ গুলোর তুলনায় মানুষকে খুবই ছোট ও নগণ্য মনে হয়। এসব বড়ো বড়ো সৃষ্টি তাদের স্রষ্টাকে বিনা চেষ্টাতেই চেনে এবং তাঁর সেই সব নিয়ম-কানুনের আনুগত্য করে, যা তার ওপর সৃষ্টিগত প্রক্রিয়াতেই চালু হয়, এরা মহান স্রষ্টার নিয়ম-কানুন ও প্রাকৃতিক বিধিকে সরাসরি ও কোনো চিন্তা পরিকল্পনা বা মাধ্যম ছাড়াই মেনে চলে। এই নিয়ম কানুন-অনুসারে তারা নিজ কর্তব্য পালন করে এবং এক মুহূর্তের জন্যে তার বিরুদ্ধাচরণ করে না বা শৈথিল্য দেখায় না। তারা কোনো ইচ্ছা বা অনুভূতি ছাড়াই তাদের স্বভাব প্রকৃতি অনুসারেই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে।

সূর্য তার জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিয়মিত আবর্তন সম্পন্ন করে এবং তাতে কখনো ত্রুটি করে না। আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে যে দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন, সে অনুসারে সে তার উত্তাপ বিকিরণ করে এবং তার গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রাখে। এভাবে সে তার মহাজাগতিক দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করে।

পৃথিবী তার কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে, ফসল ফলায়, তার অধিবাসীদের খাদ্য যোগায়, মৃতদের লাশ নিজের বুকে ধারণ করে এবং নদ-নদী ও জলাশয়গুলোর জন্ম দেয়। এসব দায়িত্ব পালনে তার ইচ্ছার কোনো ভূমিকা নেই, আল্লাহর বিধান অনুসারেই সে এসব কাজ করে।

চাঁদ-তারা ও গ্রহ-উপগ্রহ, বাতাস, মেঘ, জলবায়ু, পানি, পাহাড়-পর্বত, আর্দ্রতা- এই সবকিছুই মহান আল্লাহর হুকুমে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। তারা তাদের স্রষ্টাকে চেনে এবং তার ইচ্ছামতো চলে। অথচ এ জন্যে তার কোনো চেষ্টা বা কষ্ট করতে হয় না। কিন্তু তারা একটা বিশেষ দায়িত্ব বহনে ভয় পেয়ে গেলো। সে দায়িত্বটা হলো ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের দায়িত্ব, ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত চেষ্টা সাধনার দায়িত্ব।

'মানুষ সে দায়িত্ব বহন করলো।'

মানুষ সচেতনভাবে আল্লাহ তায়ালাকে চেনে ও জানে। সে তাঁর নিয়ম কানুনের আনুগত্য করে আপন প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও বোধশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। আর এই নিয়মবিধি অনুসারে সে কাজ করে নিজস্ব চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে। নিজ ইচ্ছা অনুসারে, নিজ প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে, বিপথগামিতার প্রবণতা প্রতিরোধের মাধ্যমে এবং প্রবৃত্তির খেয়াল খুশী নিয়ন্ত্রণ ও সংযমের মাধ্যমে সে আল্লাহর আনুগত্য করে। এই সব পদক্ষেপে সে নিজের ইচ্ছাকে কাজে লাগায়, নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে এবং কোনো পথ তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা জেনে বুঝেই একটা পথ অনুসর করে।

এটা একটা বিরাট গুরুদায়িত্ব, যা এই ক্ষুদ্র, সীমিত শক্তিসম্পন্ন সীমিত আয়ুষ্কালসম্পন্ন এবং রকমারি লোভ-লালসা, প্রবণতা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সাথে যুদ্ধরত জীব-মানুষ গ্রহণ করেছে।

সে ভারী বোঝা নিজের কাঁধে চড়িয়ে এক দুঃসাহসিক কাজ করেছে। এজন্যে বলা হয়েছে যে, 'সে যালেম ও অজ্ঞ।'

অর্থাৎ সে নিজের ওপর যুলুম করেছে এবং নিজের শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ। তার দায়িত্বের বিরাটত্বের বিবেচনায় এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে যখন তার দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হয়, আপন স্রষ্টার পরিচয় লাভ করে, তার নিয়ম-বিধির প্রত্যক্ষ আনুগত্য করে, তার প্রতিপালকের ইচ্ছা অনুসারে পুরোপুরিভাবে চলে, তখন সে নিশ্চিতভাবে এমন এক স্তরে উন্নীত হয়, যেখানে সে পরম সম্মানের মর্যাদা লাভ করে এবং আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে একটা অনন্য স্থানে পৌঁছে যায়। কারণ সে

আল্লাহর সেই পরিচয় লাভ করে ও সেই আনুগত্য যা আকাশ পৃথিবী ও পাহাড়ের আনুগত্যের ন্যায় সহজ, পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক। এ সব সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে ও স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহর পরিচয় লাভ করে, প্রত্যক্ষ ও স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহর সন্ধান লাভ করে। প্রত্যক্ষ ও স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে। তাদের মাঝে ও তাদের স্রষ্টার মাঝে এবং স্রষ্টার ইচ্ছা ও হুকুমের মাঝে কোনো অন্তরায় থাকে না। তাদেরকে আনুগত্য থেকে ও কর্তব্য পালন থেকে কেউ বিরত রাখতে বা উদাসীন করতে পারে না।

মূলত এই উপলব্ধি, ইচ্ছাশক্তি, চেষ্টা সাধনা এবং দায়িত্ব ও কর্মফলের চেতনাই হলো আল্লাহর অন্যান্য বহু সৃষ্টির সাথে মানুষের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট। এ জিনিসগুলোই তাকে সেই সম্মানের যোগ্য বানায়, যা আল্লাহ তায়ালা আদমকে সেজদা করতে ফেরেশতাদের বাধ্য করার সময় ঘোষণা করেছিলেন। এ কথা আল্লাহ তায়ালা কোরআনেও সংরক্ষণ করেছেন, 'আমি আদমের বংশধর সম্মানিত করেছি।' অতপর মানুষের জানা উচিত কিসের জন্যে সে আল্লাহর কাছে এতো সম্মানিত। তার সেচ্ছায় গ্রহণ করা সেই আমানত তথা গুরুদায়িত্ব তার পালন করা উচিত, যা আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বত গ্রহণ করার সাহস পায়নি।

এর উদ্দেশ্য এই যে,

'আল্লাহ তায়ালা মোনাফেক পুরুষ ও মহিলাদেরকে এবং মোশরেক পুরুষ ও মহিলাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মোমেন নারী ও পুরুষকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

বস্তুত একমাত্র মানুষকে আল্লাহর আমানত গ্রহণের জন্যে বাছাই করা এবং নিজেকে চেনা, নিজেরই সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া, নিজেই কাজ করা ও নিজেকে গন্তব্যে পৌছানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপানোর উদ্দেশ্য শুধু এই যে, সে যেন নিজের স্বেচ্ছাকৃত দায়িত্বের ফলাফল বহন করে এবং তার শাস্তি বা পুরস্কার যেন তার নিজের কাজ অনুসারেই হয়। তারপর মোনাফেক ও মোশরেক নারী-পুরুষের ওপর তার আযাব নেমে আসে এবং আল্লাহর সাহায্য তার মোমেন বান্দাদের ওপর বর্ষিত হয়। ফলে বিভিন্ন অক্ষমতা ও দুর্বলতার চাপে, বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির কারণে এবং বিভিন্ন আকর্ষণ ও বোঝার কারণে যেসব ভুলক্রুটি তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়, তা আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের প্রতি নিজের ক্ষমা ও দয়া নিয়ে অধিকতর অগ্রসর।

'আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

এই গুরু গম্ভীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সূরাটা শেষ হচ্ছে। এই সূরা শুরু হয়েছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসূলকে তাঁর আনুগত্য করা, কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য না করা, আল্লাহর ওহীর অনুসরণ করা এবং একমাত্র তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করার নির্দেশের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে এ সূরায় ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অতীব প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ও নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং একাগ্র চিত্তে এগুলো অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এতে মানুষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব বা আমানতের গুরুত্ব ও বিরাটত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর মানুষের আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ, তার বিধি-বিধান ও তার ইচ্ছা অনুসরণের মধ্যেই এই আমানতের বিরাটত্বকে সীমিত করা হয়েছে। অন্যকথায়, আল্লাহর বিধান অনুসরণই মানুষের ওপর অর্পিত সেই আমানত বা গুরুদায়িত্ব।

এই গুরুগম্ভীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সূরাটা এবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। সূরার শুরু ও শেষের বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের মধ্যে চমৎকার একটা সমন্বয় বিদ্যমান। এই অলৌকিক সমন্বয়ই এই মহাগ্রন্থের উৎসের সন্ধান দেয়।

সূরা সাবা

আয়াত ৫৪ রুকু ৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ

فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا

يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝٢

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ

عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ

وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٣ لِّيَجْزِىَ الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤ وَالَّذِيْنَ

سَعَوْ فِىْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝٥

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, (এ) আকাশমন্ডলী ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে সবই তাঁর একক মালিকানাধীন এবং পরকালেও সমস্ত প্রশংসা হবে একমাত্র তাঁর জন্যে; তিনি সর্ববিষয়ে প্রজ্ঞাময়। ২. তিনি জানেন যা কিছু যমীনের ভেতরে প্রবেশ করে, (আবার) যা কিছু তা থেকে উদগত হয়, যা কিছু আসমান থেকে বর্ষিত হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয় (এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই তিনি পরিজ্ঞাত আছেন); তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল। ৩. যারা (আল্লাহ তায়ালার এসব কুদরত) অস্বীকার করে তারা বলে, আমাদের ওপর কখনোই কেয়ামত আসবে না; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আমার মালিকের কসম, হ্যাঁ, অবশ্যই তা তোমাদের ওপর আপতিত হবে, (আমার মালিক) অদৃশ্য (জগত) সম্পর্কে অবহিত, এ আকাশমন্ডলী ও যমীনের অণু পরমাণু– তার চাইতেও ক্ষুদ্র কিংবা বড়ো– এর কোনো কিছুই তাঁর (জ্ঞানসীমার) অগোচরে নয়, এমন কিছু নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) নেই! ৪. যেন (এর ভিত্তিতে) তিনি তাদের পুরস্কার দিতে পারেন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; (বস্তুত) তারাই হচ্ছে সে (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার (প্রশস্ত) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। ৫. যারা (এ যমীনে) প্রাধান্য পাবার জন্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তাদের জন্যে (পরকালে) ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

৬. (হে নবী,) যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এ (কেতাব) একান্ত সত্য, এটি তাদের পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার (দিকেই) পথনির্দেশ করে। ৭. যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তারা বলে (হে আমাদের সাথীরা), আমরা কি তোমাদের এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেবো যে তোমাদের কাছে বলবে, তোমরা (মৃত্যুর পর) যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন (পুনরায়) তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে, ৮. (আমরা জানি না) এ ব্যক্তি কি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, না তার সাথে কোনো উন্মাদনা রয়েছে; না, আসল ব্যাপার হচ্ছে, যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তারাই (সেখানকার) আযাব ও (দুনিয়ার) ঘোর গোমরাহীতে নিমজ্জিত আছে। ৯. তারা কি তাদের সামনে পেছনে যে আকাশ ও পৃথিবী রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে (তাদের স্রষ্টাকে খুঁজে) দেখে না? আমি চাইলে ভূমিকে তাদের সহ ধসিয়ে দিতে পারি, কিংবা পারি তাদের ওপর কোনো আকাশ খন্ডের পতন ঘটাতে; তাতে অবশ্যই এমন প্রতিটি বান্দার জন্যে কিছু নিদর্শন রয়েছে যারা একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার অভিমুখী।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ইসলামের প্রধান ও মৌলিক আকীদা আল্লাহর একত্ব, ওহীর সত্যতায় বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাসই এই মক্কী-সূরাটার আলোচ্য বিষয়। এর পাশাপাশি এতে উক্ত প্রধান আকীদাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় মৌলিক তত্ত্বে সত্যায়ন করা হয়েছে। সেই সাথে বলা হয়েছে যে, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি নয়, বরং ঈমান ও সৎকর্মই আল্লাহর কাছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিফল দানের ব্যাপারে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আর আল্লাহ তায়ালার ধর পাকড় থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন শক্তি কোথাও নেই এবং আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে না।

এ সূরায় যে বিষয়টার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে, তা হলো পরকাল, কর্মফল এবং আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের সর্বব্যাপিতা, নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতা। এই দুটো পরস্পর সংশ্লিষ্ট

বিষয়কে এ সূরায় বারবার বিভিন্ন ভংগীতে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরার ওপর তার প্রভাব পড়েছে।

যেমন পরকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কাফেররা বলে আমাদের কাছে কেয়ামত আসবে না। তুমি বলো, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম, কেয়ামত তোমাদের কাছে অবশ্যই আসবে।'

কর্মফল সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের যাতে তিনি কর্মফল প্রদান করতে পারেন .....'

এর কাছাকাছি অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, যারা কুফরি করেছে, তারা বলে, তোমাদের কি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেবো, যে তোমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আবার নাকি তোমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? ....'

এ ছাড়া কেয়ামতের বিভিন্ন দৃশ্য। কেয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি তিরস্কার, যে আযাবকে তারা মিথ্যা মনে করতো বা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতো, তার বিভিন্ন রূপও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন একটি দৃশ্য হলো,

'যদি তুমি দেখতে, যখন অত্যাচারীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, তখন দুর্বলেরা অহংকারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মোমেন হতাম।' .... তাদেরকে তাদের কৃত কর্ম ছাড়া অন্য কিছুর প্রতিফল দেয়া হবে কি?' (আয়াত ৩১-৩৩)

এ সব দৃশ্য এ সূরায় বারবার দেখানো হয়েছে, সূরার বিভিন্ন জায়গায় তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং এ দিয়ে সূরায় সমাপ্তিও ঘটেছে, যেমন 'যদি তুমি দেখতে, যখন তারা আতংকিত হবে ....' (আয়াত ৫১-৫৪)

আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী জ্ঞান সম্পর্কে সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে, 'যা কিছু ভূগর্ভে প্রবেশ করে, ভূ-গর্ভ থেকে বের হয়, আকাশ থেকে নামে ও আকাশে ওঠে, সবই তিনি জানেন।'

কেয়ামতকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের জবাবে বলা হয়েছে, 'তুমি বলো, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, কেয়ামত তোমাদের কাছে অবশ্যই আসবে ......' (আয়াত-৩)

আর সূরার শেষ ভাগে বলা হয়েছে, 'বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সত্যকে নিক্ষেপ করেন তিনি অদৃশ্য জান্তা।' (আয়াত-৪৮)

তাওহীদ বিষয়ে সূরার শুরু করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দিয়ে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সে সব কিছুর মালিক ....'

আর মোশরেকদেরকে একাধিকবার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, 'বল, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যাদের প্রভুত্বের দাবী কর, তারা আকাশ ও পৃথিবীতে কনামাত্র জিনিসেরও মালিক নয়! ....'

এ আয়াতগুলোতে মোশরেকদের পক্ষ থেকে ফেরেশতা ও জ্বিনদের পূজা করার উল্লেখ রয়েছে এবং সেটা কেয়ামতের একটা দৃশ্য বর্ণনা প্রসংগে করা হয়েছে। যেমন, 'যেদিন মহান আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন অতপর ফেরেশতাদের বলবেন, এরা কি তোমাদের উপাসনা করতো? ....' (আয়াত ৪০-৪১)

তারা ধারণা করতো যে, ফেরেশতারা তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ করবে। এ ধারণা খন্ডন করা হয়েছে ২৩ নং আয়াতে।

যেহেতু তারা শয়তানের পূজা করতো, তাই সেই প্রসংগে হযরত সোলায়মানের ঘটনা এবং জ্বিনজাতি কর্তৃক তাঁর অনুগত করা ও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার ১৪ নং আয়াতে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

ওহী ও রেসালাত সম্পর্কে ৩১, ৪৩, ২৮ ও ৬ নং আয়াতে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

আর মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য এসেছে ৩৪ থেকে ৩৮ নং আয়াতে। এ সম্পর্কে ইতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে হযরত দাউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞ বংশধরের কাহিনী, সাবার দাম্ভিক ও কৃতঘ্নদের কাহিনী এবং উভয়ের পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। এতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎ কর্মের শাস্তির প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে।

অধিকাংশ মক্কী সূরাগুলোতে এই বিষয়গুলোই বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেক সূরায় মহাজাগতিক পরিবেশের বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে এবং সেই সাথে বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। সূরা সাবাতেও একই পন্থায় মহাজাগতিক পরিবেশের বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে আকীদাগত সত্যগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সুবিশাল আকাশ ও পৃথিবী, অজানা ও অদৃশ্য ভয়াল জগত, ত্রাস সৃষ্টিকারী কেয়ামতের ময়দান, হৃদয়ের গভীরতম ও সূক্ষ্ম জগত, ইতিহাসের জানা ও অজানা অধ্যায় এবং ইতিহাসের বিরল ও বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী। এর প্রত্যেকটা জিনিসেই মানবমনকে প্রভাবিত ও উজ্জীবিতকারী, তাকে সচেতনকারী ও সক্রিয়কারী বক্তব্য রয়েছে।

সূরার সূচনা থেকেই বিশাল মহাবিশ্বের, তাতে বিরাজমান আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর ও তাঁর সূক্ষ্ম ও সুপ্রশস্ত জ্ঞানের কথা আলোচিত হয়েছে। (আয়াত ২-৩)

যারা আখেরাত অস্বীকার করে, তাদের এ সূরায় বিভিন্ন গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকি দেয়া হয়েছে। ৯ নং আয়াত দেখুন।

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ফেরেশতাদের বা জ্বিনদের উপাসনা করে, তাদেরকে উচ্চতর ফেরেশতা জগতে অদৃশ্য সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করানো হয়েছে। যেমন 'আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সুপারিশ সফল হবে না .... । ' (আয়াত ২৩)

আবার অন্যত্র কেয়ামতের মাঠে তাদেরকে ফেরেশতাদের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে, যেখানে কোনো ঝগড়া বা বিতর্কে লিপ্ত হবার অবকাশ থাকবে না। (আয়াত ৪০)

যারা রসূল (স.)-কে অস্বীকার করতো তাঁকে মনগড়া ওহী তৈরী করার দায়ে অভিযুক্ত করতো কিংবা বলতো যে, তাঁর সাথে একটি জ্বিন থাকে। তাদেরকে দাঁড় করা হয়েছে তাদেরই মন ও বিবেকের সম্মুখে। যাবতীয় কৃত্রিম আড়াল ছিন্ন করে ও মনের ওপর কৃত্রিম প্রভাব সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বাদ দিয়েই এটা করা হয়েছে। (৪৭ নং আয়াত লক্ষ্য করুন।)

এভাবেই এ সূরাটা মানুষের উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোর চারপাশে কেন্দ্রীভূত রাখে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কেয়ামতের একটা ভয়াবহ দৃশ্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়।

সূরাটার উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যাকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে তাকে পাঁচটা অধ্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। তবে প্রকৃতপক্ষে এ অধ্যায়গুলোর মাঝে কোন সূক্ষ্ম পার্থক্য নেই। এটাই এই সূরার বৈশিষ্ট।

সূরাটা শুরু হয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দিয়ে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। যিনি আখেরাতে প্রশংসিত এবং যিনি মহাজ্ঞানী ও পরম কুশলী। তারপর আল্লাহ তায়ালার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও প্রশস্ততম জ্ঞানের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে, যা কিছু যমীনে থেকে বের হয়, যা কিছু আকাশ থেকে নামে ও আকাশে উঠে যায়, সব কিছু সম্পর্কেই তিনি জানেন। এরপর বলা হয়েছে যে, কাফের বা কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আর আল্লাহ তায়ালা বারবার তাকে সত্য বলে সজোরে ঘোষণা করছেন। তাঁর জ্ঞান এতো সূক্ষ্ম ও নির্ভুল যে, আকাশ ও পৃথিবীতে একটা ক্ষুদ্র কণা এবং তারচেয়ে ছোটো বা বড়ো কোনো জিনিসই তাঁর অজানা নয়।

তাঁর জ্ঞান এতো সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি মোমেনদের ও আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলো নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্তদের যথোপযুক্ত প্রতিফল দিতে সক্ষম। সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, যারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী, তারা নবীর প্রতি নাযিল হওয়া ওহীকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। আর যারা পরকালকে অস্বীকার করে তাদের নির্বুদ্ধিতায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদেরকে চরম বিপথগামী ও আযাবের উপযুক্ত বলে মন্তব্য করা হয়েছে। উপরন্তু তাদেরকে এই মর্মে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি ধসিয়ে দিয়ে অথবা আকাশের ভাংগা টুকরো তাদের মাথায় ফেলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতে পারে।

এভাবে প্রথম অধ্যায়টা শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে হযরত দাউদ (আ.)-এর সেই সব বংশধরের কথা, যারা আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের জন্য আল্লাহ তায়ালার যথাযথ শোকর আদায় করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পৃথিবীর বহু জিনিসকে হযরত দাউদ ও সোলায়মানের অনুগত ও বশীভূত করে দেয়া আল্লাহর এই নেয়ামত ও অনুগ্রহের অন্যতম নিদর্শন। এমন দুর্লভ নেয়ামত পেয়েও তারা কখনও দাম্ভিক বা অহংকারী হননি। এই সব অনুগত ও বশীভূত শক্তির মধ্যে জ্বিনও অন্তর্ভুক্ত। মোশরেকদের কেউ কেউ জ্বিনদের উপাসনা পর্যন্ত করে এবং তাদের কাছে অজানা ও অদৃশ্য খবর জানতে চায়। অথচ জ্বিনেরা অদৃশ্যের কোনো খবরই জানে না। হযরত সোলায়মানের ইন্তেকালের পরও তারা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও লাঞ্ছনাকর কাজ করেছে। কেননা তিনি যে মারা গেছেন, সে কথা তারা জানতেই পারেনি। কৃতজ্ঞতার এই ছিল দৃষ্টান্ত। যেমন সাবা সাম্রাজ্য ও তার রাণীর কাহিনী। আল্লাহ তায়ালার বিপুল নেয়ামত ও অনুগ্রহ ভোগ করেও তারা তার শোকর আদায় করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'এর ফলে আমি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি।' কেননা তারা শয়তানের আনুগত্য করেছিল। শয়তান তাদের ওপর কোনো জোর খাটায়নি; বরং তারা স্বেচ্ছায় তাকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বানিয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সূচনা হয়েছে মোশরেকদেরকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ দেয়ার মাধ্যমে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তারা নিজেদের উপাস্য মনে করে, তাদের ডেকে আনুক ও তারা তাদের কতখানি সাহায্য করতে পারে দেখুক। 'আসলে তারা আকাশ ও পৃথিবীতে একটা কণার সমানও শক্তি রাখে না, আকাশ ও পৃথিবীতে কোথাও তাদের বিন্দুমাত্রও অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ নেই।' এই সব উপাস্য আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের জন্য একটু সুপারিশ করার ক্ষমতাও রাখে না, এমনকি তারা ফেরেশতা হলেও নয়। ফেরেশতারা সব সময় আল্লাহ তায়ালার আদেশের অনুগত এবং তারা তাঁর সামনে টু শব্দটিও করার সাহস রাখে না। এ অধ্যায়ের এক জায়গায় প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী থেকে তাদের জীবিকা সরবরাহ করে কে? তারপর তার জবাব দেয়া হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জীবিকা সরবরাহ করেন এবং তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। অতপর তাদের যাবতীয় বিরোধ আল্লাহ তায়ালার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং তিনিই তাদের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন। এই অধ্যায়ের শুরুর মতো শেষেও আবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে যে, যাদের তারা আল্লাহর শরীক বানায় তাদের দেখিয়ে দেয়া হোক। তারপর বলা হয়েছে, 'কখনো দেখাতে পারবে না।' বরং একমাত্র মা'বুদ হলেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি মহাপরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানী।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় একই সাথে ওহী ও রেসালাত, ওহী ও রেসালাতের সাথে কাফেরদের আচরণ, প্রত্যেক ইসলামী আন্দোলনের সাথে ইসলামের শত্রুদের আচরণ এবং তাদের জনশক্তি ও অর্থশক্তির গর্ব ও বড়াই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে, হিসাব নিকাশ ও কর্মফল প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসগুলোর ওপর নির্ভরশীল, তা হচ্ছে ঈমান ও সৎকাজ, জনবল ও ধনবল নয়।

সেই সাথে কেয়ামতের একাধিক দৃশ্যে ঈমানদার ও বেঈমানদের পরিণাম তুলে ধরে দেখানো হয়েছে কিভাবে বিভিন্ন দলমতের অনুসারীরা তাদের নেতৃবৃন্দকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। অনুরূপভাবে ফেরেশতারাও তাদের উপাসক বিভ্রান্ত মোশরেকদের প্রত্যাখ্যান ও নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করবে। এই সব দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাদের আহ্বান জানানো হয়েছে যে, তারা যেন তাদের আসল স্বভাব ও প্রকৃতিকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে পরিশুদ্ধ করে এবং রসূলকে প্রত্যাখ্যান না করে। যে রসূল তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক চান না এবং যিনি মিথ্যুক নন, পাগলও নন, তাকে যেন অস্বীকার না করে। উভয় অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হয়েছে কেয়ামতের একটা দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে। আর সর্বশেষে সূরার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে কয়েকটা গুরুগম্ভীর বক্তব্যের মাধ্যমে, 'তুমি বল, আমার প্রভু সত্য নিক্ষেপ করেন, তিনি যাবতীয় অদৃশ্য তত্ত্ব জানেন। বলো, সত্য এসে পড়েছে। অসত্য নতুন কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না, পুনসৃষ্টিও করতে পারে না। বলো, যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবো, আর যদি আমি সৎপথের ওপর থাকি, তবে তা এ জন্য যে, আমার প্রভু আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। তিনি তো সব শোনেন এবং অতি নিকটে অবস্থান করেন।' অতপর কেয়ামতের একটা ভয়াল ও ক্ষুদ্র দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার বিস্তারি ত ব্যাখ্যা আসছে।

তাফসীর

আয়াত ১-৯

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু যার মালিকানাধীন। .... ' (আয়াত ১ ও ২)

আল্লাহ তায়ালার সাথে মোশরেকদের শেরক তাদের পক্ষ থেকে তাঁর রসূলকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা, আখেরাতের প্রতি সন্দেহ পোষণ এবং পরকাল ও কেয়ামতকে অসম্ভব মনে করা-এই সব বিষয়ের পর্যালোচনায় পরিপূর্ণ এ সূরাটা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দ্বারা সূচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা আর কোনো মানুষ করুক বা না করুক, তিনি স্বতই প্রশংসিত। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণগানে নিয়োজিত সমগ্র বিশ্ব জগতে তিনি প্রশংসিত এবং মানুষ ছাড়াও সমগ্র সৃষ্টিজগত কর্তৃক তিনি প্রশংসিত।

প্রশংসার সাথে সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজিত যাবতীয় জিনিসের একচ্ছত্র মালিকানাও আল্লাহ তায়ালার বলে ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কারো কোনো জিনিসের মালিকানা নেই। আকাশ ও পৃথিবীতে কোথাও কারো কোন অংশীদারিত্ব নেই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর একচ্ছত্র মালিকানাধীন। এটাই ইসলামী আকাদীর প্রথম তত্ত্ব। এটা হলো তাওহীদ। এই বিস্তৃত বিশ্বে সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি ছাড়া আর কেউ কোনো কিছুর মালিক নয়।

'আখেরাতে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।'

অর্থাৎ স্বতস্ফূর্ত প্রশংসা এবং বান্দাদের পক্ষ থেকে কৃত প্রশংসা উভয়ই। এমনকি পৃথিবীতে যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করতো, অথবা পথভ্রষ্ট হয়ে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করতো তারাও আখেরাতে প্রকৃত সত্য জানতে পারবে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করবে।

'আর তিনি মহাকুশলী সর্বজ্ঞ।'

তিনি এমন মহাকুশলী যে, যা কিছুই করেন, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে করেন, দুনিয়া ও আখেরাতকে সুকৌশলে পরিচালনা করেন এবং সমগ্র বিশ্ব জগতকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ। তাই সবকিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞান

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞানের সুবিশাল ভান্ডারের একটা অংশ শুধু দেখান-সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী যার আওতাভুক্ত।

'পৃথিবীতে যা কিছু প্রবেশ করে, যা কিছু পৃথিবী থেকে বের হয়, যা কিছু আকাশ থেকে নামে এবং যা কিছু আকাশে ওঠে, তা তিনি জানেন।'

অল্প কয়েকটা শব্দে প্রকাশ করা এই অংশটা নিয়ে ভাবলেই মানুষ দেখতে পায় বিপুল সংখ্যক বস্তু, কর্ম, আকৃতি, রূপ, চিত্র, তত্ত্ব ও কাঠামোর এক বিশাল সমারোহ, যা কল্পনাও করা যায় না।

এ আয়াতে যে সব জিনিসের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, তার মধ্য থেকে যতগুলো জিনিস এক মুহূর্তে সংঘটিত হয়, সারা পৃথিবীর অধিবাসীরা জীবনভর গণনা করেও সেগুলোর সুনিশ্চিত সংখ্যা স্থির করতে পারবে না।

এক মুহূর্তে পৃথিবীর অভ্যন্তরে কতগুলো জিনিস প্রবেশ করে এবং কতকগুলো জিনিস পৃথিবী থেকে বের হয়? এই এক মুহূর্তে কতগুলো জিনিস আকাশ থেকে নামে এবং কতগুলো জিনিস আকাশে উঠে যায়?

পৃথিবীর ভূ-স্তরগুলোতে কতগুলো শস্য বীজ আত্মগোপন করে? কতগুলো কীট পতংগ, পোকা মাকড়, সরীসৃপ পৃথিবীর বিভিন্ন দিক দিয়ে তার ভেতরে প্রবেশ করে? কতো ফোটা পানি, কতো বিন্দু গ্যাস ও কতো ইউনিট বিদ্যুৎ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকাগুলোতে প্রবেশ করে? আল্লাহর সদা জাগ্রত চোখ তার সবকিছু দেখতে পায়?

পৃথিবী থেকে কতো জিনিসই বা বের হয়? কতো উদ্ভিদের চারা উদগত হয়? কতো পানির ফোয়ারা বের হয়? কতো আগ্নেয়গিরীর বিস্ফোরণ ঘটে? কতো গ্যাস আকাশে উঠে যায়? কতো গুপ্ত জিনিস উদঘাটিত হয়? কতো কীটপতংগ তার গুপ্ত বাসস্থান থেকে বের হয়? দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং জানা ও অজানা কতো জিনিস প্রবেশ করে ও বের হয়, কে তার ইয়ত্তা রাখে?

কতো জিনিসই বা আকাশ থেকে নামে? কতো বৃষ্টির বিন্দু নামে? কতো নক্ষত্র নামে? কতো জ্বলন্ত রশ্মী এবং কতো আলোকিত রশ্মী অবতীর্ণ হয়? কতো স্থীরিকৃত সিদ্ধান্ত ও কতো অদৃশ্যের ফায়সালা নামে? আল্লাহ তায়ালার কতো অনুগ্রহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর ব্যপ্ত হয় এবং কতো রহমত বিশেষ বিশেষ বান্দার ওপর নামে? কতো জীবিকা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাংখিত বান্দাদের প্রতি বিস্তৃত করেন এবং কতো জীবিকা থেকে তাঁর বান্দাদেরকে বঞ্চিত করেন, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কে তার ইয়ত্তা রাখে?

কতো জিনিস আকাশে উঠে যায়? কতো উদ্ভিদ, কতো প্রাণী, কতো মানুষ এবং মানুষের অজানা আরো কতো সৃষ্টি ওপরে উঠে যায়? আর আল্লাহ তায়ালার দিকে কতো প্রকাশ্য বা গোপন আহ্বান উচ্চারিত হয়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না।

আমাদের জানা ও অজানা কতো প্রাণ প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালার কাছে চলে যায়? কত ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে আকাশে উঠে যায়? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, এমন কতো আত্মা এই জগত থেকে উঠে যায়।

কতো বিন্দু পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়? কত বিন্দু গ্যাস শরীর থেকে বের হয়? আল্লাহ ছাড়া আর কেইবা ইয়ত্তা রাখে যে, কি পরিমাণ জিনিস বের হয়?

এক মুহূর্তে কতো কী ঘটে যায়-সারা জীবন গণনা করেও মানুষ জানতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী ও সূক্ষ্ম জ্ঞান সকল সময়ে ও সকল স্থানে সংঘটিত এই সব ঘটনার খবর জানেন। সকল প্রাণীর অন্তরে কী ধ্যানধারণা বিরাজ করে, কোন্ প্রাণী কী কী কাজ করে-সবই আল্লাহ তায়ালার চোখে উদ্ভাসিত।

তিনি সব দেখেন ও সব জানেন। তবু সব কিছু গোপন করেন ও ক্ষমা করেন। 'তিনি দয়াশীল, ক্ষমাশীল।'

কোরআনের এই আয়াতটার মতো একটা আয়াতই এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, কোরআন মানব রচিত গ্রন্থ নয়। মহাবিশ্ব সংক্রান্ত এ ধরনের ধারণা ও কল্পনা স্বভাবতই মানুষের কল্পনা শক্তিতে আসতে পারে না। একমাত্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সৃষ্টিকর্মই এত ব্যাপকভাবে একটা মাত্র বাক্যে তুলে ধরা সম্ভব। এর সাথে কোনো মানুষের সৃষ্টির তুলনা হতে পারে না।

এ রকম ব্যাপক বিস্ময়কর পন্থায় এ তত্ত্বটা প্রকাশ করার পর পরবর্তী তিনটি আয়াতে অস্বীকারকারীদের অস্বীকৃতিমূলক উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। অথচ এরা আগামীকাল কী ঘটবে তা জানে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় অজানা ও অদৃশ্যের বিষয় অবগত। আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছু তার অগোচরে থাকে না। সৎ কর্মশীল ও অসৎকর্মশীলদের কৃতকর্মের বিচারের জন্য কেয়ামত অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কাফেররা বলে, আমাদের কাছে কেয়ামত আসবে না। তুমি বলো, হ্যাঁ, আমার প্রভুর কসম, কেয়ামত অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য জ্ঞাত। .... ' (আয়াত ৩, ৪ ও ৫)

কাফেরদের আখেরাত অস্বীকার করার একমাত্র কারণ হলো, তারা আল্লাহর সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য, সূক্ষ্ম যুক্তি ও প্রজ্ঞা উপলব্ধি করে না। আল্লাহ তায়ালার এই মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা রয়েছে বলেই তিনি মানুষকে কর্মফলবিহীন ছেড়ে দেন না। যে ভালো কাজ করে, সে তার ভালো কাজের কোনো ফল পাবে না এবং যে খারাপ কাজ করে, সে তার খারাপ কাজের কোন ফল পাবে না-এটা হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের মুখ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক কর্মফল পরকালের জন্য রেখে দেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগতে তাঁর যুক্তি ও প্রজ্ঞাকে যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে, সে এ কথা অবশ্যই অনুধাবন করে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নের জন্য আখেরাত অনিবার্য। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি কুফরি করে, তারা সেই যৌক্তিকতাকে উপলব্ধি করে না। এ জন্য তারা বলে থাকে যে, 'আমাদের কাছে কেয়ামত আসবে না।' এ জন্যই তাদের কথার জবাব দেয়া হচ্ছে জোরালভাবে, 'বল, আমার প্রভুর কসম, কেয়ামত তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই আসবে।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সত্য কথাই বলেছেন। তারা অদৃশ্য সম্পর্কে কিছুই জানে না। তবুও যা জানে না, তা বড় গলায় বলে যে, কেয়ামত আসবেই। তিনি 'আলেমুল গায়ব' অর্থাৎ তিনি অদৃশ্য জানেন। সুতরাং পরকালে কী হবে বা হবে না, সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সুনিশ্চিত জ্ঞান ও প্রত্যয়ভিত্তিক এবং অকাট্য সত্য।

এই জ্ঞানকে সূরার শুরুতে যেভাবে জাগতিক ও প্রাকৃতিক রূপ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, এখানেও তেমনিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটা এই মর্মে আরো একটা সাক্ষ্য যে, এই কোরআন মানুষের রচনা হতে পারে না। কেননা মানুষের কল্পনায় কখনো এ ধরনের রূপ ফুটে ওঠে না,

'আকাশে ও পৃথিবীতে কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর অগোচরে নেই, কিংবা কণার চেয়ে ছোট বা বড় নেই। ....'

আমি পুনরায় বলছি যে, এই ধারণা ও কল্পনার প্রকৃতি মনুষ্যসুলভ নয় এবং অতীতের কোনো মানবীয় সাহিত্যে-গদ্যে বা পদ্যে-এর কোন নযীর নেই। মানুষ যখন জ্ঞানের সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতা ও সর্বময়তার কথা বলে, তখন এ কথা তার কল্পনায়ও আসে না যে, এটাকে সে এরূপ বিস্ময়কর

প্রাকৃতিক রূপ দিয়ে প্রকাশ করবে, 'আকাশে ও পৃথিবীতে কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর অগোচরে নেই .... ' সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের জন্য মানবীয় সাহিত্যে এ ধরনের বর্ণনা দেয়ার কোনো দৃষ্টান্ত আছে বলে আমার জানা নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজেকে ও নিজের জ্ঞানকে এমন সব বিশেষণে ভূষিত করেন, যা মানুষের কল্পনারও বাইরে। এভাবে কোরআন মানুষের 'ইলাহ' সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে। সর্বাবস্থায় তাকে সীমিত মানবীয় শক্তির আওতায় রাখে এবং তাঁর গুণাবলী দ্বারা তাঁকে পরিচিত করে।

একটা প্রকাশ্য পুস্তকে সংরক্ষিত রয়েছে, এ কথার সহজতর ব্যাখ্যা হলো যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানই সকল জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর অগোচরে এক কণা পরিমাণ কোনো বস্তু আকাশে বা পৃথিবীতে নেই।

এই 'কণা পরিমাণ' কথাটা নিয়ে একটু ভেবে দেখা দরকার। কণা বা অণুকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও সবচেয়ে ক্ষুদ্র বস্তু বলে মনে করা হতো। কিন্তু অণুকে বিভক্ত করার পর মানব জাতি এখন জানতে পেরেছে যে, অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র বস্তুও রয়েছে। এই ক্ষুদ্রতর বস্তু অণুরই অংশ। অথচ সেদিন পর্যন্তও এ কথা কারো কল্পনায় আসেনি। মহান আল্লাহ কল্যাণময় হোন, যিনি তাঁর বান্দাদেরকে যতটুকু ইচ্ছা করেন, নিজের গুণাবলীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য এবং নিজের সৃষ্টির অজানা রহস্য জানান।

কেয়ামত যে অবশ্যই আসবে এবং কোন ছোট বা বড় বস্তু যে তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই-এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী, তা বলা হয়েছে পরবর্তী দুটো আয়াতে,

'যেন আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করতে পারেন ....। (আয়াত ৪ ও ৫)

এ থেকে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তায়ালার মহৎ উদ্দেশ্য, সূক্ষ্ম যুক্তি, প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে তিনি ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য এবং অসৎ কর্মশীল ও কাফেরদের যথোপযুক্ত কর্মফল দিতে পারেন।

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মের মাধ্যমে ঈমানকে বাস্তবায়িত করেছে, তাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করা হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে 'সম্মানজনক জীবিকা।' এই সূরায় জীবিকার প্রসংগ বহুবার এসেছে। তাই এখানে আখেরাতের নেয়ামতকে জীবিকা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুত আখেরাতের নেয়ামতও আল্লাহ তায়ালার এক ধরনের জীবিকাই বটে।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলো থেকে মানুষকে দূরে সরাতে চেষ্টা করে। তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক ও নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি। এটা বাতিলের পথে তাদের পরিচালিত অপতৎপরতার প্রতিফল।

এভাবেই আল্লাহ তায়ালার হেকমত তথা সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়, সফল হয় অবধারিত কেয়ামতের উদ্দেশ্য, যা কখনো আসবে না বলে তারা দাবী করে থাকে।

কোরআন যেভাবে সঠিক পথের দিশা দেয়

কেয়ামত একটা অজানা ও অদৃশ্য গায়বী ঘটনা হওয়া সত্তেও তারা এই বলে আস্ফালন করে থাকে যে, ওটা কখনো হবে না। অথচ অদৃশ্য জগতের মালিক আল্লাহ তায়ালা জোর দিয়ে বলছেন যে, কেয়ামত অবধারিত। ওদিকে আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচারের কাজে নিয়োজিত রসূল (সঃ) বলেন যে,

'যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, ... এবং তা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসিত পথেই পরিচালিত করে। (আয়াত ৬)

'যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে' কথাটা দ্বারা আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা তাদের কেতাব থেকেই জানে যে, কোরআন সত্য ও সুপথ প্রদর্শক।

তবে এ আয়াতের বক্তব্যের পরিধি ইহুদী খৃষ্টানদের মধ্যে সীমিত নয়-বরং তার চেয়েও ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। যাদেরকে জ্ঞান জ্ঞান দেয়া হয়েছে। চাই তা যে কোন যুগের যে কোন স্থানের ও যে কোন প্রজন্মের লোকই হোক না কেন, তাদের জ্ঞান যখন বিশুদ্ধ ও পরিপক্ব হয়, তখন তারা উপলব্ধি করে যে, কোরআনের বক্তব্যই সঠিক। কোরআন অনাগত কালের সকল প্রজন্মের জন্য এক উন্মুক্ত কেতাব। নির্ভুল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই কেতাব প্রকৃত সত্যকে উন্মোচন করে। বিশ্ব জগতের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সত্যকে এই কেতাব উদঘাটন করে। এই সৃষ্টি জগত ও তার ভেতরে যে প্রকৃত সত্য রয়েছে, কোরআন তার নিখুঁততম তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে।

'মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার পথে চালিত করে।'

মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার পথ বলতে আল্লাহর সেই জীবন বিধানকে বুঝায়, যা তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য ও মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টিজগতের কর্মকান্ডের সাথে মানুষের কর্মকান্ডের সমন্বয় ঘটে। এই জীবন বিধান হচ্ছে সেই সব নিয়ম ও বিধান, যা এই গোটা সৃষ্টি জগতের ওপর কর্তৃত্ব করে। মানব জীবনও এই সৃষ্টি জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উৎস, মূল, বিধিব্যবস্থা, ও কর্মকান্ড-কোনো কিছুর দিক দিয়েই মানব জীবন অবশিষ্ট সৃষ্টি জগত থেকে এবং সৃষ্টি জগতের যাবতীয় প্রাণী ও বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

কোরআন মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার পথে কিভাবে মানুষদের চালিত করে? মোমেনের চেতনায় সৃষ্টি জগত, তার সাথে সম্পর্ক ও মূল্যবোধ, সৃষ্টি জগতে মানুষের মর্যাদা ও ভূমিকা, মানুষের চার পাশে বিরাজমান বিভিন্ন সৃষ্টি কর্তৃক আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সকল সৃষ্টির কর্মকান্ডের সমন্বয় ও একাত্মতার মধ্য দিয়ে মহান স্রষ্টার আনুগত্য করার প্রেরণা উজ্জীবনের মাধ্যমে।

চিন্তা পদ্ধতির সংশোধন, চিন্তা পদ্ধতি নির্ভুল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ব জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম বিধির সাথে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির এমন সমন্বয় সাধন করে, যাতে এই প্রক্রিয়া মানবীয় চিন্তাধারাকে এই বিশ্ব জগতের স্বভাব প্রকৃতি, বৈশিষ্ট ও নিয়ম বিধি বুঝতে, তার সাহায্য নিতে ও তার সাথে কোন রকম সংঘাত, সংঘর্ষ ও জটিলতা ছাড়াই পরিপূর্ণ একাত্মতা গড়তে সাহায্য করতে পারে।

কোরআনের সেই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, যা ব্যক্তিকে সমাজের সাথে পরিপূর্ণ একাত্মতা, সংহতি ও সমন্বয়ের জন্য প্রস্তুত করে, সমাজকে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় পর্যায়ে সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টিকূলের সাথে সংহতি ও সমন্বয়ের জন্য প্রস্তুত করে, সর্বোপরি সকল সৃষ্টিকূলকে যে জগতে তারা অবস্থান করে, তার স্বভাব প্রকৃতির সাথে সমন্বয় ও একাত্মতার জন্য প্রস্তুত করে। আর এই সব কিছুই সে অত্যন্ত সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ উপায়েই সম্পন্ন করে।

কোরআনের সেই সব আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে, যা মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি, তার মৌলিক জীবন যাপন পদ্ধতি ও অর্থনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ, যা মানুষ ছাড়া অন্য সকল প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-বিধানের সাথে ও অন্য সকল সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ জন্য মানুষের আইন কানুন সৃষ্টি জগতের সাধারণ নিয়ম নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ও তার সাথে অসংগতিপূর্ণ হতে পারে না। কেননা মানুষ এ মহাবিশ্বের অসংখ্য সৃষ্টিকূলেরই একটা জাতি বা শ্রেণী মাত্র।

এই মহাগ্রন্থ কোরআন আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত, নির্ভুল, সরল ও সঠিক পথের দিকনির্দেশক। মানুষের ও এই পথের যিনি স্রষ্টা, তিনিই এই দিকনির্দেশক ও এই পথের সন্ধানদাতা ও রচয়িতা। উভয়ের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি অবগত। আপনি যে সড়ক দিয়ে চলবেন, সেই সড়ক নির্মাণকারী প্রকৌশলীর নিজের রচিত একটা গাইড যদি আপনার কাছে থাকে, তাহলে আপনি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে পথ চলতে পারবেন এবং হতে পারবেন একজন প্রাজ্ঞ যাত্রী। আর সড়ক নির্মাণকারী ইঞ্জিনিয়ার যদি খোদ যাত্রীরও নির্মাতা হয়ে থাকেন, তাহলে তা সোনায় সোহাগা!

পরকালে অবিশ্বাসীদের জীবন

চেতনা উজ্জীবনকারী এই আয়াত কটার পর পুনরায় মোশরেকদের পরকাল সংক্রান্ত কথাবার্তা ও তাদের বিস্ময় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তারা কেয়ামত ও আখেরাতের বিষয়টাকে এতো অসম্ভব মনে করে যে, জ্বিন ভূতে আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ যেন এ সব কথা মুখেই আনতে পারে না। জ্বিন ভূতে আক্রান্ত মানুষ অনেক অসম্ভব কথা, মিথ্যে কথা ও বিস্ময়কর কথা বলে থাকে।

'তারা বলে, তোমাদেরকে কি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব,' (আয়াত ৭ ও ৮)

পরকালের বিষয়টাকে তারা এতোই বিস্ময়কর ও অসম্ভব মনে করতো যে, এ বিষয়ে যে কথা বলতো, খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে তাকে দেখার জন্য জনতাকে কৌতূহলী করে তুলতো ও দেখার আহ্বান জানাতো। তারা বলতো যে, 'তোমাদেরকে কি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে বলে যে, তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তোমাদেরকে নাকি নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?'

অর্থাৎ এমন এক আজব ও অদ্ভূত ব্যক্তিকে দেখতে চাও তো এসো যে, একটা উদ্ভট ও অসম্ভব রকমের কথা বলে। সে বলে কিনা, মরে পচে গলে ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তোমরা নাকি পুনরায় সৃষ্টি হবে এবং পুনরায় অস্তিত্ব ফিরে পাবে!

তাদের এই বিস্ময়, এই ঢাক ঢোল ও হৈ হুল্লোড় চলতেই থাকে। তারা বলে, সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে, নাকি তার ঘাড়ে জ্বিন চেপেছে?' তাদের ধারণামতে, একজন মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কারো পক্ষে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন মনগড়া কথা বলা সম্ভব নয় যা তিনি বলেননি, কিংবা একজন জ্বিনে ধরা লোকও এ ধরনের প্রলাপ বকতে বা আজব কথাবার্তা বলতে পারে!

এতসব হৈ চৈ শুধু এ জন্য যে, রসূল (স.) তাদেরকে বলেন, তোমরা মৃত্যুর পর আবার পুনরুজ্জীবিত হবে। অথচ তাদেরকে যখন প্রথমে একবার সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন পুনরায় সৃষ্টি করাতে বিস্ময়ের কী আছে? প্রথম সৃষ্টির এই বিস্ময়কর ঘটনার দিকে তাদের চোখ পড়ে না। অথচ প্রথম সৃষ্টিটাই বিস্ময়। এটা যদি তারা ভেবে দেখতো, তাহলে পুনরায় সৃষ্টির ব্যাপারে একটুও বিস্ময় প্রকাশ করতো না। তো আসলে তারা বিপথগামী। তাই কোরআন তাদের এই হৈ চৈ ও বিস্ময় সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছে!

'আসলে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারা আযাবে আছে এবং তারা দূরবর্তী গোমরাহীতে লিপ্ত।'

'আযাবে আছে' এ কথাটা দ্বারা আখেরাতের আযাবকে বুঝানো হতে পারে এবং আযাব নিশ্চিত ও অবধারিত বলে এভাবে বলা হয়ে থাকতে পারে যেন, তারা এখনই আযাবে আছে। দূরবর্তী গোমরাহীতে লিপ্ত হওয়ার অর্থ এমন গোমরাহীতে লিপ্ত হওয়া, যার পর সুপথ প্রাপ্তির আশা করা যায় না। এর অন্য একটা অর্থও হতে পারে যে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারা একই

সাথে এই পৃথিবীতে আযাবে ও গোমরাহীতে লিপ্ত থাকে। এটা একটা সূক্ষ্ম বিষয়। যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে না, সে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণায় ভোগে। দুনিয়ার জীবনে সে যতো দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, তার কোনো সুবিচার, প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ পাবে বলে তার আশা থাকে না। পার্থিব জীবনে মানুষ মাত্রই কিছু না কিছু বিপদ মুসিবত ভোগ করতে বাধ্য হয়। অথচ সে আখেরাতে এর বিনিময়ে সওয়াব পাবে এবং তার ওপর যে যুলুম করেছে সে এর পরিণতি ভোগ করবে-এ বিশ্বাস না থাকলে তার কষ্টে ধৈর্য ধারণের মনোবল ও সাহস থাকে না। সে আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং দুনিয়ার ছোটো বড়ো প্রতিটা কাজের ফল পাবে এই বিশ্বাস থাকলে তার পক্ষে সকল বিপদে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়। পৃথিবীতে কেউ যদি একটা ক্ষুদ্র সরিষায় পরিণত হয়ে কোন পাহাড় পর্বতে, আকাশে বা পৃথিবীতে লুকিয়ে থাকে, তাহলেও আল্লাহ তায়ালা তাকে খুঁজে বের করবেন। এই বিশ্বাসের জানালা যার খোলা থাকে না, সে নিসন্দেহে এই দুনিয়াতেই আযাব ও গোমরাহীতে লিপ্ত থাকে। তদুপরি আখেরাতের আযাবও তাকে ভোগ করতে হবে।

পক্ষান্তরে আখেরাতে বিশ্বাস একটা রহমত ও নেয়ামত। আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্য থেকে যারা একনিষ্ঠ এবাদাত, সত্যের অনুসরণ, ও হেদায়াতের অন্বেষণে লিপ্ত থাকে। তাদেরকে তিনি এই নেয়ামত ও রহমত দিয়ে থাকেন। খুব সম্ভবত আয়াত দ্বারা এই শেষোক্ত অর্থটাই বুঝানো হয়েছে আলোচ্য। যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, মনস্তাত্ত্বিক আযাব ও গোমরাহী এই দুটো শাস্তিই তারা ভোগ করে থাকে।

আখেরাতে অবিশ্বাসী এই লোকদেরকে এক ভয়ংকর পার্থিব শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। এই শাস্তি হলো, মাটির নীচে ধসে যাওয়া অথবা আকাশ ভেংগে তাদের মাথায় পড়া।

'তবে কি তারা তাদের সামনে ও পেছনে যে আকাশ ও পৃথিবী রয়েছে, তা দেখে না? .... (আয়াত ৯)

এটা একটা ভয়ংকর পার্থিব দৃশ্য। এ ধরনের ঘটনা কখনো কখনো তারা চাক্ষুস দেখে থাকে, কখনো বা উপলব্ধি করে।

পৃথিবীর ধসে যাওয়ার ঘটনা অহরহই ঘটে থকে এবং অনেকে তা দেখেও থাকে। অনেক গল্প উপন্যাসেও পঠিত হয়। আকাশের অংশ ভেংগে পড়ার অর্থ বজ্রপাত বা উল্কাপাত, তাও অনেক সময় ঘটে থাকে। এ সব ঘটনা মাঝে মাঝে লোকেরা দেখেছে বা শুনেছে। এ ধরনের ঘটনা অনেক উদাসীন লোককে সচকিত ও প্রকম্পিত করে। তারা কেয়ামতকে অসম্ভব মনে করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা যদি কেয়ামতের আগেই এই পৃথিবীতে শাস্তি দিতে চান, তবে যে কোনো সময় দিতে পারেন। যে আকাশ ও পৃথিবী তাদের আগে ও পেছনে তাদের ঘিরে রেখেছে, সেই আকাশ ও পৃথিবী থেকে আযাব আসতে পারে। এ আযাব অতি নিকটে রয়েছে। কেয়ামতের কতো দেরী তাও আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। বস্তুত পাপীরা ছাড়া আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে কেউ নিশ্চিত থাকতে পারে না।

'এতে প্রত্যেক বিনয়ী বান্দার জন্য নিদর্শন রয়েছে।'

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী থেকে যে কোন মুহূর্তে মাটি ধস বা বজ্রপাত বা উল্কাপাতের মাধ্যমে আযাব আসার সম্ভাবনায় বিনয়ী হৃদয়ের জন্য শিক্ষা রয়েছে, ফলে সে গোমরাহীতে লিপ্ত হয় না।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ

الْحَدِيْدَ ۝١٠ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ اِنِّيْ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ

وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۖ

وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝١٢ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا

يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۖ اِعْمَلُوْٓا

اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ۝١٣ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ

مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ

রুকু ২

১০. আমি (নবী) দাউদকে আমার কাছ থেকে (অনেকগুলো) অনুগ্রহ দান করেছিলাম; (এমনকি আমি পাহাড়কেও এই বলে আদেশ দিয়েছিলাম,) হে পর্বতমালা, তোমরাও তার সাথে আমার তাসবীহ পাঠ করো, (একই আদেশ আমি) পাখীকুলকেও দিয়েছিলাম, আমি তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম, ১১. (তাকে আমি বলেছিলাম, সে বিগলিত লোহা দ্বারা) তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করো এবং সেগুলোর কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করো, (কিন্তু এ শিল্পগত কলাকৌশলের পাশাপাশি) তোমরা তোমাদের নেক কাজও অব্যাহত রাখো; তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আমি তার সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করি। ১২. এমনিভাবে আমি সোলায়মানের জন্যে বাতাসকে (তার) অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম, তার প্রাতকালীন ভ্রমণ ছিলো এক মাসের পথ, আবার সান্ধ্যকালীন ভ্রমণও ছিলো এক মাসের পথ, আমি তার জন্যে (গলিত) তামার একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম; তার মালিকের অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কিছুসংখ্যক (কর্মী) তার সামনে থেকে (তার জন্যে) কাজ করতো (আমি বলেছিলাম), তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমার (ও আমার নবীর) আদেশ অমান্য করে, তাহলে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাবো। ১৩. সে (সোলায়মান) যা কিছু চাইতো তারা (জ্বিনরা) তার জন্যে তাই তৈরী করে দিতো, (যেমন সুরম্য) প্রাসাদ, (নানা ধরনের) ছবি, (বড়ো বড়ো) পুকুরের ন্যায় থালা ও চুলার ওপর স্থাপন করার (জন্তু-জানোয়ারসহ সবার আতিথেয়তার উপযোগী) বৃহদাকারের ডেগ; আমি বলেছি, হে দাউদ পরিবারের লোকেরা, তোমরা (আমার) শোকরস্বরূপ নেক কাজ করো; (আসলে) আমার বান্দাদের মাঝে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই (তাদের মালিকের) শোকর আদায় করে। ১৪. যখন আমি তার ওপর মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম, তখন তাদের (জ্বিন ও মানুষ কর্মীবাহিনীর) কেউই বাইরের লোকদের তার মৃত্যুর খবর দেখায়নি, (দেখিয়েছে) কেবল একটি (ক্ষুদ্র) মাটির পোকা, যা (তখনো) তার লাঠিটি

الْجِنُّ أَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٤﴾

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۚ كُلُوْا مِنْ

رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا

عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ

وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۚ وَهَلْ نُجْزِيْٓ اِلَّا

الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً

وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۚ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوْا رَبَّنَا

بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ

খেয়ে যাচ্ছিলো, (সোলায়মানের লাঠি পোকায়) খাওয়ায় যখন সে (মাটিতে) পড়ে গেলো, তখন (মাত্র) জ্বিনেরা বুঝতে পারলো (সোলায়মান আগেই মারা গেছে), তারা যদি (তখন) গায়বের বিষয় জানতো, তাহলে তাদের (এতোকাল) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে থাকতে হতো না; ১৫. 'সাবা' (নগরের) অধিবাসীদের জন্যে তাদের (স্বীয়) বাসভূমিতে আল্লাহর একটি কুদরতের নিদর্শন (মজুদ) ছিলো– দুই (সারি) উদ্যান, একটি ডান দিকে আরেকটি বাঁ দিকে, (আমি তাদের বলেছিলাম, এ থেকে পাওয়া) তোমাদের মালিকের দেয়া রেযেক খাও এবং (এ জন্যে) তোমরা তাঁর শোকর আদায় করো; (কতো) সুন্দর নগরী এটা! কতো ক্ষমাশীল (এ নগরীর) মালিক আল্লাহ তায়ালা। ১৬. (কিন্তু) পরে ওরা (আমার আদেশ) অমান্য করলো, ফলে আমি তাদের ওপর এক বাঁধভাংগা বন্যা প্রবাহিত করে দিলাম, তাদের সে (সুফলা) উদ্যান দু'টোও এমন দুটো উদ্যান দ্বারা বদলে দিলাম, যাতে থেকে গেলো বিস্বাদ ফল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল (বৃক্ষ)। ১৭. এভাবে আমি তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম, কেননা তারা (আমার নেয়ামত) অস্বীকার করেছে; আর আমি অকৃতজ্ঞ বান্দা ছাড়া কাউকেই শাস্তি দেই না। ১৮. আমি তাদের (সাবা নগরীর অধিবাসীদের) সাথে সেসব জনপদের ওপরও বরকত দান করেছিলাম, উভয়ের মাঝে আরো কিছু দৃশ্যমান জনবসতি আমি স্থাপন করেছিলাম এবং তাতে আমি (সফরের) মনযিলও নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম (তাদের আমি বলেছিলাম), তোমরা সেখানে (এবার) দিনে কিংবা রাতে নিরাপদে ভ্রমণ করো। ১৯. কিন্তু তারা বললো, হে আমাদের মালিক, আমাদের সফরের মনযিলসমূহ তুমি দূরে দূরে স্থাপন করো, তারা নিজেদের ওপর যুলুম করলো, ফলে আমিও তাদের (শাস্তি দিয়ে মানুষদের জন্যে) একটি কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করে দিলাম,

مُمَزَّقٍ ۭ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۱۹﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ

اِبْلِیْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِیْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۲۰﴾ وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَیْهِمْ

مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِیْ شَكٍّ ۭ وَرَبُّكَ

عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ﴿۲۱﴾

ওদের আমি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে (তছনছ করে) দিলাম, এতে প্রত্যেকটি ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দার জন্যেই (শিক্ষণীয়) নিদর্শন রয়েছে। ২০. ইবলীস তাদের (মোমেনদের) ব্যাপারে নিজের ধারণা সত্য পেয়েছে, কেননা তারা তাঁরই আনুগত্য করেছে, অবশ্য ঈমানদারদের একটি দল ছাড়া। ২১. (অথচ) তাদের ওপর শয়তানের তো কোনো রকম আধিপত্য ছিলো না (আসলে ঘটনাটি ছিলো), আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমাদের মাঝে কে আখেরাতের ওপর ঈমান আনে, আর কে সে ব্যাপারে সন্দিহান; তোমার মালিক তো সবকিছুর ওপরই নেগাহবান!

তাফসীর
আয়াত ১০-২১

এ অধ্যায়টাতে কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার কিছু দৃশ্য রয়েছে। অনুরূপভাবে, এতে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁর ইচ্ছাক্রমে তাঁর কোনো কোনো বান্দার জন্য কিছু কিছু প্রাকৃতিক শক্তিকে অনুগত ও বশীভূত করার দৃশ্যও রয়েছে যা সাধারণত কোনো মানুষের অনুগত হয় না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও ক্ষমতা মানব সমাজে প্রচলিত রীতিপ্রথা ও আদত অভ্যাসের অধীন নয়। এই সব দৃশ্যের মধ্য দিয়ে সেই সব জ্বিন ও শয়তান সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়, যাদেরকে কিছু কিছু পৌত্তলিক পূজা করে অথবা তাদের কাছ থেকে অদৃশ্য তথ্য জানতে চায়। অথচ তারা অদৃশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ। এ সব দৃশ্য থেকে আরো জানা যায়, কি কি উপায়ে শয়তান মানুষের ওপর জেঁকে বসে ও তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে অথচ মানুষ সেচ্ছায় তাকে সুযোগ না দেলে সে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। এ থেকে আরো জানা যায় যে, মানুষের কিছু কিছু গোপনীয় কাজকে বাস্তব ঘটনার আকারে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন, যাতে তারা সে জন্য আখেরাতে ফল পায়। এ অধ্যায়টা প্রথম অধ্যায়ের মতই আখেরাতের বর্ণনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-এর মোজেযা

'আমি নিজের পক্ষ থেকে দাউদকে অনুগ্রহ করেছিলাম .....' *(আয়াত ১০)*

'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে বারবার আমার মহিমা ঘোষণা করো। আর পক্ষীকূলকেও আমি এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলাম।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আ.)-কে অলৌকিক ধরনের সুললিত কণ্ঠস্বর দেয়া হয়েছিল! এই কণ্ঠস্বর দিয়ে তিনি ধর্মীয় তাসবীহ পাঠ করতেন। বাইবেলের 'প্রাচীন পুস্তক' বা ওল্ড টেস্টামেন্টে-এর কিছু তাসবীহ উদ্ধৃত হয়েছে, যার শুদ্ধাশুদ্ধ আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। সহীহ

বোখারীতে আছে যে, রসূল (স.) হযরত আবু মূসা আশয়ারীর কণ্ঠস্বর শুনে বলেছিলেন, 'এই ব্যক্তি হযরত দাউদের বংশধরের কণ্ঠস্বরের কিছুটা পেয়েছে।'

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হযরত দাউদকে প্রদত্ত অনুগ্রহের একটা চিত্র এমন দেখানো হয়েছে, যা থেকে মনে হয়ে, তাঁর তাসবীহ পাঠে এমন একাগ্রতা ও স্বচ্ছতা ছিলো যে, তার ও প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে আর কোনো আড়াল থাকতো না। আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ পাঠের সময় তার সাথে পাহাড় পর্বত ও পক্ষীকূল এমনভাবে কণ্ঠ মেলাতো যে, সকলে একাকার হয়ে এই তাসবীহর সাথে মিলিত হতো। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া এমন অলৌকিক একাত্মতা ও স্বচ্ছতা কেউ অর্জন করতে পারে না।

হযরত দাউদ (আ.)-এর কণ্ঠ থেকে যখনই আল্লাহ তায়ালার মহিমা কীর্তনকারী শব্দ উচ্চারিত হতো, অমনি পাহাড় পর্বত ও পক্ষীকূল সেই সাথে আওয়ায তুলতো এবং সমগ্র প্রাকৃতিক জগত থেকে একই সূর প্রতিধ্বনিত হতো। এ সময় প্রতিটা সৃষ্টি আপন স্রষ্টার দিকে নিবিষ্ট হতো। এই মুহূর্তগুলো এমন উপভোগ্য ও মনোমুগ্ধকর যে, জীবনের কোনো এক মুহূর্তেও যে ব্যক্তি এর অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, সে এর স্বাদ বুঝবে না।

'আমি তার জন্য লোহা গলিয়ে দিয়েছিলাম।'

এটা হযরত দাউদের প্রতি বর্ষিত আরেকটা অনুগ্রহ। আয়াতের ভাষা থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে, এটা একটা অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা ছিলো। ব্যাপারটা এমন ছিলো না যে, লোহাকে উত্তপ্ত করে নরম বানিয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে বিভিন্ন আকৃতি দেয়া হয়েছিলো। বরং এটা ছিল একটা অলৌকিক ব্যাপার এবং লোহাকে নরম করার প্রচলিত সকল উপকরণ ছাড়াই নরম করা হয়েছিলো। প্রকৃত সত্য আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এ কথা যদিও সত্য যে, আগুনে উত্তপ্ত করে লোহা গরম করার পন্থা জানিয়ে দেয়াও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটা উল্লেখযোগ্য অনুগ্রহ গণ্য হতো। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাভংগী থেকে মনে হয়, এটা একটা অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা এখানে যে দৃশ্যগুলো দেখানো হয়েছে সবই অলৌকিক ও অপ্রচলিত ঘটনাবলীর দৃশ্য।

'আমি বলেছিলাম, পূর্ণ মাপের বর্ম নির্মাণ করো এবং সংযোজনকালে পরিমাপ ঠিক রেখ।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর আগে এই সব বর্ম আস্ত আস্ত লৌহ শীটের আকারে তৈরী করা হতো। এই সব শীট শরীরকে নিরাপদ করতো বটে। তবে সেই সাথে খুব ভারিও করে তুলতো। তাই আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদকে নির্দেশ দিলেন যে, একটার মধ্যে আরেকটা পাতলা, ঢেউ তোলা ও নরম শীটে ঢুকিয়ে হাল্কা বর্ম বানাও, যাতে শরীর চালনার সাথে সাথে ওগুলোকে চালনা করা সহজ হয়। আর এই পাতলা শীটগুলোকে ঘন ঘন বুনে দিতে আদেশ দিলেন, যাতে এগুলো এতটা মযবুত হয় যে, বর্শা বা তীর এগুলোকে ভেদ করতে না পারে। সংযোজনকালে পরিমাপ ঠিক রাখার অর্থ এটাই। এই পুরো ব্যাপারটাই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ ও এলহাম তথা জ্ঞান সঞ্চালনের মাধ্যমে শেখানো হয়েছিলো।

অতপর হযরত দাউদ (আ.) ও তাঁর বংশধরকে বলা হয়, 'আর তোমরা সৎ কাজ কর।' তাদের সকল কাজের ক্ষেত্রে সততার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সব কাজ দেখছেন এবং সব কাজের প্রতিফল দেবেন, কোন কাজই তার প্রতিফলের বাইরে থাকবে না-এ কথা মনে রাখতে হবে।

এ ছিলো হযরত দাউদ (আ.)-কে প্রদত্ত অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিনি হযরত সোলায়মানকেও (আ.) আরো কিছু অনুগ্রহ প্রদান করেন।

'আর সোলায়মানের জন্য অনুগত করেছিলাম বাতাসকে ....' (আয়াত ১২-১৩)

হযরত সোলায়মানের জন্য বাতাসকে অনুগত করা সম্পর্কে বহু বর্ণনা আছে। সে সব বর্ণনায় ইসরাঈলী প্রভাব সুস্পষ্ট অবশ্য ইহুদীদের মূল পুস্তকাদিতে এ সম্পর্কে তেমন কিছুই লেখা নেই। এ সব বর্ণনা থেকে আমাদের বিরত থাকাই ভালো। কোরআনে যতটুকু আছে, ততটুকুকে যথেষ্ট মনে করাই নিরাপদ। আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা বাতাসকে হযরত সোলায়মানের অনুগত করে দিয়েছিলেন। এই টুকু শাব্দিক তথ্যের বাইরে আমাদের যাওয়া অনুচিত। এই বাতাস সকালবেলা একটা নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে (সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে যে, ওটা পবিত্র ভূমি) হযরত সোলায়মানকে নিয়ে যাত্রা করতো এবং তা একমাস স্থায়ী হতো। আবার বিকালবেলা প্রত্যাবর্তন করতো এবং তাও একমাস স্থায়ী হতো। তার সকাল ও সন্ধ্যার এই ভ্রমণে হযরত সোলায়মান একটা সুবিধা লাভ করতেন এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশক্রমে তা বাস্তবায়িত করতেন। এর ওপর আমি আর কোনো ব্যাখ্যা সংযোজন করতে পারবো না। কেননা তা করতে গেলেই ভিত্তিহীন ও প্রমাণহীন গল্পে জড়িয়ে পড়তে হবে।

'আমি তার জন্য প্রবাহিত করেছিলাম এক তরল তামার ঝর্ণা।'

'আল ফেতর' শব্দের অর্থ তামা। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, হযরত দাউদের জন্য লোহা গলিয়ে দেয়ার মতো এটা হযরত সোলায়মানের মোজেযা। এটা দুটো উপায়ে হতে পারে। প্রথম, আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য ভূগর্ভের গলিত তামার কোনো ঝর্ণা আগ্নেয়গিরির মাধ্যমে বের করে দিয়ে থাকতে পারেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তায়ালা তাকে এলহাম তথা গোপন ওহীর মাধ্যমে তামা গলানোর প্রযুক্তি শিখিয়ে দিয়ে থাকতে পারেন, যাতে তা তরল হয়ে যায় এবং তা দিয়ে ঢালাই ও নির্মাণের কাজ করা যায়। যেভাবেই হোক, এটা ছিলো আল্লাহ তায়ালার এক বিরাট অনুগ্রহ।

'তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তার সামনে কিছু জ্বিন কাজ করতো।'

অর্থাৎ বাতাসের মতো একদল জ্বিনকেও আল্লাহ তায়ালা তার অনুগত করে দিয়েছিলেন। তারা আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে তার অধীনে ও আদেশে কাজ করতো। শাব্দিক অর্থে মানুষ দেখতে পায় না এমন প্রত্যেক গোপন বস্তুকে জ্বিন বলা হয়। তবে আল্লাহ তায়ালার এক ধরনের সৃষ্ট জীবও আছে, যাকে তিনি জ্বিন নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যতটুকু উল্লেখ করেছেন, তার চেয়ে বেশী কিছু আমরা জানি না। তিনি এখানে জানাচ্ছেন যে, তাদের একটা দলকে আল্লাহ তায়ালা হযরত সোলায়মানের অনুগত করেছিলেন। তাদের কেউ হযরত সোলায়মানের আদেশ বা নিষেধ লংঘন করলে আল্লাহ তায়ালার আযাবে পতিত হবে। 'তাদের মধ্য থেকে কেউ আমার আদেশ অমান্য করলে আমি তাকে জাহান্নামের আযাব ভোগ করাবো।'

অনুগত করার কাহিনী শেষ করার আগে এই মন্তব্যটা এভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য সম্ভবত জিনেরা আল্লাহর অনুগত সৃষ্টি-এটা প্রমাণ করা। কেননা মোশরেকদের কোনো কোনো গোষ্ঠী আল্লাহ তায়ালার পাশাপাশি জ্বিনদেরও উপাসনা করতো। অথচ সেই মোশরেকদের মতোই জ্বিনরাও আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হলে শাস্তি পাবে।

হযরত সোলায়মানের অনুগত হিসেবে তারা এসব কাজ করতো,

'তার জন্য তার ইচ্ছামতো বড় বড় উপাসনালয়, মূর্তি, চৌবাচ্চার মতো বড় বড় পাত্র ও বড় বড় ডেগসমূহ নির্মাণ করতো।'

'মাহারীব' অর্থ এবাদাতের স্থান। আর 'তামাছীল' দ্বারা বুঝানো হয়েছে তামা কিংবা কাঠের তৈরী মূর্তি বা ভাস্কর্য। 'জাওয়াব' 'জাবিয়ার' বহুবচন। এর অর্থ পানি সংরক্ষণের চৌবাচ্চা। জ্বিনেরা হযরত সোলায়মানের জন্য চৌবাচ্চা সদৃশ বড় বড় খাবারের পাত্র বানাতো। তারা রান্না

করার জন্য যে সব ডেগ বানাতো তা এতো বড় বড় ছিল যে, সেগুলোর একাংশ পুতে রাখা হতো। এ সব হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক অনুগত বানানো জ্বিনেরা হযরত সোলায়মানের জন্য যে সব কাজ করতো তার কিছু নমুনা। এ গুলোর সবই মোজেযা ও অলৌকিক ঘটনা এবং আল্লাহ তায়ালারই করা। এর একমাত্র ব্যাখ্যা সম্ভবত এটাই। অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়ার কোনই উপায় নেই।

এ বর্ণনার শেষ ভাগে হযরত দাউদের বংশধরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

'হে দাউদের বংশধর, তোমরা শোকরের কাজ কর।'

অর্থাৎ আমি দাউদ ও সোলায়মানের মাধ্যমে এত কিছুকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিলাম। কাজেই হে দাউদের বংশধর। তোমরা অহংকার ও দাম্ভিকতা দেখানোর জন্য নয়-বরং আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কাজ করো। বস্তুত সৎ কাজ হচ্ছে আল্লাহর বিরাট কৃতজ্ঞতা।

'আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ খুবই কম।'

কোরআনে কিসসা কাহিনীর ওপর অনেক মন্তব্য রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে এ মন্তব্যটা অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। এটা একাধারে বর্ণনামূলকও এবং নির্দেশনামূলকও। একদিকে এটা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও নেয়ামতকে এতো বড় করে দেখিয়েছে যে, খুব কম লোকই এর শোকর আদায় করতে সক্ষম। অপরদিকে এতে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের পরিপূর্ণ শোকর আদায়ে মানুষের অক্ষমতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তারা যত বেশী শোকর আদায় করুক, এর দাবী পূরণ করতে পারবে না। আর যদি শোকর আদায়ে গাফেলতি করে ও শৈথিল্য দেখায়, তাহলে তো কথাই নেই।

সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন নেয়ামত ও অনুগ্রহের শোকর আদায় করবেই বা কিভাবে? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তবে গণনা করে শেষ করতে পারবে না। এ সব নেয়ামত তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং তার আপদমস্তক নেয়ামতে ডুবে আছে। তার সত্ত্বার ভেতরেও অগণিত নিয়ম বিরাজ করছে। এমনকি সে নিজেই একটা মস্তবড় নেয়ামত। ধরা যাক, আমরা কিছু লোক একত্রে বসে আছি, কথাবার্তা বলছি, মতামত বিনিময় করছি, পরস্পরকে আকর্ষণ করছি এবং আমাদের মনে যা কিছু আসছে, তা মুখ দিয়ে প্রকাশ করছি। ইতিমধ্যে আমাদের বিড়াল 'মিনি' এসে আমাদের চারপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলো। মনে হলো, সে কিছু খুঁজছে। হয়তো বা আমাদের কাছ থেকে কিছু চাইতে তার ইচ্ছা করছে। কিন্তু সে কথা বলতে পারছে না। আমরাও বুঝতে পারছি না। এক সময় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে পানি চাইছে। সে আসলে তাই চাইছিলো। সে তীব্র পিপাসায় কাতর ছিলো। অথচ সে বলা তো দূরের কথা, ইশারাও করতে অক্ষম। এই সময়ে আমরা আল্লাহ তায়ালার দেয়া এক দুর্লভ নেয়ামত বাক শক্তির অধিকারী হয়েছি। সেই সাথে বোধশক্তির এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তিরও। তৎক্ষণাত আমাদের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো, কিন্তু এত বড় নেয়ামতের এতোটুকু শোকর কি যথেষ্ট?

আমরা দীর্ঘদিন সূর্যের দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলাম। সূর্যের যেটুকু আলো আমাদের কাছে কখনো কখনো আসতো, তা অতি সামান্য। আমাদের এক একজন তার সামনে গিয়ে নিজের মুখ, হাত, বুক, পিঠ, পেট ও পায়ে যতটুকু পারে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ততটুকু সূর্যরশ্মী লাগাতো। তারপর অন্য ভাইয়ের জন্য জায়গা খালি করে চলে যেত। সেও যতোটুকু পারতো, এই নেয়ামতকে উপভোগ করতো। এরপর যেদিন সর্ব প্রথম সূর্যের আলো পেলাম, সেদিনের কথা আমি ভুলতে পারি না। আমরা প্রত্যেকে কতো খুশী হয়েছিলাম তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। এরপর প্রতিদিন সূর্য ওঠে। আমরা আল্লাহর শোকর করি।

এখন এই সূর্যরশ্মী আমরা প্রতিদিন কতো ভোগ করছি? কতো সূর্য স্নান করে চলেছি? আল্লাহর এ নেয়ামতে কিভাবে ডুবে আছি? বিনাচেষ্টায়, বিনাকষ্টে, বিনামূল্যে প্রাপ্ত এই রাশিরাশি নেয়ামতের কতটুকু শোকর আদায় করছি?

এভাবে যদি আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি নেয়ামত পর্যবেক্ষণ করি, তবে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়ে এবং সর্ব প্রকারের চেষ্টা সাধনা করেও এ কাজ শেষ করতে পারবো না। এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একটা নেয়ামত মাত্র। যে যতোটুকু পারে, একনিষ্ঠভাবে এর শোকর আদায় করতে পারে।

এবার এই কাহিনীর শেষ দৃশ্যে উপনীত হতে চাই। এটা হচ্ছে হযরত সোলায়মানের ইন্তেকালের দৃশ্য। তিনি ইন্তেকাল করলেন। অথচ জ্বিনরা তখনও তার অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তারা টেরও পেল না যে, তিনি মারা গেছেন। অবশেষে তিনি যে লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেটা যেদিন পোকায় খেয়ে দিলো এবং তিনি পড়ে গেলেন, কেবল তখনই তারা টের পেলো। (আয়াত ১৪)

বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন মারা যান, তখন তিনি তার লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তার অনুগত জ্বিনেরা আসা যাওয়া করছিল এবং কঠিন পরিশ্রমের কাজ করছিলো। তারা বুঝতেও পারেনি যে, তিনি মারা গেছেন। অবশেষে এক ধরনের কীট এলো কারো কারো মতে, এটা ছিল ঘুন পোকা। যা কাঠ খেয়ে জীবন ধারণ করে। এই কীট বাড়ীঘরের ছাদ, দরজা, খুঁটি সবই খেয়ে নষ্ট করে এবং ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটায়। মিশরের কোনো কোনো গ্রামে এই কীটের ভয়ে একেবারেই কাঠ ব্যবহার না করে বাড়ীঘর বানানো হয়।

হযরত সোলায়মানের ঘুনে খাওয়া লাঠি যখন ভেতর থেকে জীর্ণ হয়ে পড়লো, তখন তা আর তার ভার বহন করতে পারলো না। ফলে হযরত সোলায়মান মাটিতে পড়ে গেলেন। জ্বিনেরা কেবল তখনই তার মৃত্যুর কথা জানলো। আর তখনই

'জ্বিনরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি অদৃশ্য জানতো, তাহলে এমন লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে এত দীর্ঘক্ষণ ভুগতো না।'

এই হলো সেই সব জ্বিনের অবস্থা, যাকে কোনো কোনো মানুষ পূজা পর্যন্ত করে। সত্যিকার অর্থে তারা আল্লাহর এক বান্দার অনুগত ছিলো এবং নিজেদের অতি নিকটে ঘটে যাওয়া অদৃশ্য ঘটনাটা জানতে পারেনি। অথচ কিছু মূর্খ লোক তাদের কাছ থেকে অদৃশ্য তথ্য জানতে চেষ্টা করে।

সাবা জাতির ইতিহাস

হযরত দাউদের বংশধরদের কাহিনীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান ও তাঁর নেয়ামতের শোকরের নমুনা দেখানো হয়েছে, আর ঠিক এর বিপরীত অকৃতজ্ঞতার নমুনা দেখানো হয়েছে পরবর্তীতে সাবার কাহিনীতে। সূরা নামলে হযরত সোলায়মান ও সাবার রাণীর ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এখানে হযরত সোলায়মানের কাহিনীর পর সাবার কাহিনী আসছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে সাবার যে কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে, তা হযরত সোলায়মান ও সাবার রাণীর ঘটনার পরে ঘটেছে।

আমার এ ধারণার কারণ, এখানে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাতে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের প্রাচুর্যে সাবার দম্ভ ও অহংকার, তাদের পতন ও ছিন্নভিন্ন হয়ে চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়ার উল্লেখ রয়েছে। অথচ সূরা নামলে যে রাণীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার আমলে তারা বিশাল সাম্রাজ্য ও বিপুল সুখ ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলো। কেননা হুদহুদ পাখী হযরত সোলায়মানের কাছে সাবার রাজ্যের বিপুল ধন ঐশ্বর্যের খবর দিয়েছিলো। এরপর জানানো হয়েছে যে, সেই রাণী

হযরত সোলায়মানের নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সুতরাং এখানে তাদের পতনের যে কাহিনী, তা রাণীর ইসলাম গ্রহণের পরে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের অকৃতজ্ঞতা ও অহংকারের পরিণামে ঘটেছে।

এই কাহিনীর শুরুই হয়েছে সাবার প্রাচুর্যের ও তাদেরকে শোকরের আদেশ দানের বিবরণের মধ্য দিয়ে।

'সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের আবাসভূমিতে একটা নিদর্শন ছিল...' (আয়াত ১৫)

সাবা একটি জাতির নাম। তারা দক্ষিণ ইয়ামানে বসবাস করতো। তারা এমন উর্বর ভূমিতে বাস করতো, যার কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারা সভ্যতার এত উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পেরেছিল যে, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের সাগর থেকে আগত মৌসুমী বৃষ্টির পানির ওপর তারা পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলো। তারা এমন একটা প্রাকৃতিক জলভান্ডার গড়ে তুলেছিল, যার দু'প্রান্তে ছিল দুটো পাহাড়।

তারা আল্লাহর শোকরগোযারী ত্যাগ করলো, সৎকাজ ত্যাগ করলো, আল্লাহ প্রদত্ত সদাচরণ ত্যাগ করলো। ফলে আল্লাহ তায়ালা পাকও তাদের জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশ কেড়ে নিলেন। তাদের ওপর প্রবল বন্যা চাপিয়ে দিলেন। যে বন্যা তাদের বাঁধ ভেংগে ফেলে প্রচন্ড গতিতে বন্যার পানি জনপদে ঢুকে পড়ে এবং তা গোটা এলাকাকে প্লাবিত করে ফেলে। বন্যার পানি শুকিয়ে গেলে গোটা এলাকা পানিশূন্য হয়ে পড়ে এবং খরায় আক্রান্ত হয়। এর ফলে তদের বাগানগুলো এবং খামারগুলো মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়, যেখানে সুস্বাদু ও মিষ্টি ফলমূলের পরিবর্তে জন্ম নেয় কাঁটাযুক্ত ও বিস্বাদ ফলযুক্ত কিছু বন্য গাছপালা। সে কথাই নিচের আয়াতে বলা হয়েছে,

'........আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটো উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল।' ....(আয়াত ১৬)

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফুরীর শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এখানে 'কুফুরী' বলতে খুব সম্ভব অকৃতজ্ঞতাকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ কুফর শব্দের একটি অর্থ অকৃতজ্ঞতাও।

সাবাবাসী তখনও তাদের নিজ নিজ এলাকা ও ঘর বাড়ীতে বহাল তবিয়তেই ছিলো। তবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশার মাঝে ফেলে রেখেছিলেন। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেননি। কারণ তখনও মক্কা ও বায়তুল মাকদেস এর সাথে তাদের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিলো। ইয়েমেনের উত্তর প্রান্তের সাবা নগরী পরিপূর্ণ আবাদ ছিল এবং পবিত্র নগরীগুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও নিরাপদ ছিলো। লোক চলাচলও ছিলো ভালো। নিচের আয়াতে সেদিকে ইংগিত করেই বলা হয়েছে,

'তাদের এবং যে সব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম। .... (আয়াত ১৮)

ওপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, পথিকরা তাদের নিজ নিজ জনপদ থেকে বের হতো এবং রাতের অন্ধকার নেমে আসার আগেই অন্য জনপদে প্রবেশ করতে পারত। কারণ তখন পথের দূরত্ব ছিলো সীমিত এবং নিরাপদ। গন্তব্যস্থলগুলো ছিল পরস্পর নিকটবর্তী। কাজেই চলার পথে যাত্রীদের তেমন কোনো অসুবিধাই হতো না। বরং ভ্রমণ তখন আরামদায়কই ছিলো।

এই সাবাবাসীদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, তারা প্রথম আসমানী গযব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করেনি। আগের ছিনিয়ে নেয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পাওয়ার

জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেনি। বরং নির্বোধ ও মূর্খদের মতো আল্লাহর নিকট দাবী জানিয়ে বলে উঠলো, 'হে প্রভু! আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও! কি অদ্ভুত এদের দাবী! ভ্রমণের দূরত্ব কমানোর পরিবর্তে আরও বাড়িয়ে দিতে বলছে? অথচ এর ফলে তারা বছরে এক -দু'বারের বেশী ভ্রমণ করতে পারবে না। কাছাকাছি দূরত্বের ভ্রমণ তাদের ভালো লাগলো না। তাই ভ্রমণ তৃপ্তি মিটানোর জন্য তারা পথের দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে বলছে। এটাকে এক ধরনের বাড়াবাড়ি এবং অত্যাচারই বলা চলে। আর এই বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার তারা নিজের সাথেই করছে। তাই বলা হয়েছে,

'তারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছিলো।'

তাদের দাবী পূরণ করা হয়েছে সত্য। তবে অর্বাচীন ও দাম্ভিক জাতিদের বেলায় যা ঘটে থাকে, তাদের বেলায়ও তাই ঘটেছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে,

'ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলাম .... (আয়াত ১৯)

অর্থাৎ বাস্তুভিটা এবং বন্ধনহারা হয়ে তারা উদ্বাস্তুদের মত গোটা আরব দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে তাদের আর কোন অস্তিত্বই বাকী থাকলো না। তারা রূপকথার বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। মানুষ এসব কাহিনী বলে বেড়াতে থাকে। তাদের এই ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। তাই বলা হয়েছে,

'নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।'

আলোচ্য আয়াতে শোকরগোযারীর পাশাপাশি ধৈর্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের মুহূর্তে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। মোটকথা সাবাবাসীদের ঘটনা থেকে উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যার পাশাপাশি আরও একটা ব্যাখ্যা দেয়া যায়, আর তা হচ্ছে, 'প্রকাশ্য জনপদ' বলতে ক্ষমতাধর ও কর্তৃত্বের অধিকারী জনপদ বুঝায়। অর্থাৎ যখন সাবাবাসীরা একটা দরিদ্র জাতিতে পরিণত হয়ে পড়লো, মরুভূমিতে বসবাস করতে করতে তাদের জীবন নিতান্ত নিরানন্দ ও শুষ্ক হয়ে পড়েছিল। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসবাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না, পানির জন্য এবং চারণভূমির জন্য তাদেরকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটাছুটি করতে হতো, তখন তারা অস্থির হয়ে পড়েছিলো, অধৈর্য হয়ে পড়েছিলো। তাই আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানিয়ে বললো, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও' .... অর্থাৎ আমাদের ভ্রমণের সংখ্যা কমিয়ে দাও। কারণ আমরা অধিক ভ্রমণের ফলে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। .... কিন্তু তাদের এই দোয়া কবুল হওয়ার মতো কোনো আমল বা আচরণ তাদের দ্বারা প্রকাশ পায়নি; বরং তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় দাম্ভিক ও বেপরোয়া হয়ে উঠতো। আর বিপদাপদের মুহূর্তে হয়ে উঠতো অধৈর্য। এ কারণে আল্লাহ পাক তাদের এই অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। পরবর্তিতে তারা কেসসা কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়ে পড়ে। তাই এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপসংহারে বলা হয়েছে,

'নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, ...

এই উপসংহার পূর্ববর্তী ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞতার কারণে সাবাবাসীদেকে যে পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন ও উপদেশ স্বরূপ। যা হোক, এটা আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা। প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

ঘটনায় শেষ দিকে এসে এখন বক্তব্য তার সীমিত গন্ডি থেকে বের হয়ে এসে চলে যাচ্ছে আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, মযবুত নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ নিয়ম-নীতির বিশাল এক গন্ডির দিকে। এখানে এসে গোটা ঘটনার অন্তরালে নিহিত ও লুকায়িত মূল তাৎপর্য ও রহস্যের দিকে ইংগিত করে বলা হচ্ছে,

'আর তাদের ওপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলো। ফলে তাদের মধ্যে মোমেনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করলো ...... (আয়াত ২০ ও ২১)

তারা এই ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করার ফলেই এই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে শয়তানের ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলো, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত অল্প সংখ্যক খাঁটি মোমেন ব্যতীত সবাই শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়েছে। এটাই নিয়ম। প্রত্যেক দলেই কিছু সংখ্যক লোক এমন থাকে যারা মযবুত ঈমানের অধিকারী হয় এবং তারা শয়তানের প্ররোচনা ও ধোঁকাবাজির ঊর্ধে থাকতে পারে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সত্যের অস্তিত্ব চিরকালই থাকবে। এই সত্যকে চিনে ও জেনে গ্রহণ করতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশেও এই সত্যের ওপর টিকে থাকতে হবে। যারা এটা করতে সক্ষম হয় তাদের ওপর শয়তানের কোন কর্তৃত্বই চলে না। তারা সর্বদা শয়তানের নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধে থাকতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর শয়তানকে চাপিয়ে দিয়ে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য চিহ্নিত করতে চান। তাই যারা সত্যের ধারক বাহক তারা কখনও শয়তানের কূটচালের শিকার হয় না বরং যাদের কাছে সত্য কাম্য নয় এবং যারা সত্যের সন্ধানও করে না কেবল তারাই শয়তানের চক্রান্তের শিকার হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। মানুষের মনে পরকালের বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকলে বিভ্রান্তির জালে সে কখনও আটকা পড়বে না। শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে সে মুক্তি পাবেই। কিন্তু যারা পরকালের ব্যাপারে সংশয় সন্দেহের শিকার তারা অবশ্যই বিভ্রান্তিতে ভুগবে, শয়তানের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়বে। তাদের ভাগ্যে আল্লাহর সাহায্যও নেই এবং পরকালের মুক্তিও নেই।

মানুষের জীবনে কি ঘটবে, তা ঘটার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা জানেন। তবে বাস্তব জগতে তা ঘটার পরই সে সংক্রান্ত কর্মফল নির্ধারণ করেন।

সব কিছুর নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ পাক। অপরদিকে আল্লাহ পাক অদৃশ্য জগত ও অনাগত-ভবিষ্যত জীবনের পরিণতি ও ফলাফলের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য কোনরূপ অবাধ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান না করেই মানুষ জাতিকে বিভ্রান্ত করার একটা সুযোগ শয়তানকে দিয়ে রেখেছেন। এ দুটো বিষয়ই হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ একটা চাক্ষুষ সত্য। এই সত্য কেবল সাবা জাতির ঘটনাবহুল ইতিহাসের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে প্রতিটি জাতির বেলায়ই তা প্রযোজ্য। কাজেই সাবা জাতির ঘটনা বর্ণনার পর যে উপসংহার টানা হয়েছে তা গোটা মানব জাতির জন্য প্রযোজ্য। কারণ আলোচ্য ঘটনার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো হেদায়াত ও গোমরাহীর কারণ, এর শেষ পরিণতি ও ফলাফল। তাই বলা হয়েছে,

'তোমার প্রভু সব কিছুর রক্ষক'

অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নেই। সব কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কাজেই কোন কিছুর বিচ্যুতির সুযোগ নেই এবং হারিয়ে যাওয়ারও ভয় নেই।

আলোচ্য সূরার প্রথম পর্বে পরকালীন জীবনের বিষয়াদি স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্বেও সেই একই বিষয় পুনরায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। 'বল, তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত .... (আয়াত ২২-২৭)

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ
ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ
قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۙ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ
لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا
نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ۚ كَلَّا ۚ بَلْ
هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

রুকু ৩

২২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে শরীক মনে করো তাদের ডাকো, তারা (আসমানসমূহ ও যমীনের) এক অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, এ দুটো বানানোর ব্যাপারেও তাদের কোনো অংশ নেই, না তাঁর কোনো সাহায্যকারী রয়েছে। ২৩. (কেয়ামতের দিন) তাঁর সামনে কারো সুপারিশ কাজে আসবে না, অবশ্য তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যক্তি বাদে, এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূরীভূত করে দেয়া হবে, তখন ফেরেশতারা (একে অপরকে) বলবে, কি ব্যাপার, সে বলবে, তোমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। তারা বলবে (হাঁ তাই) সত্য, তিনি সমুচ্চ, তিনি মহান। ২৪. (হে নবী,) তুমি জিজ্ঞেস করো, (তোমরাই) বলো, কে আছে তোমাদের আসমানসমূহ ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করে; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা; (এখানে) আমরা কিংবা তোমরা, হয় আমরা উভয়ে হেদায়াতের উপর আছি না হয় উভয়ে সুস্পষ্ট গোমরাহীর (মধ্যে) আছি। ২৫. তুমি (এদের আরো) বলো, আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না, আবার তোমরা যা করে বেড়াচ্ছো সে ব্যাপারেও আমাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। ২৬. (এদের আরো) বলো, (কেয়ামতের দিন) আমাদের মালিক আমাদের (ও তোমাদের) সবাইকে (এক জায়গায়) জড়ো করবেন, অতপর তিনি আমাদের মধ্যে (হেদায়াত ও গোমরাহীর) যথার্থ ফয়সালা করে দেবেন; কেননা তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বিচারক, প্রবল প্রজ্ঞাময়। ২৭. (হে নবী,) তুমি (আরো) বলো, তোমরা আমাকে সেসব কিছু দেখাও, যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক বানিয়ে তাঁর সাথে মিলিয়ে রেখেছো, জেনে রেখো; তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি কুশলী।

তাফসীর

আয়াত ২২-২৭

'বল, তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর ....।' (আয়াত নং ২২)

ওপরের আয়াতটি একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ আসমান ও যমীন তথা গোটা বিশ্ব জগতের সামনে রাখা হচ্ছে। এতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো আদৌ কোন ক্ষমতাই নেই। জীবন ও জগতের এই বিশাল ক্ষেত্রে তাদের একরত্তি পরিমাণ কর্তৃত্ব নেই। যারা তাদের ভক্ত তারা ইচ্ছা করলে তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারে। যদি সত্যিই তারা কোনো কিছুর কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে নিজেরাই সেটা ঘোষণা করে জানিয়ে দিক। কিন্তু সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ 'তারা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছুরও মালিক নয়' ...... সব কিছুর প্রকৃত মালিক ও নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। তিনি ব্যতীত আর কারও কোনো ক্ষমতা নেই। বিশেষ কল্পিত দেব-দেবীদের তো কোনো কিছুই করার নেই। এই বিশাল জগতের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে এদের কি আদৌ কোনো কর্তৃত্ব আছে?

নিখিল বিশ্বের কোন কিছুরই একক মালিকানা এদের নেই। এমনকি যৌথ বা শরীকানা ভিত্তিতেও নেই। সে কথাই এখানে বলা হয়েছে, 'এতে তাদের কোনো অংশ নেই' .... শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাক এদের কারও সাহায্য সহযোগিতাও নেন না। তাই বলা হয়েছে, 'এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়।'

পরবর্তী আয়াতে আর এক ধরনের কল্পিত শরীকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, এরা হচ্ছে ফেরেশতা। এদেরকে তৎকালীন আরব মোশরেকরা আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো এবং মনে করতো যে, এরা তাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। খুব সম্ভবত এদের সম্পর্কেই তারা বলতো,

'আমরা কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যই এদের উপাসনা করি' ....

কিন্তু আল্লাহ পাক অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন,

'যার জন্য অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না' .... (আয়াত ২০)

সুপারিশ বা শাফায়াত এর গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করছে আল্লাহর অনুমতির ওপর। আল্লাহ পাক কখনই তাঁর প্রতি অবিশ্বাসী কোনো বান্দার জন্য সুপারিশের অনুমতি কাউকে দেবেন না। কাজেই যারা কাফের ও মোশরেক, তাদের জন্য সুপারিশ জানানোর অনুমতি ফেরেশতাদেরকেও দেবেন না এবং প্রথম থেকেই যারা সুপারিশের অনুমতিপ্রাপ্ত বলে গণ্য তাদেরকেও দেবেন না।

সুপারিশ জানানোর প্রয়োজন যে মুহূর্তে দেখা দেবে, সেই ভয়াবহ ও মহা আতংকের মুহূর্তটির প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে।

'যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা পরস্পরে বলবে .... (আয়াত ২০)

এই মুহূর্তটি সত্যিই একটি কঠিন দিনের মুহূর্ত। যেদিন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে এবং অপেক্ষা করতে থাকবে যে, কেউ আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য একটু সুপারিশ করে কিনা। এই অপেক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকবে। চোহারা মলিন হয়ে আসবে। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসবে। মহান আল্লাহর দরবার হতে সুপারিশের অনুমতি ঘোষণার অপেক্ষায় তাদের মন ভীত হয়ে উঠবে।

মহান আল্লাহর গুরু-গম্ভীর ঘোষণা যখন ধ্বনিত হবে তখন সবার মনে ভয়ের উদ্রেক হবে এবং কিছুক্ষণের জন্য তারা খেই হারিয়ে ফেলবে। এরপর যখন তাদের মনের ভয়-ভীতি কেটে যাবে তখন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের প্রভু কি বললেন?' উত্তরে বলবে, 'তিনি

সত্য বলেছেন', এই উত্তরটি সম্ভবত আল্লাহর খুব নিকটের ফেরেশতারা দেবেন। অত্যন্ত অর্থপূর্ণ উত্তর, 'তিনি সত্য বলেছেন,' তিনি তো সত্যই বলবেন, কারণ, তিনিই তো পরম সত্য। তিনি সর্ব মহান।

এই হচ্ছে সেই ভয়াবহ মুহূর্তের চিত্র এবং আল্লাহর অতি নিকটের ফেরেশতাদের অবস্থা ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত উত্তর। এই ধরনের ভয়াবহ মুহূর্তে কেউ কি কোনো কাফের মোশরেকের জন্য সুপারিশ করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে?

পরবর্তী আয়াতে স্থান পেয়েছে মানুষের জীবিকার বিষয়টি। এই জীবিকা মানুষ ভোগ করছে, অথচ এর উৎস সম্পর্কে তারা উদাসীন। এই জীবিকার ব্যবস্থা যে মহান সত্ত্বার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন একক ও অভিন্ন সত্ত্বা। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও রেযেকদাতা। তিনি দানও করতে পারেন এবং ছিনিয়েও নিতে পারেন। তাঁর একক ক্ষমতায় কোনো অংশীদার নেই। বলা হয়েছে,

'বলো, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল থেকে কে তোমাদেরকে রেযেক দান করে? ...... (আয়াত ২৪)

বলা বাহুল্য, রেযেকের বিষয়টি মানুষের জীবনের একটা বাস্তব ও চাক্ষুষ বিষয়। আকাশ থেকে বৃষ্টি, তাপ, আলো ও জ্যোতির আকারে মানুষ যা কিছু পাচ্ছে ও প্রত্যক্ষ করছে, তা এক প্রকারের রেযেক। এর বাইরেও অসংখ্য রেযেক মানুষের জন্য আল্লাহ পাক মহাশূন্যে পুঞ্জিভূত করে রেখেছেন যা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। পৃথিবীর বুকেও আল্লাহ পাক মানুষের জন্য অগণিত নেয়ামত ও রেযেক রেখেছেন। বৃক্ষ-তরুলতা, জীবজন্তু, নদ-নদী, খনিজ সম্পদ এবং আরও অজানা ও অগণিত-সম্পদ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হচ্ছে। 'বলো, আল্লাহ'

এটাই যথার্থ উত্তর। কারণ, এর বাইরে আর কোনো উত্তর ওদের কাছে নেই। তাছাড়া এ ব্যাপারে ওদের সন্দেহেরও কোনো অবকাশ নেই।

রসূলুল্লাহ (স.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, কাফের মোশরেকদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহই হচ্ছেন রেযেকদাতা। এরপর যার যার পথে সেই সেই চলবে। তবে সবশেষে চূড়ান্ত বিচার আল্লাহর হাতেই থাকবে। কেউ হয়তো ভুল পথে চলবে, আবার কেউ হয়তো সঠিক পথে চলবে। সবাই একই পথের পথিক হবে-এমনটি হয় না। তাই বলা হয়েছে, 'আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ?'

আলোচ্য আয়াতে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে কিভাবে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতে হবে এবং এর ভাষা ও ভংগী কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স.) কে মোশরেকদের সাথে কথা বলার নিয়ম শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে, বলো, আমাদের যে কোনো এক পক্ষ হয় সঠিক পথে আছে, অথবা ভ্রান্ত পথে আছে।' কে সঠিক, আর কে ভ্রান্ত-এই বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে বলার আর প্রয়োজন হচ্ছে না; বরং তা না বলাই উচিত। এর ফলে বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাবে। অহংকার ও আত্মগরিমা না থাকলে মানুষ নিজেই অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। বস্তুত আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়াত চান, তার মঙ্গল চান। তার অপমান ও লাঞ্ছনা কামনা করেন না।

যারা অহংকারী, যারা আত্মম্ভরী, যারা ক্ষমতার দাপটে অন্ধ, যারা হার মানতে রাজি নয়-তাদের সাথে কোরআন নির্দেশিত এই পন্থায়ই তর্ক-বিতর্ক করা উচিত। এর ফলে তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে। সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত হবে। এটাই হচ্ছে যথার্থ পদ্ধতি। দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য এই পদ্ধতিই উত্তম।

'বলো, আমাদের অপরাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পূর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না' (আয়াত ২৫)

এই আয়াতের বক্তব্য দ্বারা খুব সম্ভবত, রসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে মোশরেকদের মিথ্যা অপবাদের উত্তর দেয়া হয়েছে। মোশরেকেরা রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে ভ্রান্তবাদী ও ধর্মত্যাগী বলে অপবাদ দিতো। আসলে বাতিলপন্থীরা এভাবেই লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে যুগে যুগে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আসছে, তাদেরকে দোষারোপ করে আসছে। তাই রসূলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে,

'বল, আমাদের অপরাধের জন্যে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না .... '

অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ করবে। কাজেই প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত এবং তলিয়ে দেখা উচিৎ যে, সে মঙ্গলের পথে ধাবিত হচ্ছে, না অমঙ্গলের পথে? এই হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভংগী মানুষের মনকে নাড়া দেয়, তার মাঝে চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক ঘটায়। এর ফলে সে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তা গ্রহণ করতে সম্মত হয়।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

'বল আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে সমবেত করবেন .... (আয়াত ২৬)

প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ পাক হকপন্থী ও বাতিল পন্থীদেরকে একত্রিত করবেন যেন হক ও বাতিল মুখোমুখি হতে পারে। এর ফলে হকপন্থীরা তাদের সত্য আদর্শের প্রতি অবিচল থাকতে পারবে। তবে প্রথম দিকে হক ও বাতিলের মাঝে সংমিশ্রণ ঘটবে। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়বে। সংশয়-সন্দেহ জন্ম নেবে। এমনকি হকের ওপর বাতিলের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু তা হবে ক্ষণিকের জন্য। এরপর উভয় শ্রেণীর মধ্যকার ব্যবধান আল্লাহ পাক সুস্পষ্টরূপে নির্ণয় করে দেবেন। উভয়ের ব্যাপারে তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা ঘোষণা করে দেবেন। তাঁর ফয়সালা হবে বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যনির্ভর। কারণ তিনি হক ও বাতিলের পার্থক্য জেনেই সে ব্যাপারে তাঁর চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবেন। তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।'

সে কারণেই আল্লাহ তায়ালা ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রাখা যায় তিনি কেবল বিচারকই নন, বরং তিনি মীমাংসাকারী এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারীও। তিনি ক্ষণিকের জন্যই বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেন না এবং হক ও বাতিলের মধ্যকার সংমিশ্রণকে মেনে নেন না। এর ফলে সত্যের ধারকরা নিজ সাধনা বলে, নিজ দাওয়াতী কর্মকান্ডের মাধ্যমে এবং নিজ অভিজ্ঞতার বলে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাবে। এর বাইরে তো আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত শক্তি আছেই। তিনি অবশ্যই সত্য ও মিথ্যা এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে নির্ণয় করে থাকেন।

হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা কখন হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। এর সময়সীমা নির্ধারণ করার শক্তি কারও নেই। কারণ হক ও বাতিলকে একত্রিত করেন আল্লাহ পাক নিজেই। এবং এর মীমাংসাও করেন তিনি নিজেই।

পরের আয়াতে পুনরায় কল্পিত শরীকদের প্রসংগের অবতারণা করে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ও চ্যালেঞ্জের সুরে বলা হয়েছে,

'বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার রূপে সংযুক্ত করেছো, তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও ....' (আয়াত ২৭)

প্রশ্নের মাঝে নিন্দা ও তাচ্ছিল্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। অর্থাৎ ওরা কারা? ওদের মূল্য কি? ওদের গুনাগুণ কি? ওদের মান-মর্যাদা কি? কিসের ভিত্তিতে ওদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক মনে করছো? এই তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাপূর্ণ প্রশ্ন রেখে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ও ধমকের সুরে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই নয়' ..... ওরা কখনও আল্লাহর শরীক হতে পারে না। কারণ, তাঁর কোন শরীকের প্রয়োজন নেই বরং তিনিই আল্লাহ, পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' কাজেই এই গুণের অধিকারীও কেউ হতে পারবে না এবং তাঁর শরীকও কেউ হতে পারবে না।

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ
مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرٰٓى إِذِ
الظّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضِ ۨالْقَوْلَ ۚ
يَقُوْلُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْٓا أَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى
بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُوْنَنَآ أَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ

২৮. (হে নবী,) আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না। ২৯. তারা বলে (হে মুসলমানরা), যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো, তোমাদের এ ওয়াদা কবে (বাস্তবায়িত) হবে। ৩০. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমাদের জন্যে যে দিনের ওয়াদা করা হয়েছে তোমরা তার থেকে এক মুহূর্ত (যেমনি) পিছিয়ে থাকতে পারবে না, (তেমনি) তোমরা এক মুহূর্ত এগিয়েও আসতে পারবে না।

রুকু ৪

৩১. কাফেররা বলে, আমরা কোনোদিনই এ কোরআনের ওপর ঈমান আনবো না এবং আগের কেতাবগুলোর ওপরও (ঈমান আনবো না, হে নবী, সেই ভয়াবহ দৃশ্য) যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালেমদের তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা একজন আরেকজনের ওপর (কথা) চাপাতে থাকবে, যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিলো তারা (এ) প্রাধান্য বিস্তারকারীদের বলবে, যদি তোমরা (সেদিন) না থাকতে তাহলে অবশ্যই আমরা মোমেন থাকতাম! ৩২. (এ কথার জবাবে) এ অহংকারী লোকেরা– যাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছিলো তাদের বলবে, আমরা কি তোমাদের হেদায়াতের পথে না চলার জন্যে বাধ্য করেছিলাম? (বিশেষ করে) যখন হেদায়াত তোমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো, (আসলে) তোমরা নিজেরাই ছিলে না-ফরমান। ৩৩. যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিলো, এবার তারা অহংকারী নেতাদের বলবে, (জবরদস্তি না হলেও তোমাদের) রাত দিনের চক্রান্ত (নাফরমানী করতে) আমাদের বাধ্য করেছিলো, (বিশেষ করে) যখন তোমরা আমাদের আদেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং

لَهٗٓ اَنْدَادًا ۭ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۭ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ

اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَمَآ

اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ

كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا

مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۡ فَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ جَزَاۗءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ

فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۗىِٕكَ

فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

অন্যদের তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাই; (এভাবে একে অপরকে অভিযুক্ত করতে করতে) যখন তারা (তাদের চোখের সামনেই) আযাব দেখতে পাবে; তখন তারা মনে মনে ভীষণ অনুতাপ করতে থাকবে; সেদিন যারা (আমাকে) অস্বীকার করেছে আমি তাদের গলদেশে শেকল পরিয়ে দেবো; (তুমিই বলো,) স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে এদের এর চাইতে ভালো কোনো বিনিময় কি দেয়া যেতো? ৩৪. (কখনো এমন হয়নি,) আমি কোনো জনপদে (জাহান্নামের) সতর্ককারী (-রূপে কোনো নবী) পাঠিয়েছি, অথচ তাদের বিত্তশালী লোকেরা একথা বলেনি, তোমাদের যে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে– আমরা তা অস্বীকার করি। ৩৫. তারা আরো বলেছে, আমরা (এ দুনিয়ায়) ধনে জনে (তোমাদের চাইতে) সমৃদ্ধশালী এবং (পরকালে) আমাদের কখনোই আযাব দেয়া হবে না। ৩৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার মালিক যাকে ইচ্ছা করেন তার রেযেক প্রশস্ত করে দেন, (যাকে ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এটা) বুঝে না।

রুকু ৫

৩৭. (হে মানুষ,) তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন (কোনো বিষয়) নয় যে, এগুলো তোমাদের আমার নৈকট্য লাভ করতে সহায়ক হবে, তবে যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে (সেই এ নৈকট্য লাভ করতে পারবে), এ ধরনের লোকদের জন্যেই (কেয়ামতে) দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে, তারা জান্নাতের (সুরম্য) বালাখানায় নিরাপদে অবস্থান করবে, কেননা তারা নেক আমল করেছে। ৩৮. যারা আমার আয়াতকে (নানা কৌশলে) ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছে, তারা হামেশাই আযাবে পড়ে থাকবে।

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ

مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ

يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤٠﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ

وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৩৯. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার মালিক তাঁর বান্দাদের মাঝে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার রেযেক বাড়িয়ে দেন, (আবার যার প্রতি ইচ্ছা) তার জন্যে (তা) সংকুচিত করে দেন; তোমরা যা কিছু (আল্লাহর পথে) খরচ করবে, তিনি (তোমাদের অবশ্যই) তার প্রতিদান দেবেন, (কেননা) তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা। ৪০. যেদিন তিনি এদের সকলকে (হাশরের ময়দানে) একত্রিত করবেন, অতপর ফেরেশতাদের উদ্দেশ করে তিনি বলবেন, এ (মানুষ)-রা কি (দুনিয়াতে) শুধু তোমাদেরই এবাদাত করতো? ৪১. ফেরেশতারা বলবে (হে আমাদের মালিক), তুমি মহান, তাদের বদলে তুমিই আমাদের অভিভাবক, ওরা তো বরং জ্বিনদের এবাদাত করতো এবং এদের অধিকাংশ তাদের ওপর বিশ্বাসও করতো। ৪২. আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই; যালেমদের আমি (আরো) বলবো, যে আগুনের আযাব তোমরা অস্বীকার করতে, আজ তারই মজা উপভোগ করো।

তাফসীর

আয়াত ২৮-৪২

'আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সু সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না .... (আয়াত ২৮-৪২)

এই পর্বে আল্লাহর রসূলের অস্বীকারকারী ভোগবাদী ও ধনবাদী সম্প্রদায়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভোগ-বিলাস, পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্তুতির অধিকারী হয়ে এ সকল লোকেরা মনে করে যে, তারাই আল্লাহর প্রিয় পাত্র। এরা আরও মনে করে, তাদের ধন-দৌলত ও সন্তান সন্তুতি তাদেরকে সব ধরনের আযাব থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু, পরকালে তাদের প্রকৃত অবস্থা কী দাঁড়াবে তা দৃশ্যমান করে তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যেন তারা সঠিক চিত্রটি অনুধাবন করতে পারে। এখানে তাদেরকে আরও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, পরকালে তাদের কেউ উপকার করতে পারবে না, কোন সাহায্য করতে পারবে না। এমনকি যে সব জ্বীন বা ফেরেশতাদের উপাসনা তারা করে থাকে, তারাও কোনো কাজে আসবে না। এই বক্তব্যের ফাঁকেই আল্লাহ পাক জানিয়ে দিচ্ছেন, সত্যিকার মূল্যবোধ ও আদর্শ কোনটি যা পরকালীন মাপকাঠিতে উতরে যাবে

এবং কৃত্রিম ও বানোয়াট মূল্যবোধ কোনটি যা নিয়ে ওরা পার্থিব জীবনে গর্ব করে থাকে। সাথে সাথে আল্লাহ পাক এও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। দারিদ্র কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টির মাপকাঠি হতে পারে না। তদ্রূপ এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তিও প্রমাণ করা যায় না এবং আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হওয়াও প্রমাণ করা যায় না। মোটকথা, দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের পরীক্ষাস্বরূপ।

নবীর দায়িত্বও সীমাবদ্ধতা

'আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি .... (আয়াত ২৮, ২৯ ও ৩০)

পূর্ববর্তী আয়াতে হকপন্থী ও বাতিলপন্থীদের ব্যক্তিগত করণীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, উভয় শ্রেণীর লোকেরা নিজ নিজ আদর্শের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার নেই। কারণ চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত।

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওতি দায়-দায়িত্বের বর্ণনার সাথে সাথে সেই দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, অজ্ঞতা ও অপরিণামদর্শিতার বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক সময় আল্লাহ নির্ধারিত পুরস্কার অথবা শাস্তি দ্রুত কামনা করে থাকে। অথবা এ সব ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তিনি এ সবের জন্য যে সময়সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার কখনও ব্যতিক্রম ঘটবে না।

নবুওতের দায়িত্ব প্রসংগ বলতে গিয়ে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাকে সকল মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, ... অর্থাৎ সুসংবাদ দান করা ও সতর্ক করা হচ্ছে একজন নবীর অন্যতম মূল দায়িত্ব। তবে এই সুসংবাদ ও সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন নবীর দায়িত্ব নয়। বরং এ দায়িত্ব হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর 'কিন্তু অনেক মানুষই তা জানে না। তারা বলে থাকে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে?'

এ সব প্রশ্ন দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রশ্নকারীরা একজন নবীর মূল দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। এমনকি নবুওত ও রেসালতের সীমারেখা সম্পর্কেও এরা অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা তাওহীদের আকীদার পরিপন্থী। তাই তাওহীদের বিশ্বাসকে কুসংস্কারমুক্ত রাখার জন্য পবিত্র কোরআন ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে যে, মোহাম্মদ (স.) হচ্ছেন একজন রসূল, তাঁকে নির্ধারিত কিছু দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এই দায়িত্বের বাইরে তাঁর করার মতো কিছুই নেই। চূড়ান্ত ফয়সালার মালিক তিনি নন; বরং আল্লাহই হচ্ছেন এর মালিক। তিনিই রসূলকে মানুষের হেদায়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমারেখাও তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোনো আসমানী ওয়াদা বা শাস্তির বাস্তবায়নের দায়িত্ব নবীর হাতে ন্যস্ত নয়। এমনকি এসব বিষয়ের সঠিক জ্ঞানও তাঁর নেই। কারণ এসব বিষয় হচ্ছে নিতান্তই আল্লাহর জানার বিষয়। তিনিই এসব বিষয়ের সঠিক জ্ঞান রাখেন এবং এসব বিষয়ের বাস্তবায়নও তাঁর হাতেই ন্যস্ত। কাজেই রসূলকে যে বিষয়ের জ্ঞান ও দায়িত্ব দেয়া হয়নি, সে বিষয়ে তাঁকে কোন প্রশ্ন করাই সমীচীন নয়। এর পরও যদি কেউ প্রশ্ন করে তাহলে তার উত্তর এ ভাবে দেয়ার জন্য নবীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

'বল, তোমাদের জন্যে একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।' .... (আয়াত ৩০)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যে সব বিষয়ের জন্যে চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা সেই নির্ধারিত সময়েই ঘটবে। এর ব্যতিক্রম হবে না। ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছায় তা পূর্বেও ঘটবে না এবং

পরেও ঘটবে না। এখানে খাম খেয়ালীর কোনো অবকাশ নেই এবং চমক দেখানোরও কোনো সুযোগ নেই। যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যেই ঘটছে বা ঘটবে। প্রতিটি ঘটনা বা বিষয় পরস্পর সম্পৃক্ত। আল্লাহ পাকের কুদরতী নিয়ম-নীতিই সকল ঘটনাবলী ও তার স্থান কাল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ সব বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতাধীন নয়। তবে আল্লাহ পাক তার কোনো বিশেষ বান্দাকে এ ব্যাপারে কিছু জানালে জানাতেও পারেন।

এই সত্যটুকু যারা অনুধাবন করতে পারে না, তারাই আসমানী ওয়াদা বা শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে, এর দ্রুত বাস্তবায়ন দাবী করে। এরা অজ্ঞ বলেই এমনটি করে থাকে।

পথভ্রষ্ট জনগণ ও নেতাদের ঝগড়া

'কাফেররা বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করবো না এবং এর পূর্ববর্তী কেতাবেও নয়' .... (আয়াত ৩১)

কাফেরদের এই বক্তব্য তাদের গোঁড়ামি ও গোমিয়ার্তুমিরই সাক্ষ্য বহন করে। এরা সত্যের ধারই ধারে না। হেদায়াত এদের কাম্য নয়। এরা কোরআনকেও বিশ্বাস করে না এবং পূর্ববর্তী অন্য কোনো আসমানী কেতাবও মানে না। অর্থাৎ কোনো আসমানী কেতাবের প্রতি বিশ্বাস করার জন্য এরা কখনই প্রস্তুত নয়। বর্তমানেও নয় এবং ভবিষ্যতেও নয়। এরা কুফরী মতবাদের ওপরই অটল ও অবিচল থাকতে চায়। তাই ইচ্ছা করেই তারা সত্যের প্রতি, সত্যের দলীল প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না বলে স্থির করে রেখেছে। তাদের এই কার্যকলাপ ইচ্ছাকৃত অপরাধেরই শামিল। তাই পরকালে এই অপরাধের শাস্তি কিরূপ হতে পারে তার একটা চিত্র নিচের আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে,

'তুমি যদি পাপিষ্ঠদেরকে দেখতে যখন তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে ....' (আয়াত ৩১-৩৩)

পৃথিবীর বুকে দম্ভ ভরে তারা বলতে পারে, 'আমরা কখনও এই কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না' কিন্তু পরকালে এ কথা বলা তাদের পক্ষে মোটেও সম্ভবপর হবে না। কারণ তখন তাদেরকে আসামীর মতো মহান আল্লাহর দরবারে এনে হাযির করা হবে। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে অপেক্ষায় ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হবে। তখন তাদের করার কিছুই থাকবে না। সেই মুহূর্তে তারা পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে, গালমন্দ করতে থাকবে এবং কথা কাটাকাটি করতে থাকবে। তাদের বক্তব্য হবে এরূপ,

'যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মোমেন হতাম।'

অর্থাৎ পরকালের এই দুর্গতি ও লজ্জাজনক পরিণতির জন্য তারা তখন প্রভাবশালী লোকদেরকে দায়ী করবে। পরকালে দুর্বল লোকেরা প্রভাবশালী লোকদের এভাবে প্রকাশ্যে দোষারোপ করতে পারবে। অথচ দুনিয়ার জীবনে এমনটি করা তাদের পক্ষে কখনও সম্ভবপর নয়। কারণ জাগতিক জীবনে এদের অবস্থান হয় দুর্বল, হীন ও আপোষকামী। এদের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে কিছু থাকে না, আত্মমর্যাদা বলতে কিছু থাকে না এবং থাকে না সচেতনতা বলতে কোনো কিছু। এরা সম্পূর্ণরূপে পরাধীন। কিন্তু পরকালে যখন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং নিজেদের মনগড়া আদর্শের ধস নামবে তখন তারা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে বলে উঠবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মোমেন হতাম।'

দুর্বল লোকদের এসব কথায় বড় লোকেরা খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যাবে। কারণ তারা আজ একই পরিস্থিতির শিকার। এর ওপর দুর্বল লোকেরা তাদের দোষারোপ করছে। নিজেদের দুর্গতির জন্য তাদেরকে দায়ী করছে। কাজেই এখন আর চুপ থাকা যায় না। কঠিন ভাষায় এর

একটা উত্তর দিতেই হয়। তাই তারা দুর্বলদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে অহংকারীরা দুর্বলকে বলবে, তোমাদের কাছে হেদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম' বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী' (আয়াত ৩২)

উত্তরে তারা বলতে চায় যে, এই পরিস্থিতির জন্য তারা আদৌ দায়ী নয়। তারা কাউকে হেদায়াত গ্রহণে বাধা দেয়নি। অথচ দুনিয়ার বুকে এই বড় লোকেরাই দুর্বলদেরকে দমিয়ে রাখতো। তাদেরকে মূল্যহীন মনে করতো। তাদের মতামতের কোনোই তোয়াক্কা করতো না। এদের অস্তিত্বকেই স্বীকার করতো না। এদের কোনো কথাই তারা মানতো না এমন কি শুনতেও চাইত না। কিন্তু আজকের এই ভয়াবহ কঠিন শাস্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই বড় লোকেরাই দুর্বল লোকদের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশ্ন রাখছে, 'তোমাদের কাছে হেদায়াত আসার পর আমরা তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম নাকি?'

'বরং তোমরা ছিলে অপরাধী' .... অপরাধপ্রবণ জাতি। (আয়াত ৩২)

এই অপরাধীরা যখন দুনিয়াতে ছিলো তখনও তারা বিবেকের দংশন জ্বালায় অস্থির থেকেছে এবং মনের দিক দিয়ে এত দুর্বল থেকেছে যে, মাথা উঁচু করে কখনো কথা বলতে পারেনি, কথা বলতে গেলে তাদের ঠোঁট কেঁপে উঠেছে, কিন্তু আখেরাতে আজ তাদের সকল মিথ্যা মর্যাদা শেষ হয়ে যাবে। অলীক মর্যাদা ও সম্মানবোধ নিয়ে দুনিয়াতে বন্ধ চোখে যে দিবা স্বপ্ন তারা দেখেছে সেখানে তাদের সে মিথ্যার পর্দা সরে যাবে এবং তাদের সকল গোপন আচরণ তাদের আমলনামার আকারে সামনে এসে যাবে। সেদিন যারা দুর্বল ছিলো, নানা চাপে পড়ে দুনিয়াতে যারা কথা বলতে পারেনি, তারা সোচ্চার হয়ে উঠবে। তারা সেদিন আর চুপ থাকবে না এবং পৃথিবীর মতো অবনত মাথায়ও থাকবে না; বরং পৃথিবীর সেসব অহংকারী ও দাপট প্রদর্শনকারী যালেমদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেবে, ছাফ ছাফ তাদের মুখের ওপর তাদের সত্য বিরোধিতার কথা তাদের হঠকারিতা ও সত্যকে গোপন করার কথা ঘোষণা করতে থাকবে, শক্তি-ক্ষমতা ব্যবহার করে অন্যায় কাজে মানুষকে উস্কানি দেয়ার কথা জানাতে থাকবে অন্যায় কাজের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়ার জন্য এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তারা তাদের সকল ক্ষমতা যেভাবে ব্যবহার করেছে সেসব কথা সেদিন সবই প্রকাশ করে দেয়া হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'দুর্বল লোকেরা (কেয়ামতের দিন) অহংকারী লোকদেরকে বলবে ....আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতায় আরও কেউ অংশীদার আছে বলে মেনে নেই।' (আয়াত ৩৩)

হাশরের সেই ভয়ানক দিনে তারা দেখবে দুনিয়ার বুকে অমুক তমুক যারা ক্ষমতার দাপট এবং যারা কেয়ামতের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবে বলে গলাবাজি করতো, তাদের কোনোই ক্ষমতা নেই, তারা কোনো বলদর্পী ও আত্মম্ভরী ব্যক্তিকে বাঁচাতে পারবে না, না পারবে কোনো দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে। প্রত্যেককেই তার নিজের ভুল-ভ্রান্তি ও ইচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য দায়ী হতে হবে। যারা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছে তাদের ঘাড়ে তাদের গোনাহের বোঝা থাকবে– আরও থাকবে অন্য সেসব লোকদের বোঝা, যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছিলো এবং ধোঁকা দিয়ে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দুর্বলতায় যারা ঘেরাও হয়েছিলো তাদেরকেও কিছু বোঝা বইতে হবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কেন তারা এ বিদ্রোহী ও নাফরমান লোকদের তাবেদারী করেছিলো? শুধু এতটুকু অজুহাতে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে না যে, তারা দুর্বল ছিলো এবং নানা প্রকার অসুবিধার কারণে তারা ওদের কথা মানতে বাধ্য হয়েছিলো। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে বুঝ শক্তি তো দিয়েছিলেন, যার দ্বারা তারা ভাল

মন্দ পার্থক্য করতে পারতো এবং তাদেরকে তিনি আযাদীও দিয়েছিলেন, যার কারণে তারা তাদের আনুগত্যেও বাধ্য ছিল না। 'সামান্য কিছু বৈষয়িক অসুবিধা হবে', এ জন্য তাদের বোধশক্তিকে তারা খর্ব করে দিয়েছিলো এবং তাদের স্বাধীনতাকে তারা বিক্রি করে দিয়েছিল। তাদের ওপর গিয়ে স্বেচ্ছায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলো বা নিজের ইচ্ছাতেই তাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য তাদের লেজুড়বৃত্তি করতে রাযি হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালার আযাবের ভয় যদি তাদের অন্তরে থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই তারা এ বিদ্রোহীদের অন্ধ আনুগত্য করত না। অতএব সবাই আজ শাস্তির হকদার হয়ে যাবে। তাদেরকে দুঃখ ও গ্লানি স্পর্শ করবে এবং তারা দেখতে পাবে তাদের জন্য আজ শাস্তির ব্যবস্থা উপস্থিত রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

' যখন তারা আযাবকে দেখবে তখন তারা লজ্জাকে গোপন করে রাখতে চাইবে'

এ হবে এমন এক দুঃখজনক অবস্থা, যা তারা প্রকাশ করতে পারবে না, বুকের মধ্যে তাদের কথা আটকে যাবে, মুখে কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে জিহ্বা আড়ষ্ঠ হয়ে যাবে এবং ঠোঁট নড়তে চাইবে না।

তারপর তাদেরকে অপমানজনক এক কঠিন আযাব স্পর্শ করবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি কাফেরদের গলায় শেকল পরিয়ে দেবো।'

এরপর প্রসংগ এগিয়ে চলেছে তাদের কথার দিকে যাদেরকে গলায় শেকল পরিহিত অবস্থায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে অবহেলা ভরে সেইভাবে সম্বোধন করা হবে যেমন কোন পরিদর্শক কাউকে সম্বোধন করে। বলা হবে,

'তাদেরকে সেই কাজের প্রতিদান কি দেয়া হবে না, যা তারা করেছে?'

তারপর যালেমদের মধ্য থেকে যারা অহংকারী এবং দুর্বল ছিলো তাদের থেকে পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে, কারণ তারা উভয়েই ছিলো যালেম। তাদের একদল লোক যুলুম করেছে, তারা অন্য মানুষকে অন্যায় করার জন্য মজবুর করেছে, তারা নিজেরা অহংকার ও বিদ্রোহ করেছে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। আর একদল যুলুম করেছে, তারা অন্যায়কারীদের কাছে নতি স্বীকার করে নিজেদের আত্ম-সম্মানবোধকে ক্ষুণ্ণ করেছে, সত্যিকার অর্থে তারা তাদের মানবতাবোধকে অপমান করেছে, মানবতার আযাদীকে তারা পর্যুদস্ত করেছে, বিদ্রোহী ও নাফরমানদের কাছে নতি স্বীকার ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তারা নিজেদের সম্মান করেছে, এ জন্য উভয়পক্ষই আজ সমানভাবে শাস্তির মধ্যে থাকবে। তাদের সেই পরিমাণ শাস্তিই দেয়া হবে যে পরিমাণ অন্যায় তারা করেছে।

প্রাচুর্য ও দৈন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির মাপকাঠী নয়

আবারও এ দৃশ্য থেকে পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে। এবারে যালেমরা তাদের নিজেদেরকে জীবন্ত দৃশ্যের মধ্যে দেখতে পাবে। এ পরিস্থিতি দেখে তাদের চোখ উল্টে যাবে, সেখানে তারা তাদের নিজেদের দেখবে। সেখানে তারা অন্যদেরকে এমনভাবে দেখতে থাকবে যেন, তারা নিজেদেরকেই দেখছে।

এখানে কোরায়শদের সচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই কথা বলেছে। আর এভাবেই প্রত্যেক যামানার বিত্তশালী লোকেরা তাদের কাছে আগত রসূলদের সাথে কথা বলেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি যখনই কোনো এলাকায় কোনো সাবধানকারী কোনো রসূল পাঠিয়েছি .... সেগুলোকে আমরা মনি না।' (আয়াত ৩৪)

এ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি পৃথিবীতে বারবারই হয়েছে এবং যুগ যুগান্তর ধরে এই ধরনের ব্যবহার আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বানকারীদেরকে বারবারই সইতে হয়েছে। .... এ সব ঘটনাকে সামনে রাখলে সহজে যে জিনিসটি বুঝা যায় তা হচ্ছে, মানুষ যখন সচ্ছল হয়, যখন কোনো ব্যাপারে তার কোন অভাববোধ থাকে না তখন তাদের হৃদয় মন শক্ত হয়ে যায়, তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেয়ে যায়। তারা যেন আর ভাল-মন্দের বিচার করতে পারে না, উপস্থিত অবস্থার বাইরে তাদের দৃষ্টি আর প্রসারিত হয় না; তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতিতে যেসব বিষয় অনুভূত হওয়া উচিত ছিলো তা যেন আর সম্ভব হয় না, অনুভূতি শক্তি জমাট বেঁধে যায়, যার কারণে সত্য-সঠিক পথের প্রমাণ তারা দেখেও আর দেখতে পারে না, তাদের চোখের ওপর পর্দা পড়ে যায়, আর এই কারণেই তারা হেদায়াতের নিদর্শনগুলোকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যায় ও মিথ্যার ওপর জমে থাকে, এর ফলে হেদায়াতের আলো তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়।

একবার সে সম্পদশালী ও অভাবমুক্ত ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কেমন করে জীবনের মিথ্যা মূল্যবোধ তাদের ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে, নশ্বর পৃথিবীর এসব ক্ষণস্থায়ী সহায় সম্পদ কেমন করে তাদের গাফলতির নিদ্রায় বেহুশ করে রেখেছে, শক্তি ও সম্পদের নেশায় তারা বুঁদ হয়ে রয়েছে, দুঃখ-যাতনা অভাব অভিযোগ না থাকায় এবং অঢেল সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় তাদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে যে, এসব রাশি রাশি অর্থের বিনিময়ে তারা আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে রেহাই পেয়ে যাবে, তারা আরো ধারণা করে যে, আল্লাহর প্রিয় না হলে কি এমনি এমনি তারা এতো সচ্ছল হতে পেরেছে! অথবা তারা এ ধারণা করে যে, তারা যাবতীয় হিসাব নিকাশের উর্ধে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওরা বলে, সম্পদ ও সন্তানাদিতে আমরাই বেশী, কাজেই আমাদেরকে কোন আযাব দেয়া হবে না।'

মর্যাদা পাওয়ার সঠিক মানদন্ড কি আল কোরআন তাদের তা সুস্পষ্ট বক্তব্যে জানিয়ে দিচ্ছে এবং এ বিষয়ে একটা নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যে, রেযেকের প্রশস্ততা এবং তার সীমিতকরণ, এসব কারও এখতিয়ারাধীন নয় এবং কোনো গোষ্ঠী বা জনপদকে এগুলোর ইজারাদারী দেয়া হয়নি যে, তারাই স্থায়ীভাবে এগুলোর মালিক হবে। সহায়-সম্পদ কমবেশী হওয়ার ওপরই আল্লাহর রেযামন্দি ও শাস্তিদান নির্ভর করে না, এগুলোর আধিক্যের কারণে আযাব আসা বন্ধ হবে বা এগুলোর অভাবে আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে, তাও নয়। হিসাব-নিকাশ বা কাকে কী প্রতিদান দেয়া হবে, এ বিষয়টির সাথে কার কতোটা ধন-সম্পদ আছে– তার কোনো সম্পর্ক নেই, নেই এগুলোর সাথে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি বা গযবের কোনো সম্পর্ক। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়লার বিধানে অন্য আইন রয়েছে; এরশাদ হচ্ছে,

'বল, নিশ্চয়ই আমার রব যার জন্য ইচ্ছা তার জন্য রেযেক সম্প্রসারিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তার জন্য সংকুচিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' (আয়াত ৩৬)

সচ্ছলতা ও অভাব, ধন সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি এবং সুখ-সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া বা এসব থেকে বঞ্চিত হওয়া এসব কিসের ভিত্তিতে হয় বা এসবের জন্য কি কি যোগ্যতা বা অযোগ্যতা প্রয়োজন? অনেকের কাছেই এটা একটা জটিল প্রশ্ন। অনেক সময়ই দেখা যায়, অন্যায়কারী ও মিথ্যার ধান্ধা যারা করে তাদের জন্য দুনিয়া তার ভান্ডারের দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। তারাই এগুলোর মালিক হয়ে গেছে– যারা ফেতনা ফাসাদ এবং অশান্তিতে মানুষের জীবনকে ভরে দিচ্ছে এবং ভাল লোক ও আল্লাহর নেক বান্দাদের জীবনকে সমস্যা ও অভাব অভিযোগে দুর্বিষহ করে

তুলছে এবং ফলে অনেকের ধারণা হয় যে আল্লাহ তায়ালার এ ভান্ডার থেকে তো তারাই বেশী বেশী পায়, যাদের মান মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশী এবং এই কারণে সে সম্পদশালী ব্যক্তিরাও এ কথা বলার সুযোগ পায় যে, তারাই আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র। আবার অনেক মানুষ সত্য-ন্যায় ও সংশোধিত জীবন যাপনের মূল্য সম্পর্কেও সন্দেহ করে যে, এ সবের আসলেই তেমন মূল্য নেই; বরং খাও, পান কর ও ফুর্তি করো এতে যে যেভাবে সুযোগ করে নিতে পারে নিক, এসব বিষয়ে ধরপাকড় করারও কেউ নেই। সত্যপন্থী হতে হলে চতুর্দিক থেকে বাধা আর বাধা, তার থেকে আর দশ জনের মতো 'যখন যেমন তখন তেমন' করলেই জীবনটা সহজ হয়ে যায়।

এই পর্যায়ে এসে আল কোরআন চূড়ান্তভাবে দুনিয়ার সুখ আহলাদের আকর্ষণ ও সেই মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা নিজে চান। তারপর আল্লাহ তায়ালা স্থির করে দিচ্ছেন যে, তিনি যার জন্য ইচ্ছা তার জন্য রেযেকের ভান্ডার প্রশস্ত করেন, আবার যার জন্য ইচ্ছা সংকুচিত করেন। আর এই বিষয়টিই এখানে শুধু তাঁর সন্তুষ্টির সাথে জড়িত। তাঁর ক্রোধের বিষয়টি সম্পূর্ণ পৃথক একটি ব্যাপার, এ দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। রেযেক দেয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। যার ওপর তিনি ক্রুদ্ধ তাকেও তিনি রেযেক দেন, তাকেও দেন যার ওপর তিনি সন্তুষ্ট। সংকীর্ণ যখন করেন তখন উভয়ের জন্যই সংকীর্ণ করেন। এখানে নেক ও বদের মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য করেন না। তিনি কি জন্য কি করেন এবং কোন উদ্দেশ্যে তিনি কি করেন তা শুধু তিনিই জানেন। কারণ ও উদ্দেশ্য সকল সময়ে এক হয় না।

অন্যায়কারীদের তিনি খাদ্য খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন, যেন ধীরে ধীরে তাদের পাপের ভান্ড পুরে যায়, অহংকারের পেয়ালা ভরে যায়, ফেতনা ফাসাদ ছড়ানোর ব্যাপারে তারা যেন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং তাদের গুণাহ খাতা ও অপরাধ অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি পায়। তারপর তাদের তিনি, তাঁর জ্ঞান ও পূর্ব নির্ধারিত ফায়সালা অনুযায়ী দুনিয়া অথবা আখেরাতে পাকড়াও করেন- এই ভাবে ওঁৎ পেতে থেকে তাদের অপরাধের খতিয়ান বের করা হয়। আবার কখনও তাদের প্রতি রুজি রোজগারের উপায়-উপাদান নিষিদ্ধ করা হয়, ফলে তাদের অন্যায় কাজ ও আচরণ আরও বাড়তে থাকে, তাদের গুনাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের অস্থিরতা সংকট বিপদ-আপদ বাড়ে এবং তারা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়। এইভাবে তাদের থেকে তাঁর মেহেরবানীর দৃষ্টি তুলে নিয়ে তিনি তাদেরকে বহুগুণে অন্যায় ও অপকর্ম এবং তিনি চূড়ান্তভাবে তাদেরকে বিপথগামী হওয়ার সুযোগ করে দেন।

একইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নেক পথের পথিকদের তাঁর ভান্ডার থেকে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দান করেন, যেন তারা ভাল কাজগুলো স্থায়ীভাবে করে যেতে পারে, কারণ এসব সুযোগের অভাবে সেসব ভাল কাজ করা সম্ভব নয়। তাদের মন ও চেষ্টা আছে, প্রয়োজন শুধু সুযোগ করে দেয়ার, তাই পরম দয়াময় তাদের এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখেন না। তারা যেন তাদের অন্তর, জিহ্বা ও কাজ দ্বারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকরগোযারি করতে পারে, সকল দিক থেকে তাদের এসব অনুকূল অবস্থা সরবরাহ করেন, যেন তারা পরম পরিতৃপ্তির সাথে ভাল কাজ করতে পারে এবং এ সবের বিনিময়ে তারা তাদের পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে অফুরন্ত পুরস্কার পাবেন, অভাবের মধ্যে ভাল কাজের প্রতি তাদের আকর্ষণের কথা আল্লাহ তায়ালা জানেন। তাদের সংশোধিত জীবন যাপনের সংকল্পের কথাও তিনি জানেন; এরপর, উদারচেতা এবং নেক দিল বান্দাদের থেকে তিনি বঞ্চনার অনুভূতি দূর করে, আল্লাহর মোহব্বতপূর্ণ অবদানের

প্রাচুর্যে তাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করে দেন এবং রহমানুর রহীম আল্লাহর ওপর তাদের অনাবিল আস্থা সঞ্চার করে দেন। করুণাময় আল্লাহ পাকের নেক নযর ও অযাচিত বরাদ্দ দানে তাদের হৃদয়মন পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে থাকে এবং এক ও অদ্বিতীয় পাক পরওয়ারদেগারের সন্তুষ্টিতে তারা ধন্য হয়ে যায়, কেননা, তিনিই চিরস্থায়ী সকল কল্যাণের আধার। সেসব লোক নেক বান্দাদেরও তিনি তাঁর কল্যাণ ও সন্তোষের ভান্ডার থেকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন, যার কোন সীমা সংখ্যা নেই।

আল্লাহ তায়ালার হেকমতের দরুণ রেযেক বন্টন করা, প্রশস্ত করা আবার কখনও সেগুলোকে সংকুচিত করার কারণসমূহ যাইই হোক না কেন, সেটা একটা বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন এবং আল্লাহ তায়ালা যখন যা দিতে চাইবেন তাই দেবেন। কার প্রতি কোন কারণে তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তা একমাত্র তিনিই জানেন, এ বিষয়টি আমরা আমাদের বুদ্ধি দ্বারা মাপতে পারব না। তবে যে তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির আশায় তাঁর বান্দাদের কল্যাণে আত্মনিবেদন করবে, তার প্রতি তাঁর নেক নযর পড়ার আশা করা যায়। কিন্তু তাই বলে কোনো মানুষ নিজে নিজে এই সব নেক কাজ সামনে নিয়ে দাবী করতে পারে না যে, সে আল্লাহ তায়ালার নেক নযর পাবেই। ধন-দৌলত, খাদ্য খাবার, সন্তানাদি সব তাঁর মেহেরবানীর দান, এসব কারও অর্জিত প্রতিদান নয় যে, কেউ দাবী করে বলতে পারবে- আমি এই এই ভাল কাজ করে এসব নেয়ামত অর্জন করেছি। আগে পরে যা কিছু প্রাপ্তি ঘটেছে সবই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এবং তাঁরই মেহেরবানীতে এসেছে এবং অবশেষে তাঁর কাছেই সব ফিরে যাবে। তবে সাময়িকভাবে তাদেরকে কিছু দেয়া হয়েছে, যেন তারা এগুলো থেকে খরচ করতে পারে, সেখানেও কাউকে দেয়া হয়েছে বেশী এবং কাউকে দেয়া হয়েছে কম। যাকে আল্লাহ পাক ধন সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়েছেন, তারা যদি এসব নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করে, তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে এ সব নেক কাজের বিনিময়ে সর্বোত্তম প্রতিদান দেবেন, কিন্তু, আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সাথে নিকটবর্তী করে দেয়ার ব্যাপারে ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদির কোন ক্ষমতা নেই, বরং সম্পদ ও সন্তানাদির সাথে যে ব্যবহার করা হবে, সেই ব্যবহারের ওপরই তার প্রতিদানকে কম বা বেশী করা হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি তোমাদেরকে আমার নিকটস্থ করতে পারবে না।' .... (আয়াত ৩৮)

রেযেকের প্রশস্ততা ও সংকুচিত হওয়ার মূলনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। এর দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন ভিন্ন হেকমত প্রদর্শন করতে চান। এ সম্পদ থেকে যা কিছু আল্লাহর পথে খরচ করা হবে তা পূঁজি আকারে জমা হতে থাকবে, যা পরকালীন জীবনের দুঃসময়ে তাদের ফায়দা দেবে। এ কথা এ জন্য জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, যাতে করে অন্তরের মধ্যে এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে জাগরুক থাকে এবং মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করতে উৎসাহ যোগাতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে নবী তুমি বলো আমার মালিক .... সর্বোত্তম রেযেক দাতা।' (আয়াত ৩৯)

কেয়ামতের বিশাল জনতার দৃশ্যের ছবি পেশ করে আপাতত এই পরিক্রমাটি সমাপ্ত করা হচ্ছে। সেখানে তিনি তাদেরকে সেই ফেরেশতাকুলের সাথে মুখোমুখি করাবেন আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাকে বাদ দিয়ে যাদের ওরা পূজা করতো এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো। তারপর তাদের সেই আগুনের আযাব স্পর্শ করবে যার জন্য তারা বড়ই তাড়াহুড়ো করতো এবং বলতো, কখন আসবে সেই প্রতিশ্রুত দিন? সূরাটির প্রথম অধ্যায়ে এই বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আজ তোমাদের একে অন্যের .... মজা ভোগ করো।' (আয়াত ৪২)

আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এই ফেরেশতাকুলের পূজা করতো, অথবা মনে করতো যে, ফেরেশতারা তাদের জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। কাজেই কেয়ামতের সেই দিনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের সাথে ওদের মোকাবেলা করাবেন, আর তখন তারা সবাই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করতে থাকবে, যাতে করে ওদের আশা ভুল বলে প্রমাণিত হয় এবং তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছাড়া ফেরেশতাদের কারও কোনো উপকার করার কোনো ক্ষমতা নেই। কে তাদের পূজা করত না করতো– সে বিষয় তারা কিছুই জানে না। এইভাবে তাদের পূজা-অর্চনা সবই তখন অলীক ও ভুল বলে প্রমাণিত হবে। এ ধরনের সকল কাজই অসার ও ভিত্তিহীন হবে– যে, তারা শুধু শয়তানের পায়রুবীই করতে থেকেছে। কখনও শয়তানের আনুগত্য ও তার প্রভাবে প্রভাবিত আবার কখনও বা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাঁর ক্ষমতায় অন্যদের শরীক জেনে তাদের পূজা পার্বন করার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়ে। এটা তো সত্য কথা, যখন তারা ফেরেশতাদেরকে পূজা করতো, প্রকারান্তরে সে পূজা তারা করত শয়তানের! তৎকালীন আরবে জ্বিনদের এবাদত করা সম্পর্কে লোকেরা জানতো, এ জন্য তাদের মধ্যে একদল লোক জ্বিনদেরও পূজা করত এবং তাদের কাছে সাহায্য চাইত। এরশাদ হচ্ছে,

'বরং ওরা (যারা) জ্বিনদের পূজা করত তাদের অধিকাংশই তাদেরকে শক্তি, ক্ষমতার মালিক বলেও বিশ্বাস করত।'

এই পর্যায়ে এসে এই সূরার মধ্যে সোলায়মান (আ.) এর ঘটনাটা উল্লেখিত হয়েছে। যেখানে দেখা যায়, জ্বিনদের সাথে কাজ কারবার করার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং এখানে আল-কোরআনের মধ্যে অতীতের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনার এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে।

এ দৃশ্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কাহিনী ও গুণ বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করে সম্বোধন ও মুখোমুখি কথা বলার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং অন্যায়ের জন্য তাদের দোষারোপ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আজকের দিনে তোমাদের কেউ কারও কোনো উপকার করতে পারবে না এবং পারবে না কেউ কারো কোন ক্ষতি করতে।'

অর্থাৎ ফেরেশতারা মানুষের ওপর কোন কর্তৃত্ব খাটানোর মালিক নয়, এই কাফেররাও কেউ কারও ওপর কর্তৃত্বশীল নয়! যে আগুন বা দোযখের কথা যালেমরা প্রত্যাখ্যান করে বলত, তোমরা যদি সত্যবাদীই হয়ে থাক তাহলে বল না কখন আসবে সেই ওয়াদা করা দোযখ! হ্যাঁ, অবশ্যই ওরা সে দোযখের বাস্তব দৃশ্য দেখতে থাকবে এবং এর মধ্যে কোনই সন্দেহ নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'যালেমদের বলবো, তোমরা দোযখের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।'

এইভাবে এই সফর শেষ হচ্ছে। অন্যান্য আরও বিষয়ের মত পুনরুত্থান দিবস, হিসাব ও প্রতিদান দেয়া সম্পর্কিত আলোচনা নিয়েই তা কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن

يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾

وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾ ۞ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ

وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم

بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ

أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

৪৩. যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, এ ব্যক্তি (আমাদের মতো) একজন মানুষ বৈ কিছু নয়, তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের এবাদাত করতো, তা থেকে সে তোমাদের ফিরিয়ে রাখতে চায় এবং (কোরআন সম্পর্কে) তারা বলতো, এটা তো মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এ কাফেরদের কাছে যখনই কোনো সত্য এসে হাযির হয় তখনই তারা বলে, এ হচ্ছে এক সুস্পষ্ট যাদু। ৪৪. অথচ আমি এদের কখনো কোনো (আসমানী) কেতাব দেইনি যা তারা পড়তে (পড়াতে) পারে, না আমি তোমার আগে এদের কাছে অন্য কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি; ৪৫. এদের আগের লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, (অথচ) আমি তাদের যা কিছু দান করেছিলাম তার এক দশমাংশ পর্যন্তও এরা পৌছুতে পারেনি, অতপর (যখন) তারা আমার নবীদের অস্বীকার করেছে, (তখন তুমিও দেখেছো) আমার আযাব কতো ভয়ংকর ছিলো!

রুকু ৬

৪৬. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো (এসো), আমি তোমাদের শুধু একটি কথাই উপদেশ দিচ্ছি, তা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (সত্যের ওপর) দাঁড়িয়ে যাও, দু'দুজন করে, (দুজন না হলে) একা একা, অতপর ভালো করে চিন্তা করে দেখো, তোমাদের সাথী (মোহাম্মদ) কোনো রকম পাগল নয়; সে তো হচ্ছে তোমাদের জন্যে আসন্ন ভয়াবহ আযাবের একজন সতর্ককারী মাত্র। ৪৭. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের কাছে (হেদায়াত পৌছাবার জন্য) কোনো পারিশ্রমিক দাবী করিনি, বরং এ কাজের যা কল্যাণ তাতো তোমদেরই জন্য, আমার পাওনা তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই, তিনি (মানুষের) প্রতিটি বিষয়ের ওপরই সাক্ষী।

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ ۗ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٥١﴾ وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾ وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ﴿٥٤﴾

৪৮. তুমি (আরো) বলো, আমার মালিক সত্য দিয়ে বাতিলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন, যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে তিনি পরিজ্ঞাত। ৪৯. তুমি বলো, সত্য এসে গেছে (বাতিল নির্মূল হয়ে গেছে), এর না (আর কখনো) সূচনা হবে আর না হবে পুনরাবৃত্তি। ৫০. (হে নবী,) এদের বলে দাও, আমি যদি (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত হয়ে যাই, তাহলে আমার এ বিচ্যুতির পরিণাম আমার ওপরই বর্তাবে, আর যদি আমি হেদায়াতের ওপর থাকি তবে তা শুধু এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং (সবার) একান্ত নিকটে অবস্থান করছেন। ৫১. হে নবী, যদি তুমি (সেদিনটি) দেখতে পেতে, যখন এরা ভীতবিহ্বল হয়ে ঘুরতে থাকবে এবং তাদের জন্যে পালানোর পথ থাকবে না এবং একান্ত কাছ থেকেই তাদের পাকড়াও করা হবে, ৫২. (এ সময়) তারা বলতে থাকবে (হ্যাঁ), আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনলাম, কিন্তু এখন (এতো) দূর থেকে (ঈমানের) নাগাল তারা (কিভাবে) পাবে? ৫৩. অথচ এরাই ইতিপূর্বে তাঁকে অস্বীকার করেছে, দূর থেকে (ভালো করে) না দেখে (অনুমানের ভিত্তিতেই) কথা বলছে। ৫৪. (আজ) তাদের মাঝে ও (জান্নাত সম্পর্কিত) তাদের কামনা-বাসনার মাঝে একটি (অপ্রতিরোধ্য) দেয়াল (দাঁড় করিয়ে) দেয়া হবে, যেমনি করা হয়েছিলো তাদের পূর্ববর্তী (মোশরেক) সাথীদের বেলায়, (মূলত) ওরা সবাই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সন্দিহান ছিলো।

তাফসীর
আয়াত ৪৩-৫৪

এখান থেকে শুরু হচ্ছে সূরাটির শেষ অধ্যায়ের তাফসীর। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে মোশরেকদের সম্পর্কে, আলোচনা করা হয়েছে নবী (স.)-এর সাথে তাদের কথোপকথোন ও সেই মহান কেতাব আল কোরআন সম্পর্কে এবং নাফরমানী করার কারণে তাদের মত অতীতে অন্যান্য জাতির যে পরিণতি হয়েছিলো সে সব ঘটনাবলীর আলোকে তাদের উপদেশ দান সম্পর্কে। এ অধ্যায়ে আরও দেখানো হয়েছে, সে সব সত্য-বিমুখ লোকের পরিণতি, যারা সরাসরি সত্যের বিরোধিতা না করলেও সত্যকে গ্রহণ করা থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে দুনিয়াতেই তাদের

নানা আযাব ঘিরে ফেলেছে। অথচ অতীতের সেই সব জাতি এদের থেকে আরও বেশী শক্তিশালী আরও জ্ঞানী এবং আরও ধনী ছিল।.............

এরপর এসেছে আরও বেশ কিছু দুর্ঘটনা, যেন তা উপর্যুপরি আসা কতিপয় ধ্বংসযজ্ঞ। অতীতের নাফরমান জাতিসমূহের বিপর্যয়ের ইতিহাস তুলে ধরে তাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে, তারা যেন সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সর্বান্তকরণে আল্লাহ তায়ালার পথে এগিয়ে আসে এবং বাতিল ব্যবস্থার সেই সকল বাধা-বিঘ্ন ও প্রভাব থেকে মনকে মুক্ত করে নেয়, যা হেদায়াত থেকে তাদের বিরত রাখে, বিরত রাখে তাদের সঠিক চিন্তা করতে। আলোচ্য অধ্যায়টি যে বর্ণনা আমাদের কাছে পেশ করেছে, তা হচ্ছে, মানুষকে কেয়ামতের বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তা করতে আহ্বান জানানো।

আল্লাহর রসূল (স.) যে মহান দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে দুটি কথাই ছিলো প্রধান। এক, সারাবিশ্বের মালিক আল্লাহ তায়ালা, সুতরাং তাঁর ভুবনে এবং তাঁর রাজ্যে তাঁরই আইন-কানুন চালু করার মাধ্যমে তাঁর প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। দুই. এ কথা বুঝা যে, দুনিয়ার এ জীবনটা চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী এ জীবন শেষে চিরস্থায়ী জীবন আসবে, সেই জীবনে শান্তি পাওয়ার জন্যই এ জীবনে শৃংখলামতে চলতে হবে। ত্যাগ-তিতিক্ষা বরদাশত করা এবং সকল ব্যাপারেই জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করার মধ্যেই ইহ-পরকালের সমূহ কল্যাণ ও শান্তি রয়েছে । এর বাইরে যে কাজ ও যে আচরণ তাতে সামগ্রিকভাবে মানুষের কোনো কল্যাণই আসবে না। সুতরাং, তাঁর দাওয়াতের মধ্যে যারা সন্দেহ আরোপ করবে অথবা সে দাওয়াত বাধাগ্রস্ত করবে তাদের পরিণতি বা তাদের শাস্তি হবে ভয়ানক। তারপর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নির্দেশ আসছে। 'বলা হচ্ছে, বল, বল, বল'। যাঁকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে সারা বিশ্বকে পরিচালনার দায়িত্ব দিচ্ছেন, তিনি বারবার এই নির্দেশ পেয়ে প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠছেন, তাঁর অন্তর এসব কঠিন দায়িত্বের সকল বোঝা জীবনের সকল শক্তি ও চেতনা দিয়েও যেন বহন করতে পারছেন না।

এ অধ্যায়টি এখানে শেষ হচ্ছে। কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর মধ্য থেকে একটি কঠিন দৃশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, তা যেন অন্যান্য ঘটনার সাথে সংযুক্ত রয়েছে ।

সত্যের দাওয়াতের বিরুদ্ধে পাপীদের অপপ্রচার

'আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী তেলাওয়াত করে শোনানো হয়, তখন ওরা বলে ওঠে, (আয়াত ৪৩-৪৫)

যখন রসূল (স.) আল কোরআনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে তাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে পেশ করেন, তখন তারা তার সাথে অতীতের সন্দেহপূর্ণ নিয়ম-কানুনের সাথে তুলনা করে দেখার সুযোগ পাচ্ছে। এই তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে তাদের সামনে ইসলামের যুক্তি ও সৌন্দর্য এবং বাস্তব জীবনে তার কার্যকারিতার কথা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। তারা এই যুক্তিহীন, অস্পষ্ট ও অন্ধ অনুকরণের অসারতাও দেখতে পাচ্ছে, যা কোনো মযবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যার পেছনে কোনো শক্তিশালী যুক্তিও নেই । এমতাবস্থায় যখন কোরআনের আয়াত তাদের সম্বোধন করছিলো তখন তারা এক অশনি সংকেত অনুভব করছিলো, বুঝছিলো আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের গোজামিলের দিন বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে, সম্ভবত এবারে তাদের অন্ধ আনুগত্য এবং অযৌক্তিকভাবে দাসত্ব করার যামানার সমাপ্তি ঘটবে, যা তারা নিছক তাদের বাপ-দাদার অনুকরণের মাধ্যমে করে আসছিলো। তবুও তারা শেষ রক্ষার নিমিত্তে বলে উঠলো,

'এ ব্যক্তি তো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়, তোমাদের বাপ-দাদারা যে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল- এ লোক তো দেখছি সেই সব ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে চায়।'

কিন্তু সে তো একা একজন ব্যক্তি, কি সে করতে পারে! এক জনমাত্র ব্যক্তি বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করতে গিয়ে নিশ্চয়ই কারও মন পরিবর্তন করতে পারবে না, পিতৃ-ধর্মকে বদনাম করতে পারবে না বা মানুষের মন-মগজের সকল খেয়াল পরিবর্তন করে তার অনুগত বানিয়ে নিতে পারবে না। এরই কারণে তারা প্রথম আনুগত্যকে দ্বিতীয় আনুগত্যের আহ্বানের ওপর অন্ধভাবে প্রাধান্য দিলো, যদিও তারা বুঝছিলো যে, তাদের কাছে পৌছে যাওয়া এক আমানতের তারা খেয়ানত করছে। তারা এই নতুন ও চিত্তাকর্ষক দাওয়াতকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করতে লাগলো যে আল্লাহর কাছ থেকে সে লোকটি এটা একটা ফালতু কথা নিয়ে এসেছে। ওদের কথাটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে,

'ওরা বললো, এটা তো নিছক মনগড়া একটা কথামাত্র!'

ওপরের এ বাক্যটির মধ্যে ব্যবহৃত 'ইফকুন' শব্দটির অর্থ হচ্ছে মিথ্যা ও মনগড়া কথা। কিন্তু কথাটাকে সাধারণভাবে উচ্চারণ না করে জোর দিয়ে বলার জন্য তারা বলত, 'এটা মিথ্যা মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছু নয়।' এই দৃঢ় প্রত্যয় যুক্ত কথা দ্বারা মানুষের মনকে সত্যের প্রতি সন্দিগ্ধ করে তুলতে চাইতো এবং চাইতো যেন লোকেরা নবাগত এই সত্যের মূল্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, একইভাবে তারা এ মূল্যবান সত্যের উৎস, অর্থাৎ বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রভু সম্পর্কে মানুষকে সন্দিহান করে তুলতে চাইতো। তারপর তারা আল কোরআন সম্পর্কেও অলীক ও কাল্পনিক প্রচারনা করতে দ্বিধাবোধ করতো না। এরশাদ হচ্ছে,

'আর কাফেররা, সত্য সমাগত হওয়ার পর বলে উঠলো, 'এটা নিছক এক যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।'

আসলে লোকদের মন নড়বড়ে করে দেয়ার জন্যই এ ধরনের বাচনভংগী ব্যবহার করা হয়। তাই তারা শুধু মনগড়া কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং হৃদয়ানুভূতির মধ্যে এক তীব্র বিষক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ পাকের মর্মস্পর্শী আয়াতগুলোকে যাদু বলে আখ্যায়িত করল, বলল,

'এতো সুস্পষ্ট এক যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।'

এই ভাবে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের প্রতি তাদের তীব্র আক্রমণ মিথ্যা দোষারোপের এক বিরাট অভিযান চললো, মিথ্যা এই জন্য যে, যা তারা মুখ দিয়ে বলতে শুরু করলো তার প্রতি তাদের হৃদয়াভ্যন্তরে বিশ্বাসের লেশমাত্র ছিল না তারপরও তাদের এ অভিযান সহজে থামেনি, যুক্তির ধোপে একটি যদি না টেকে এবং মানুষ যদি একটি দ্বারা বিভ্রান্ত না হয় তাহলে তারা আর একটি পন্থা উদ্ভাবন করে, এইভাবে তারা বিভিন্ন আয়াতকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে নানাপ্রকার আখ্যা দিতে লাগলো, যেন মানুষের হৃদয় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং সে আয়াতগুলো প্রতি তারা আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে। অথচ তারা যখন স্ববিরোধী এইসব অভিযান চালাচ্ছিল তখন তাদের কথা বা মতের সপক্ষে তারা কোন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে পারছিল না (এ জন্যে যত জোরেশোরে তারা এ সব মিথ্যা অভিযান চালানোর চেষ্টা করছিলো, সেভাবে তারা পারছিলো না। কেননা, অন্তরে তাদের কোনো শক্তি ছিল না) জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা মিথ্যার ওপর মিথ্যার জাল বুনে চলছিল।

এখন দেখতে হবে, কারা ছিলো এসব জ্ঞানপাপী, যারা জেনে-বুঝে সত্য বিরোধী অভিযানে আদা পানি খেয়ে লেগেছিলো এবং এখানে তাদের উদ্দেশ্যই বা কী ছিলো! একটু খেয়াল করলেই

বুঝা যায় যে, এরা ছিল সমাজের সুবিধাভোগী বিত্তবান ও ক্ষমতাগর্বী লোক, যারা মিথ্যার বেসাতি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের প্রাধান্য কায়েম রাখার জন্য নিশিদিন মিথ্যা রচনা করতো। তারা ভালো করেই জানতো, আল-আমীন মোহাম্মদ (স.) প্রৌঢ়ত্বের বয়স পর্যন্ত যার দিকে আংগুল তুলে কথা বলার সাহস কেউ করত না, আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে যাঁর আসন ছিলো সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁকে সহজে বদনাম করা যাবে না, তার থেকে মানুষকে খুব বেশীদিন ফিরিয়ে রাখাও যে সম্ভব হবে না– তাও তারা বুঝতো, তবুও তারা ভাবতো দেখা যাক, মিথ্যার ওপর মিথ্যা ছড়িয়ে কতদিন পারা যায়! আল কোরআন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালারই কালাম, এ কথা কি তারা বুঝতো না? অবশ্যই বুঝতো। এ কালামের আহ্বানকে ঠেকিয়ে রাখা মানুষের পক্ষে অসাধ্য, অসাধ্য কোনো কূট তার্কিকের পক্ষে এ পাক কালামের মধুর বচন থেকে মানুষদের দূরে সরিয়ে রাখা। তবু দেখা যাক যতদিন পারা যায়!

'ফী যিলালিল কোরআন' এ ইতিমধ্যে মোহাম্মদ (স.)-এর সম্পর্কে কাফের মোশরেকদের কিছু সংখ্যক নেতার কথা বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। এই তেজোদীপ্ত ভাষণের কথা এই মহাগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সংস্পর্শে এসে তারা বিমোহিত হয়ে যেত এবং তাদের অন্তর প্রাণ বশীভূত হয়ে যেতো। তারপর তা এই অলৌকিক আকর্ষণ থেকে জনগণকে ঠেকানোর অসদুদ্দেশ্যে এবং তার আহ্বানকে প্রতিহত করার জন্য সজ্ঞানে ও সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই তার বিরোধিতা করে আসছিলো।(১)

আল কোরআন তাদের খোলস উন্মোচন করে দিয়ে বলছে, কোরায়শের লোকজন ছিলো সাধারণভাবে নিরক্ষর। আগে তাদের কখনও কেতাব দেয়া হয়নি, অর্থাৎ মক্কায় অবস্থিত কোরায়শ জনপদের নিকট কোনোকালেই কোনো নবীর আগমন হয়নি এবং ঐশী গ্রন্থ নাযিল হয়নি যার শিক্ষার আলোকে আসমানী কেতাবসমূহকে কিংবা এর ওহীকে তারা যাচাই করতে পারতো এবং এর দ্বারা পরখ করে এই কেতাব সম্পর্কে তারা মন্তব্য করতে পারতো যে, আজকে নাযিল হওয়া এ কেতাব আসমানী কেতাব বা ওহী নয় এবং আল্লাহর কাছ থেকেও আসেনি। ইতিপূর্বে তাদের কাছে কোন রাসূল আসেননি এ সম্পর্কে কোন জ্ঞানও নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি তাদের কোনো কেতাব দেইনি, যা তারা পড়তে পারতো এবং তোমার পূর্বে তাদের কাছে কোন সতর্ককারীও পাঠাইনি।'

মানবজাতির জন্যে কোরআনের উপদেশ

যখন পূর্ববর্তী লোকদের সত্য বিরোধী সংগ্রামের কথা তারা শোনে, তখন তাদের অন্তর এসব কথা অনুভব করে, অথচ তাদের পূর্বের লোকদের যে ধন-দৌলত, শক্তি এবং নির্মাণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো তার দশ ভাগের এক ভাগও তাদের দেয়া হয়নি। এরপর যখন তারা রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছে তখন তাদের কঠিন শাস্তি এসে পাকড়াও করেছে । ভয়ংকর ঝড় তুফান অথবা ভীষণ ও দুরারোগ্য ব্যধির রূপ নিয়ে তাদের ওপর শাস্তি নেমে এসেছে । এরশাদ হচ্ছে ,

'ওদের আগে লোকেরাও রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছে .... কেমন (কঠিন) হয়েছিলো তাদের পরিণতি?'

অবশ্যই তাদের পরিণতি হয়েছিল অত্যন্ত ধ্বংসকর। কোরায়শরা আরব উপদ্বীপে অবস্থিত তাদের অনেকের ধ্বংসাবশেষেরই খবর রাখতো, সুতরাং স্মারক হিসাবে এগুলোই তাদের জন্য ছিল যথেষ্ট। 'অতপর খেয়াল করে দেখো, কি ভয়ংকর হয়েছিল সে শাস্তি?' এ একটা জীবন্ত প্রশ্ন যা শ্রোতাদের হৃদয়কে গভীরভাবে আকর্ষণ করে, যেহেতু তারা জানে যে, যে সে শাস্তি কেমন হতে পারে!

(১) যেমন ওলীদ ইবনে মুগিরা, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং আখনাস ইবনে শুরায়েক–এর হাদীস থেকে জানা যায়।

এখানে আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সত্য সম্পর্কে আলোচনার খাঁটি পদ্ধতি জেনে নেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, আহ্বান জানাচ্ছেন সত্য ও বাস্তবতা থেকে– মনগড়া কথা কাকে বলে তাকে আলাদা করে বুঝার জন্য, এ ব্যাপারে কোনোপ্রকার মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে বা কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ না করেই যেন এ চেষ্টা করা হয় তাই বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, অবশ্য অবশ্যই আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি ....সে তো কঠিন আযাবের সামনে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র।' (আয়াত ৪৬)

এ দাওয়াত হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দাঁড়ানোর দাওয়াত। অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি ও সর্ব প্রকার পার্থিব চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে সুখ নিদ্রা পরিত্যাগ করার জন্য ও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তওবা করার আহব্বান। দুনিয়ার কোনো স্বার্থ পাওয়ার অজুহাতে কোনো অন্যায়ের সাথে আপোষ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ার আহ্বান, বাজে সংস্রব থেকে দূরে থাকার আহ্বান, বাজে শোরগোল ও গান-বাজনা পরিহার করার আহ্বান। সর্বোপরি যাবতীয় প্ররোচনামূলক কাজ ও ব্যবহার যা মনকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়– তার থেকে দূরে থাকার আহ্বানও এর মধ্যে শামিল রয়েছে, কেননা এইসব জিনিসই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, প্রচলিত নিয়ম কানুন এবং জনশ্রুতিও মানুষকে অনেক ভ্রান্তির দিকে ধাবিত করে।

ওপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দিগন্তে বিস্তৃত এই বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে জীবনকে পরিচালনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে মানুষের মনগড়া ফায়সালা গ্রহণ করা নয়, বা লাগামছাড়া উপস্থিত আনন্দের জোয়ারে গা-ভাসিয়ে দেয়া নয় এবং মানুষের মনগড়া বিস্তৃত ব্যাখ্যার জালে নিজেকে আবদ্ধ করাও নয়। কেননা এসব কিছু মানুষের অন্তর ও বুদ্ধি সত্যকে গ্রহণ করতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধা প্রদান করে।

আলোচ্য আয়াতটি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত আবিলতাহীন সুস্থ বিবেক বুদ্ধির দিকে আহ্বান জানায়, সর্বদা মানুষকে সঠিক পথ দেখায় এবং লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্য মানুষের মজ্জাগত প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করে। ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে শক্তি যোগায় এবং সেইসব প্রবণতা থামিয়ে দেয় যা সত্যকে ঢেকে দিয়ে মন্দের দিকে মানুষকে ধাবিত করে, সেইসব আপত্তিকর দৃশ্য থেকে তাদের বাঁচায়।

আলোচ্য আয়াতটি সত্য সম্পর্কে এমনই এক বিস্ময়কর পথ প্রদর্শন করছে, যা জীবনের সকল ব্যাপারেই প্রযোজ্য। এটা এমনই এক প্রশস্ত পথ, যা মানুষের তৈরী জাহেলী যামানার অবশিষ্ট সকল প্রভাবকে প্রতিহত করে এবং মোমেনদের হৃদয়কে আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করা ও তাঁকে ভয় করে চলার জন্য সদা-সর্বদা জাগ্রত করে রাখে।

এ আয়াতে যে বিপ্লবী আকীদার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে সে আকীদা একটিই .... এই আকীদা যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে জীবনের চলার পথ সময়ই স্থির হয়ে যায় এবং সাফল্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য তা মযবুতভাবে দাঁড়িয়ে যায় .... আর সে উপায় হচ্ছে মনে-মগযের দিক থেকে আল্লাহমুখী হয়ে যাওয়া অর্থাৎ যা কিছু করবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য করবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। মন ভুলানো অন্যান্য খেলাধূলা বা আমোদ-প্রমোদের কাজে সময় ব্যয় নয়, পার্থিব কোন সুযোগ-সুবিধার খাতিরেও নয়, বা এমন কোনো বিনোদনের জন্যও নয়, যা মন মগযকে পুরোপুরিভাবে মজিয়ে ফেলে এবং আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও তাঁর বিধান থেকে বেপরওয়া হয়ে এমন কোনো বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত করা সেখানে ন্যায়-অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যেনো তোমরা আল্লাহর জন্য দুজন দুজন করে এবং একাকী অবস্থায় দাঁড়াতে পারো।'

দুজন দুজন করে বলতে বুঝানো হয়েছে, একজন অপর জনের কাজ পরখ করতে পারে, সহযোগিতা করতে পারে এবং কোনোপ্রকার প্রভাবিত না হয়ে সম্পূর্ণ যুক্তি বুদ্ধি সহকারে যা কিছু সঠিক তা সমর্থন করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনোপ্রকার অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক আচরণ হয়ে গেলে তা খেয়াল করে একজনের ভুল অপর জন যেন শুধরে দেয়, যা কিছু যুক্তিপূর্ণ তা বলতে যেন কোনো দ্বিধা না করে। আবার যখন একাকী কারও সামনাসামনি আল্লাহর কোনো হুকুম পালন করবে তখন তার কাজের যথার্থতা ও যুক্তিসংগতা অপরকে প্রভাবিত করবে এবং এইভাবে সে আল্লাহর হক আদায় করবে।(১)

নবী মোহাম্মদ (স.)-এর উদাহরণ

'তারপর চিন্তা-ভাবনা করতে থাকো, (জেনে রেখো) তোমাদের সংগীকে কোনো পাগলামী পেয়ে বসেনি।'

তোমরা তো তাকে এতোকাল ধরে দেখছ তোমরা অবশ্যই তাকে যুক্তি বুদ্ধি নিয়ে চলাফেরা করতে দেখেছো, বরাবর তোমরা তাকে একজন ব্যক্তিত্বশীল, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং একজন গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে পেয়েছো। তোমরা তাঁকে কখনও খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে অথবা কল্পনাপ্রসূত কথা বলতে দেখোনি ...... এখনও তোমরা দেখছো যে কথা সে বলছে তা কতো মযবুত এবং কতো স্পষ্ট ও শক্তিশালী। এরশাদ হচ্ছে,

'সে তো এক কঠিন আযাব আসার পূর্বে তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ব্যক্তি হিসাবে আগমন করেছে।'

এ আয়াতাংশে এক আসন্ন আযাবের ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, সেই কঠিন আযাব আসার আগেই একজন সতর্ককারী সে আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছে, যাতে করে সেই ব্যক্তি সে আযাব থেকে বাঁচতে পারে যে তার কথা খেয়াল করে শুনবে এবং সতর্ক হবে। এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তার উদাহরণ এই, যেন আগুন সম্পর্কে সাবধান করতে গিয়ে একজন সতর্ককারী চীৎকার করে জানাচ্ছে, হুশিয়ার করে দিচ্ছে, এ ভয়ংকর আগুন থেকে যে, না পালাবে তাকে সহসা সে আগুন এসে গ্রাস করে ফেলবে। এ বিবরণ যেন ছবির মত আগুনের দৃশ্যকে তার সামনে তুলে ধরছে, যার কারণে এ অবস্থা যে আসবেই সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকছে না এবং মনের ভেতরে সে দৃশ্যের ছবি ভেসে উঠাতে মুহুর্মুহু তার হৃদয় প্রকম্পিত হচ্ছে।............

ইমাম আহমাদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে বারীরের পিতা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন আমাদের কাছে এলেন অতপর তিনি তিনবার ডাক দিয়ে বললেন, হে জনগণ, তোমরা কি আমার এবং তোমাদের উদাহরণ জানো? সবাই বললেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, শোনো, আমার ও তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে সে জাতির মতো, যারা এক দুশমন দলের আগমনের ভয় করছে, অতপর তারা এক ব্যক্তিকে খোঁজ নেয়ার জন্য সেখানে পাঠালো, তারপর লোকটা সে শত্রুদেরকে দেখলো এবং ফিরে এসে তাদের সতর্ক হতে বললো। তাদের কাছে আসার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে তার ভয় হচ্ছিলো যে জনগণের কাছে খবরটা পৌছানোর পূর্বেই হয়তো দুশমন তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে! তখন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তার কাপড় চোপড় নিয়ে সে পড়ে গেলো এবং চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'হে জনগণ, তোমরা এসে গেছো, হে জনগণ, তোমরা এসে গেছো, হে জনগণ, তোমরা এসে গেছো।'

(১) আমাদের মনে রাখতে হবে, আলোচ্য সূরাটি মক্কী যিন্দেগীর প্রথম দিকে অবতীর্ণ, যখন ব্যক্তিগত আকীদা, কাজ ও সবর যেমন প্রয়োজন ছিলো, তেমনি আলোচ্য আয়াতে পারত পক্ষে অন্তত দুজনকে একত্রিত হয়ে কাজ করার জন্যে পরোক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে দুজন একমনা লোক পরস্পর সহযোগীতা করতে পারলে অনেক জটিলতাই সহজ হয়ে যায়– একথাও এখানে ইংগীতে বুঝা যাচ্ছে।–সম্পাদক

এই বর্ণনাধারায় আর একটি রেওয়ায়েত এসেছে। বর্ণনাকারী বলছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আমি ও কেয়ামত এক সাথে প্রেরিত হয়েছি, হতে পারে আমার মৃত্যুর পূর্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।'

এই ভাবে প্রথম হাদীসটিতে যে ঘটনার উল্লেখ হয়েছে তা দ্বিতীয় ঘটনা থেকে মনের ওপর বেশী দাগ কাটে এবং তাকে বেশী জীবন্ত বলে মনে হয়। দ্বিতীয় হাদীসটিও মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আমি তো তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, সে প্রতিদান তো তোমাদের জন্যই রয়েছে (যদি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দাও)। আমার প্রতিদান আল্লাহর কাছেই রয়েছে, তিনি সব কিছু দেখেন।'

প্রথমবারে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের এমনভাবে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছেন যেন সে চিন্তা তাদের সঠিক পথ দেখাতে পারে এবং আযাব থেকে বাঁচাতে পারে............... সে আহ্বানে বলা হয়েছে, তোমাদের নেতার মধ্যে কোনো পাগলামী নেই, তাঁর মধ্যে নেই কোনো মস্তিষ্ক বিকৃতি .... এইভাবে এই আয়াতটিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে আবারো চিন্তা করার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং তাদেরকে সেই বিষয়ে আত্মজিজ্ঞাসা করতে বলছেন, যে বিষয়ের কারণে তাদের ওপর এক কঠিন আযাব আসা আসন্ন হয়ে গেছে এবং যে বিষয়ে তাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করা হচ্ছে। এইভাবে তাদেরকে কেন চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হচ্ছে? এতে তাদের কী ফায়দা হবে? এর উদ্দেশ্যই বা কি? এই সতর্কীকরণের ফলে তাদের মধ্যে কী পরিবর্তন আসবে? স্বাভাবিকভাবেই এসব প্রশ্ন আসে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমনভাবে তাদের জিজ্ঞাসা করছেন, যেন তাদের যুক্তি বুদ্ধিতে বা বিবেকে সাড়া জাগে, তাদের চেতনাবোধ জেগে ওঠে এবং আযাবের এই প্রাণবন্ত বর্ণনা তাদের এ সত্য গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমি চাই এ প্রতিদান তোমাদের জন্য থাকুক।'

অর্থাৎ তোমরা সেই প্রতিদান গ্রহণ করো যা আমি তোমাদের থেকে চেয়েছি। এ এমন এক বাচনভংগী, যার মধ্যে এক গভীর কটাক্ষ রয়েছে , রয়েছে পথনির্দেশ রয়েছে সতর্কবাণী। এরশাদ হচ্ছে,

'আমার প্রতিদান তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই।'

অর্থাৎ যিনি আমাকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তিনিই আমাকে প্রতিদান দেবেন আর সেই পুরস্কার পাওয়ার জন্যই আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালার কাছে যা আছে তা পাওয়ার জন্য যে ব্যক্তি চেষ্টা চালিয়ে যাবে তার কাছে দুনিয়ার ভোগবিলাস বড়ই তুচ্ছ এবং বড়ই ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ এত সামান্য যার সম্পর্কে কোন চিন্তাই করা যায় না।

আল্লাহ তায়ালা সত্যের আঘাতে মিথ্যাকে ধ্বংস করেন

'সবকিছু সম্পর্কেই তিনি অবগত।'

তিনি জানেন ও দেখেন, তাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই, আর তিনি আমার সকল ব্যাপারেই প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি দেখছেন, আমি যা কিছু করছি এবং যা কিছু করার নিয়ত করছি। যা কিছু আমি বলছি তাও তিনি শুনছেন। আর এ ছাড়া তৃতীয় যে বিষয়টি তার পদক্ষেপকে দুর্বল করে দেয় তা হচ্ছে,

'বল আমার রব সত্য দ্বারা অসত্যকে উৎখাৎ করেন, তিনি গায়বের সবকিছু জানেন।'

এই হচ্ছে সেই মহাশক্তি, যা আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি। এটাই প্রকৃত সত্য, এটা সকল শক্তি থেকে মযবুত সত্য, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সকল অসত্য ও অসুন্দরকে উৎখাত

করেন। কে আছে এমন যে এ সত্যের শক্তি প্রয়োগ ক্ষমতাকে রোধ করতে পারে? এই যে বর্ণনাভংগী, এ যেন এক জীবন্ত ও চলমান দেহের বাস্তব ছবি। আর সত্য? সে যেন প্রচন্ড এক ক্ষেপণাস্ত্র, যা ভেংগে চুরমার করে দেয়। তা অসত্যের সকল শক্তিকে ভেদ করে চলে যায়, শত্রুর সকল ব্যুহ ভেদ করে দূরন্ত বেগে এগিয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে তার অমোঘ বিধানসমূহকে প্রবর্তন করতে থাকে যা পথের সকল বাধা অতিক্রম করার পর নিজ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এ শক্তির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর অসীম জ্ঞানের শক্তি দ্বারা সত্য বিরোধী সকল তৎপরতার মোকাবেলা করেন, কে কোন উদ্দেশ্যে কী করছে সবই তো তাঁর জানা রয়েছে এবং তাঁর কাছে কারও কোন কিছু গোপন নেই। যে সত্য সকল যুক্তিবাদীর সব রকমের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাঁর সামনে কেউ কোনো কিছু নিয়ে দাঁড়াতে পারে না, পারে না কেউ তাঁর কাজকে থামিয়ে দিতে বা বাধাগ্রস্ত করতে! সকল পথই তাঁর সামনে সদা-সর্বদা উন্মুক্ত রয়েছে এবং কোন পথই তাঁর থেকে গোপন বা রহস্যাবৃত নয়।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সে হঠকারী যালেমদের জন্য নির্ধারিত এবার চতুর্থ শাস্তির কথা জানাচ্ছেন, কত কঠিন হবে সে শাস্তি এবং কত দ্রুতগতিতে সেই ভয়ংকর শাস্তি তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেবে তাও জানাচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, সত্য সমাগত হয়েছে এবং বাতিল শক্তি না কিছু সৃষ্টি করতে পারে, আর না পারে কাউকে পুনরায় জীবন দান করতে।'

অর্থাৎ, সত্য আল্লাহ তায়ালার দেয়া বহু উপায়ের মধ্যে একটি উপায়ে আমাদের কাছে এসেছে, যা সবার সামনে হাযির রয়েছে, সে সত্য রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি এক মহামূল্য বার্তা (রেসালাত) আকারে এসেছে। এ রেসালাত মানুষের কাছে এক অভিনব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এসেছে। এ রেসালাত অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন জনতার কাছে পৌঁছানোর এক বিস্ময়কর পথ রয়েছে। বলা হচ্ছে, বলো, সত্য এসে গেছে, এ ঘোষণা দিয়ে দাও এবং সত্যের অভূতপূর্ব এ অবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করো, এ খবরকে ছড়িয়ে দাও। হ্যাঁ অবশ্যই সত্য এসে গেছে, সত্য তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে এসেছে, বড়ত্ব ও বিজয়ী ক্ষমতা নিয়েই তা এসে গেছে। বাতিল শক্তি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না এবং মৃত্যু বা ধ্বংস এসে যাওয়ার পর সে জীবনকে কোনভাবেই আর সে ফিরিয়ে দিতে পারে কিনা তা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়। এটা সবার কাছে প্রমাণিত হয়ে রয়েছে যে, সবাইকে একদিন এ জীবন ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং অবশেষে সব কিছুরই শেষ বা ধ্বংস অনিবার্য।

এ হচ্ছে প্রচন্ডভাবে কাঁপিয়ে তোলার মতো এক ভীষণ শাস্তি, যার ওপর এ শাস্তি নেমে আসে সেইই বুঝতে পারে যে, এ চূড়ান্ত শাস্তি নেমে আসার পর এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোন উপায় থাকবে না। এ শাস্তির ভয়ংকর ধ্বনি যার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে সেই এর ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারে এবং সেইই বুঝতে পারে যে, শাস্তির এ চূড়ান্ত ফায়সালা এসে যাওয়ার পর এর থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় থাকবে না। এ শাস্তির ধ্বনি যার কাছে পৌঁছে সেইই বুঝে যে, শাস্তির এ ফায়সালাই চূড়ান্ত, আর এ শাস্তির বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ করার সাধ্য কারো নেই।

এই কারণেই আল-কোরআন এসে মানুষের মাঝে সত্য জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করল এবং এ ব্যবস্থার প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট করে তাদের জানিয়ে দিল। এর মোকাবেলায় যখনই কোনো বাতিল শক্তি আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালাতো শুরু করল, তখন তারা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ও অপ্রতিরোধ্য হাতে উপর্যুপরি পরাজয়ের পর পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে থাকল। হ্যাঁ, কখনও কখনও দু একটি ঘটনা যদি এমন ঘটে থাকে যে, বস্তুগত প্রস্তুতির অভাবে বা বিরূপ পরিবেশের কারণে বাতিল শক্তি কিছু সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছুতে সক্ষম

হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ কখনও এটা নয় যে, তারা সত্যের ওপর বিজয়ী হয়েছে, বরং বলা যায়, সত্যের কিছু ধারক ও বাহকদের ওপর শত্রুরা সাময়িকভাবে কিছু বিজয় অর্জন করেছে। এটা কিছু সংখ্যক লোকের পরাজয়– সত্য ও আদর্শের পরাজয় এটা মোটেই নয়, নয় এটা কোনো চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরাজয়। এটা নিছক সাময়িক দুর্ঘটনা, এর পরবর্তীতে সত্য আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কারণ সত্য তো চির সুন্দর এবং যারা সত্যের উপাসক, যারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার এ সত্য জীবন ব্যবস্থা একমাত্র শুভ্র সমুজ্জল ও সুস্পষ্ট সাফল্যের পথই হাযির করে। সত্য বিরোধীদের জন্য শেষ শাস্তির কথা এভাবে বলা হয়েছে।

বল, যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে......... নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শুনেন, তিনি নিকটবর্তী।'

আমি বিপথগামী হয়ে গেলে তাতে তোমাদের কি? তোমাদের তো এতে কোনো দায়িত্ব বা ক্ষতি নেই। আর যদি আমি হেদায়াতের পথ অনুসরণকারী হয়ে থাকি, তাহলে অবশ্যই মানতে হবে যে আল্লাহ তায়ালাই ওহী দ্বারা আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তাঁর হুকুম ছাড়া আমার নিজের ওপর আমার নিজের কোনোই কর্তৃত্ব নেই। তাঁর মেহেরবানীর ছায়াতলে আমি একজন অসহায় গোলাম মাত্র। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই তিনি অতি নিকট থেকে শুনেন।'

এইভাবেই তৎকালীন মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালাকে বড়ই কাছে অনুভব করতেন। এইভাবে তারা তাঁর গুণাবলী তাদের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতেন। তাঁর গুণাবলীর সজীবতা তাদের বাস্তব জীবনে দেখতে পেতেন। তারা অনুভব করতেন যে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁদের কথা শুনেন এবং তিনি তাঁদের অতি নিকটে রয়েছেন। তাদের সকল কাজের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা– সেটা অবশ্যই তাঁর সরাসরি মেহেরবাণী। তাদের অভিযোগ তাদের ফরিয়াদ কোন মধ্যস্থতা ছাড়াই তাঁর দরবারে পৌঁছায়। তিনি তাদের ভুলে যান না, অবহেলা করেন না এবং অন্য কারও হাতে ছেড়েও দেন না। আর এইভাবে তারা তাদের রব-এর সাথে মোহব্বতের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, রয়েছে তাঁরই হেফাযতে ও সরাসরি তাঁরই তদারকীতে, রয়েছে তাঁর মেহেরবাণীর ছায়াতলে ও তাঁর নিজস্ব পরিচালনায়। তারা আল্লাহ তায়ালার এসব মেহেরবানী তাদের বাস্তব জীবনে হামেশা অনুভব করে, তারা যেন মেহেরবান আল্লাহর সুবিস্তীর্ণ অস্তিত্বকে বাস্তবে দেখতে পায়। এই দেখা শুধু দেখার অর্থে দেখা নয়, নয় শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখা, 'নিশ্চয়ই তিনি শুনেন (সকল কিছু) নিকটেই অবস্থিত।'

কেয়ামতের ময়দানে কেয়ামত অস্বীকারকারীদের অবস্থা

অবশেষে সূরাটির কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর মধ্য থেকে এমন একটি দৃশ্যের ছবি দিয়ে পরিসমাপ্তি আঁকা হচ্ছে যার বর্ণনার সাথে মনে হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছু পাঠকের সামনে একত্রে হাযির হয়ে যাচ্ছে এবং সে দৃশ্যের বর্ণনা পাঠকালে পাঠক অনুভব করছে– দুনিয়া ও আখেরাত-এর জীবনগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এই দুই-এ মিলে তাদের জীবন এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে। এ দুনিয়ার গোলকটি যেন অপসারিত হয়ে আখেরাতের প্রান্তরের সাথে মিশে গেছে এবং তা সুবিশাল এক ময়দানে পরিণত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তুমি যদি তাদের সেই অবস্থাটা দেখতে পেতে যখন তারা........।' (আয়াত ৫১-৫৪)

ওপরের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, 'আর যদি তুমি দেখতে পেতে'......... এই দৃশ্যটি যেন চোখের সামনে হাযির রয়েছে,................. 'যখন তারা ভয় পেয়ে যাবে'............... সেই ভয়ংকর অবস্থা দেখে যা তাদের সামনে হাযির করা হবে' আর সেই সময় যেন তারা হারিয়ে যেতে

চাইবে 'কিন্তু কোথাও হারিয়ে যেতে পারবে না' অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই তারা রেহাই পাবে না। তাদেরকে নিকটবর্তী স্থান থেকেই ধরে আনা হবে।

অর্থাৎ তারা পালিয়ে যাবে কোথায়? পালিয়ে দূরে চলে যাওয়ার যতো চেষ্টাই করুক না কেন এবং যতো দিশেহারা অবস্থাই তাদের হোক না কেন আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারা বেশী দূরে যেতে পারবে না, সাথে সাথে ধরা পড়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তখন ওরা বলবে, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম।' ....

এখন? সকল সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর? সেদিন এতো দূরে সরে যাওয়ার পর এতো দূর থেকে তা আর কি করে সম্ভব? অর্থাৎ, এতদূরের স্থান থেকে তারা আর কিভাবে ঈমান আনবে? ঈমান আনার জায়গা তো দুনিয়া, তা তো অনেক দূরে সরে যাবে সেদিন, ওরা নিজেরাই সে সুযোগ হেলায় হারিয়েছে।

'ওরা তো ইতিপূর্বে ঈমানকে অস্বীকার করেছিল।'......................

সুতরাং বিষয়টি তো শেষই হয়ে গেছে। আর কখনও তাদেরকে চেষ্টার সুযোগ দেয়ার জন্য সে হারানো দিন আর ফিরে আশা হবে না।

'ওরা সত্য থেকে অনেক অনেক দূরে সরে থেকে তাদের নযরের বাইরের বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করতো।'

অর্থাৎ, আজকের এই কেয়ামতের দিন সম্পর্কে যখন তারা মন্তব্য করত তখন তো সেই দিন ছিলো তাদের থেকে অনেক অনেক দূরে। তাদের এই অস্বীকারের পেছনে কোনো যুক্তি প্রমাণ ছিলো না, তারা বহু দূরের স্থান থেকে সেই গায়বের বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করতো .... আজকের দিনে তারা ঈমান আনার চেষ্টা করবে সত্য, কিন্তু সেও তো এখন অনেক দূরে ...... সেই কেয়ামতের মাঠে বহু দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাবে.............।

তখন তাদের ও যা তারা চাইবে, এই দুই-এর মাঝে বহু দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাবে। ঈমান থেকে তাদেরকে আড়াল করে দেয়া হবে, যেহেতু তখন তারা ঈমান আনার ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করবে। যে আযাব সেদিন তারা দেখতে থাকবে, সেই আযাব থেকে রেহাই পেয়ে যাওয়া এবং বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না– যা তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকবে,

'যেমন করে তাদের পূর্ববর্তী দলগুলোর সাথে ব্যবহার করা হয়েছে।'

তাদের মধ্য থেকেই তো বিভিন্ন জনপদকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করা হয়েছে, তখন (শাস্তি শুরু হয়ে যাওয়ার পর) তারাও বাঁচতে চেয়েছিল, বাঁচতে চেয়েছিল যখন পালানোর আর কোন পথ ছিলো না, ঠিক তখন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই ওরা ছিলো সন্দেহের মধ্যে পতিত– সন্দেহ সৃষ্টিকারী।'...........

সুতরাং কি হবে আর সন্দেহের মধ্যে পড়ে থেকে এবং সন্দেহের পর সন্দেহ সৃষ্টি করার পর (মুক্তির প্রয়াসী হওয়ার?)

এইভাবে সূরাটি এই আসন্ন শাস্তির বিবরণ দান করার পর কেয়ামতের দৃশ্যসমূহের মধ্য থেকে একটি কঠিন দৃশ্যের বর্ণনার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে সেই বিষয়টিরও মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে, যাকে কেন্দ্র করে সূরাটি নাযিল হয়েছিলো এবং সূরাটির মধ্যে যেই বিষয়টিকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো ....প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সেই একই বিষয়ের কথা জানানো হয়েছে, যা দিয়ে এ সূরাটি আরম্ভ করা হয়েছিলো পুনরায়, সেই কঠিন শাস্তির বিবরণের সাথেই সূরাটির বক্তব্য শেষ হচ্ছে।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্‌র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

সূরা আল হুজুরাত
সূরা ক্বাফ
সূরা আয যারিয়াত
সূরা আত তূর
সূরা আন নাজম
সূরা আল ক্বামার

২০তম খন্ড

সূরা আর রাহ্মান
সূরা আল ওয়াক্বেয়া
সূরা আল হাদীদ
সূরা আল মোজাদালাহ
সূরা আল হাশর
সূরা আল মোমতাহেনা
সূরা আস সাফ
সূরা আল জুমুয়া
সূরা আল মোনাফেকুন
সূরা আত তাগাবুন
সূরা আত তালাক্ব
সূরা আত তাহ্রীম

২১তম খন্ড

সূরা আল মুলক
সূরা আল ক্বালাম
সূরা আল হাক্বাহ
সূরা আল মায়ারেজ
সূরা নূহ
সূরা আল জ্বিন
সূরা আল মোযযাম্মেল
সূরা আল মোদ্দাসসের
সূরা আল ক্বেয়ামাহ
সূরা আদ দাহর
সূরা আল মোরসালাত

২২তম খন্ড

সূরা আন নাবা
সূরা আন নাযেয়াত
সূরা আবাসা
সূরা আত তাকওয়ীর
সূরা আল এনফেতার
সূরা মোতাফ্ফেফীন
সূরা আল এনশেক্বাক
সূরা আল বুরুজ
সূরা আত তারেক
সূরা আল আ'লা
সূরা আল গাশিয়া
সূরা আল ফজর
সূরা আল বালাদ
সূরা আশ শামস
সূরা আল লায়ল
সূরা আদ দোহা
সূরা আল এনশেরাহ
সূরা আত তীন
সূরা আল আলাক্ব
সূরা আল ক্বদর
সূরা আল বাইয়্যেনাহ
সূরা আয যেলযাল
সূরা আল আদিয়াত
সূরা আল ক্বারিয়াহ
সূরা আত তাকাসুর
সূরা আল আসর
সূরা আল হুমাযাহ
সূরা আল ফীল
সূরা কোরায়শ
সূরা আল মাউন
সূরা আল কাওসার
সূরা আল কাফেরূন
সূরা আন নাসর
সূরা লাহাব
সূরা আল এখলাস
সূরা আল ফালাক্ব
সূরা আন নাস

سيد قطب
في ظلال القرآن
باللغة البنغالية
المجلد الثاني
ترجمة القرآن
حافظ منير الدين أحمد
AL-QURAN ACADEMY LONDON
إكاديمية القرآن لندن